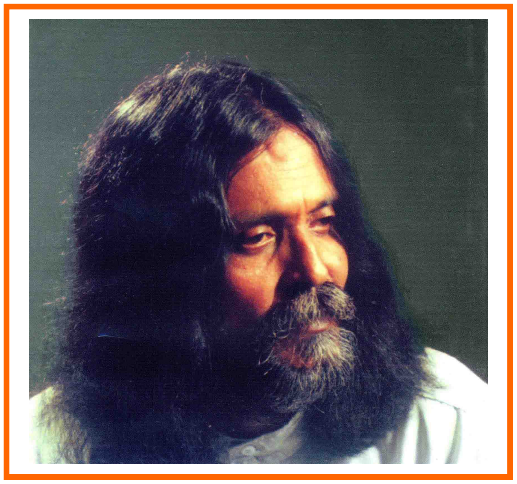

মারেফতের বাণী

চেরাগে জান শরীফ

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

উৎসর্গ

অধম লেখকের জন্মদাতা মরহুম হেলাল উদ্দিন আহমদ এবং মাতা সেতারা বেগমের নামে। পিতা হেলাল উদ্দিন আহমদ ছিলেন কেরানিগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম. এ., বি. টি। মাতা সেতারা বেগম একই উপজেলার মেয়েদের মধ্যে প্রথম মেট্রিক। স্কুলের শিক্ষকতাই ছিল বাবার পেশা। আমার জানা মতে ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রথম শিক্ষকতা করেন নরসিংদী জেলার চর সিন্দুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে। তারপর ১৯৩৪ হতে ৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত কালিন্দী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর ১৯৩৬ সাল হতে ৩৯ সাল পর্যন্ত বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় অবস্থিত জে বি হাইস্কুলে সহকারি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর চব্বিশ পরগনার বারাশত সরকারি হাইস্কুলে ১৯৩৯ হতে ৪২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তারপর বর্তমান জামালপুর জেলার গভ. হাইস্কুলে ১৯৪২ হতে ৪৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষক ছিলেন। তারপর ১৯৪৫ সাল হতে ৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে অবস্থিত গভ. মুসলিম হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর বগুড়া জেলা স্কুলে ১৯৫২ সাল হতে ৫৫ সাল পর্যন্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর চট্টগ্রামের গুরু ট্রেনিং স্কুলে সম্ভবত ছয় কি সাত মাস শিক্ষকতা করার পর একই জেলার কলেজিয়েট হাইস্কুলে সম্ভবত আট মাস শিক্ষকতা করেন এবং তারপর কুমিল্লা জেলা স্কুলে ১৯৫৭ সাল হতে ৫৮ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে থাকাকালীন ৩১ মার্চ মারা যান। এবং নিজ বাড়িতেই কবর দেওয়া হয়। কবরে পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের দুটো লাইন আজও লিখা আছে–

কঠিন জীবন পথের অক্লান্ত সৈনিক
হেলাল ঘুমায় হেথা চিরনির্ভীক।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বই-এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনো দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

প্রকাশকের কথা

বইটির লেখক আমাদের পিতা। সন্তান হয়ে পিতার জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তা না বললে বরং পাঠকই বইটি পড়ে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আমাদের আসল কথা হল, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বইটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চাই এ জন্য যে, বাতেল ফেরকাগুলোর মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠুক। বইয়ের মত বই হলে একটি বই এক লক্ষ বাতেল-মার্কা বই অনায়াসে গিলে খেতে পারে। এই বইটির সেই ক্ষমতা ও শক্তি আছে বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদেরই কাছে বলতে চাই যে, আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে আমরা লক্ষ লক্ষ বই ছাপাতে পারবো। তিলে তিলেই তাল হয়। সুতরাং অনেকের সাহায্য মিলে বিরাট কিছু করা যায়। এই আবেদনটুকু এ জন্যই করে রাখলাম যে, একটা বিবেকের দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে দিলাম। একবার না হয় ঘটা করে গরু জবাই না করে সেই গরুটার সমমূল্যের টাকাটা দান করে দেখুন না–কতগুলো বই নামমাত্র মূল্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। অথবা আপনি নিজেও ছাপিয়ে বিক্রি করতে পারেন। কারণ বইটির স্বত্ব আমাদের অধিকারে রাখতে বাবা ঘৃণা করেন। এবং এর প্রতিক্রিয়াটা যে আপনার চিন্তাধারার কত বড় বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে সেটা পাঁচ মিনিট চিন্তা করে দেখুন তো। যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তাদের জেনে রাখা ভাল যে, বাতেল ফেরকাগুলো গোপনে সুফিবাদকে কেমন করে বাংলাদেশ হতে মুছে ফেলতে হবে তার নীল নক্শা হয়তো বানানো হতে পারে।

নাহিদ শামসেত্তাব্রীজ ও বেদম ওয়ারসী

একটি বৈষয়িক দুঃখ

আমার (লেখকের) বাড়িতে আসা-যাওয়ার মাত্র একটি পথ। যে পথ দিয়ে আড়াই শত বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষ সবাই যাতায়াত করতেন। সেই পথটি তিন বছর পূর্বে সহসা একদিন মাত্র একজন জোর করে বন্ধ করে দিল। দুই দুইটি চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ করলাম এবং আশ্বাসও পেলাম। গ্রামবাসী সবাই অবাক বিস্ময়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু আজও পথটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চাচাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আমরা এবং ভক্তবৃন্দ যাতায়াত করছি। কিন্তু কতদিন এভাবে চলবে? সবাইকে এই দুঃখজনক বিষয়টি এ জন্য জানিয়ে রাখলাম যে, হয়তো কেউ না কেউ একদিন বিষয়টি সুরাহা করার জন্য মানবিক কারণে

এগিয়ে আসবেন। সত্য বলতে কি, আমরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলেই এ রকমটি করতে পেরেছে। কলঙ্কজনক ইতিহাস হয়ে থাক পাঠক ও ভক্তবৃন্দের কাছে আমার গ্রাম চুনকুটিয়া।
সবাই জানুক একজন ক্ষুদ্র গবেষকের জন্মভূমির একটি বৈষয়িক দুঃখ। সবাই জানুক গবেষকের পিতা, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম. এ., বি. টি. মরহুম হেলাল উদ্দিন আহমদের বাড়ির একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে বাবার বন্ধু পল্লীকবি জসিম উদ্দিন আর শিক্ষাগুরু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ বাড়িতে এসেছিলেন। কবি জসিম উদ্দিনের লিখা দু'টো লাইন বাবার কবরে আজও স্মৃতি হয়ে আছে–

কঠিন জীবন–পথের অক্লান্ত সৈনিক
হেলাল ঘুমায় হেথা চির–নির্ভীক।

লেখকের কয়টি কথা

লাভ বেইলির সার্জারি বইতে অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষের ছবিকে যেমন অশ্লীলতার ছকে ফেলার প্রশ্নই উঠতে পারে না, তেমনি এলমে মারেফতের রহস্যপূর্ণ কথাগুলোকে উপেক্ষা করা অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করার প্রশ্নও উঠতে পারে না। ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করে যুক্তির ধারালো তরবারির উপর দিয়ে হেঁটে চলার অভ্যাস হল বিজ্ঞান, দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদের। এখানে গোঁড়ামির স্থূলতাকে দেয়ালরূপে দাঁড় করাতে চাইলে পিছিয়ে পড়তে হয় মনের অজান্তে। কিছুদিন পরই একটি জাতি তখন ভদ্র ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয় আপন নিয়মের পরিণতিতে। কারণ, ইতিহাস একদিনে তৈরি হয় না। তাই যারা কেবল নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে জানাবার অভ্যাস করার মত মারাত্মক নেশায় নেশাগ্রস্ত, সেই জাতিকে সভ্য জাতির হাসপাতালে স্যালাইন নেবার জন্য তাড়াতাড়ি ভর্তি হতে হয়। আসুন, উদার মনে গবেষণা চালাই আমরা। এই গবেষণার আসল-নকলের উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়। হাঁটতে শেখার সময় আছাড় খাওয়া নিষিদ্ধ, যারা বলতে চায় তাদেরকে কী ভাববেন? সাঁতার কাটতে গেলে 'পানি পান করা বারণ' বলা বোকামির লক্ষণ। এতে গবেষণার মাথায় আঘাত লাগে। স্থবিরতা টেনে আনে পঙ্গুত্ব। তাই সর্বপ্রথম মনে করতে হবে যে, গবেষণা গবেষণাই। যে জাতি এই গবেষণাকে ঘৃণা করে সে জাতি নিজেকেই করে ঘৃণা; অথচ মস্ত একটা কাজ করে ফেললাম বলে হি হি করে তৃপ্তির হাসি হাসে। বিলাপের বোবা কান্না যে এই হাসির অতি কাছেই বিচরণ করছে সেটা ইতিহাস একদিন তুলে ধরে। কারণ, অনুষ্ঠানগুলো যখন আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলিয়ে দিতে থাকে, তখন সেই অনুষ্ঠানগুলোকেই বোঝা এবং ফালতু মনে হয়। প্রতিবাদের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে জ্ঞানীদের মুখ জোর করে বন্ধ করে দিতে চাইলেই জন্ম হয় নাস্তিক্যবাদের। লাশ ফেলে রাখলে পচন আর পোকার আগমন অবধারিত। এটা যদি অস্বীকার করতে চান তাহলে সমস্ত পরিবেশের বাঁধনগুলোর স্বীকৃতির সুর সঙ্গীত বেজে উঠবে। ঠুমরি-কেদারার এলিয়ে পড়া সুরে নয়, বরং বিপ্লব-বিদ্রোহের ভয়াবহতায়।

উত্তরের অপরাগতায়

ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, না কি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন? যিশুখ্রিস্ট কি খ্রিস্টান, না মুসলমান ছিলেন? যিশুখ্রিস্ট কি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেছেন, না ইসলাম ধর্ম? মুসা কি ইহুদি ধর্ম, না ইসলাম ধর্ম প্রচার করে গেছেন? ইসলাম ধর্মের আরম্ভ কি মোহাম্মদ হতে, না প্রথম মানব আদম হতে? যদি আদম হতে ইসলাম ধর্মের শুরু হয়ে থাকে তবে কেন প্রচার করা হয় যে, মোহাম্মদ হতে ইসলাম ধর্মের আরম্ভ? প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল পাঠানো হয়েছে সেই জাতির ভাষায়–কোরানের এই চিরন্তন ঘোষণায় কী বুঝাতে চেয়েছে? সেই অনেক অনেক জাতিতে পাঠানো অনেক অনেক রসুলেরা অনেক অনেক ভাষায় কি ইসলাম

ধর্ম প্রচার করে যান নি? আল্লাহ্‌র রসুলেরা কি ইসলাম ধর্ম প্রচার না করে অনেক ধর্ম প্রচার করেছেন, নাকি একটিমাত্র ইসলাম ধর্মই প্রচার করে গেছেন? মুসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ তথা অবতার বলে ইহুদিরা যেমন প্রচার করেন, তেমনি যিশুখ্রিস্টকে খ্রিস্টানরা, মোহাম্মদকে মুসলমানেরা, বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধকে, হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণকে, পার্শিরা জরথ্রুসকে, শিখেরা গুরু নানককে : এভাবে সবাই তাদের অবতারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে কোন ধরনের মজা পায়? এর ফলে কি মারামারি, হানাহানি উঁকিঝুঁকি দেয় না? সার্বজনীনতার বাণী কি সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে মনের অজান্তে কাটা হচ্ছে না? এই প্রশ্নগুলো অধম লেখকের নয়, বরং অনেকেই অধম লেখককে প্রশ্ন করেন। উত্তরের অপারগতায় ছাপার অক্ষরে সবার কাছে তুলে ধরলাম। আর সেই সঙ্গে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত এই বইগুলো পড়তে অনুরোধ করলাম : ১. *সিররে হক জামে নূর*, ২. *নূরে হক গঞ্জে নূর*, ৩. *মাতলাউল উলুম*, ৪. *লতায়েফে সাফিয়া*, ৫. *আইনাইন*, ৬. *সফিনা-এ সফর*।

যাঁদের আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সব সময় মনে করি

প্রথমেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীকে, যিনি আমার আপন মেঝ চাচা। আমি বাল্যকালে আমার জন্মদাতা, কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম. এ., বি.টি হেলাল উদ্দিন আহমদকে আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হারিয়েছি। সুফিবাদের উপর ধ্যান-ধারনার উৎসাহটি পেয়েছি এবং হাঁটি হাঁটি পায়ে সুফিবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছি যাঁর কারণে, তিনি আমার জগতগুরু আপন চাচা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী।

আমার একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, আর সেই খারাপ অভ্যাসটি হলো, প্রতিদিন দশ-পনের ঘণ্টা লেখাপড়া করতাম। এই জন্য আমাকে আমার বন্ধুরা বইয়ের পোকাও বলত। আমি প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষ একজন মানুষ। সত্যসন্ধানের পথে কোন মতবাদের সাইনবোর্ড আমার কাঁধে তুলতে দেই নাই। তবে যুক্তির পেছনেও যে অনেক বোবা যুক্তি দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে, সেটা বিশেষ রহমত ছাড়া জানা যায় না। ইহুদি ধর্মের মোল্লা-মুফতিরা যিশুকে শূলীতে চড়িয়ে বলেছিল যে, আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার; কিন্তু এবার আমরা তোমাকে শূলীতে চড়িয়েছি এবং আমাদের এই শূলী হতে যদি বেরিয়ে আসতে পার তবেই ধরে নিব, তুমি সত্য নবী। কিন্তু যিশু সেই শূলী হতে বেরিয়ে আসেন নি। এই যুক্তিটিতে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সত্যটি নাই। কেন নাই? যদি সত্যিই যিশু সেই শূলী হতে বেরিয়ে আসতেন তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ পাকের 'তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছি'–কথাটির সৌন্দর্য আর থাকে না। অথচ যুক্তির কথাগুলোর বাঁধন বড় শক্ত। এবং এই যুক্তির শক্ত বাঁধনের ফাঁদে পড়ে অনেকেই ইমান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই শক্ত যুক্তির ভেতরে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই, বরং যুক্তির ডুগডুগি বাজিয়ে, যুক্তির ভেলকিবাজি দেখিয়ে, যুক্তির যাদু দেখিয়ে হিপনোটাইজ করে ফেলে। পূর্বজন্মের কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই তকদির যে স্থানের উপযুক্ত সেখানেই নিয়ে যাবে। এটাই তকদিরে মোবরাম তথা যে তকদিরের আর বদল হয় না।

শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর মত একজন ইসলাম গবেষক এবং গুরু এই পৃথিবীতে কমই পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কোরানের তফসির তিন খণ্ডে বাজারে পাওয়া যায়। তফসিরটির নাম দিয়েছেন *কোরান দর্শন।* কত গভীর চিন্তার প্রতিফলন ঘটতে পারে তারই এক বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই রচনা। আমি অধম তাঁর মুরিদ হই নাই সত্য, কিন্তু উনিই আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ১৯১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ কাজিম উদ্দিন চিশতী এবং মাতা বেগম ইয়ারন নেছা। উনি পর্দা গ্রহণ করেন তথা ইন্তেকাল করেন ২০০৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। আমরা অনেকই জানি, মহানবীর আবির্ভাব ও পর্দাগ্রহণ ১২ই রবিউল আউয়াল। মওলাউল আলা বাবা সৈয়দ জ্বান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর জন্ম ও ওফাত দিবসটি ২রা অগ্রহায়ণ। আমরা জানি, বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং মৃত্যুদিবসটি ৯ ডিসেম্বর। কিন্তু চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পেলাম, একই দিনে জন্ম এবং মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে গেল শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতীর জীবনে।

তারপর আমি স্মরণ করি গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর আওলাদ শাহ সুফি সৈয়দ মজিবুল বশর সাহেবকে। তাঁর ভালোবাসার ছোট খাট ঘটনাগুলো কোনদিন কোনকালেও ভুলতে পারি না। আমার স্ত্রী বাবা ভাণ্ডারীর গোলাম এবং খেলাফত পেয়েছিল। বাবা ভাণ্ডারীর আওলাদ গাউসুল আজম বাবা মজিবুল বশরের কদম মোবারকে যদি অধমের স্থান হয় তো জীবন সার্থক মনে করব।

গান বাজনা

এই বইতে একটি বিষয় একটু বেশি আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিষয়টি হল, গান বাজনা কি হারাম না হালাল? যারা হারাম বলে জানেন তারা নোংরা চিন্তার গণ্ডির বাঁধনের ফাঁদে পড়ে আছেন–এমন অশোভন কথাটি বলতে না চাইলেও তাদের প্রজন্মই শোভন না অশোভনের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। গান বাজনা যে হালাল–এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছি। জানি, কেউ পরিষ্কার বুঝবে, আবার কেউ বুঝে আসতে চাইলেও তকদিরের বৃত্তের বাঁধন বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অধম লেখক এ বিষয়টিকে ফালতু মনে করেও লিখতে বাধ্য হচ্ছে এ জন্য যে, সুফিবাদের উপর যাদের যথেষ্ট অনুরাগ আছে এবং যারা এই বইটির ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন কেবল তাদেরকেই বলতে চাই যে, আপনারা বইটি ছাপিয়ে বিক্রি করতে পারেন, অথবা অনুরাগীদের আর্থিক সাহায্যে বার বার ছাপাতে পারি।

মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য

কাগজ : সুপার অফসেট, ইন্দোনেশিয়ান পেপার ওয়ান, ৮০ গ্রাম। প্রতিরিম কাগজের মূল্য ২৩৩০ টাকা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ। এই কাগজে খুব কম বই ছাপা হয়। বই ছাপার কালি : কোরিয়ার ডাইহান। প্রতি কৌটা : ৪২০ টাকা। তিন কৌটা কালি লেগেছে। কভারের সোনালি কালি : ডাইহান। প্রতি কৌটা : ১২২০ টাকা। এই মূল্যবান কালি দিয়ে কম বই ছাপা হয়। বাঁধাইয়ের প্রশ্নে উন্নতমানের ডোগাই বোর্ড দেওয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

০১. মেজাজি কবর ও হাকিকি কবর/৪১
০২. শয়তানের পরিচয়/৪৬
০৩. ধ্যানসাধনা সম্পর্কে আলোচনা/৫০
০৪. ইমান সম্পর্কে আলোচনা/৬৩
০৫. তকদির সম্পর্কে আলোচনা/৬৬
০৬. সৃষ্টির বিশেষত্ব ও এককাতারে বিশ্বমানবতা/৭২
০৭. ধর্ম ও সাধনা/৭৭
০৮. কেবলা ও কাবার পরিচয়-ভিত্তিক সাধন-পদ্ধতি/৮৪
০৯. কেবলা ও কাবা সম্পর্কে আলোচনা/৯৩
১০. সালাতের আলোচনা/৯৮
১১. শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের আলোচনা/১০৩
১২. বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী-লিখিত বইসমূহের আলোচনা/১০৮
১৩. *নূরে হক গঞ্জে নূর*-থেকে/১১১
১৪. নবী ও রসুল সম্পর্কে আলোচনা/১৪৫
১৫. প্রেম, আত্মা ও প্রাণের বিষয়ে আলোচনা/১৫৫
১৬. নফস ও রূহ সম্পর্কে আলোচনা/১৬৪
১৭. জন্মচক্র সম্পর্কে আলোচনা/১৬৭
১৮. নবী ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য/১৮২
১৯. সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা/১৯৬
২০. পাক পাঞ্জাতন সম্পর্কে আলোচনা/২৩৮
২১. ইমাম হোসেন (আ.)-এর শেষ ভাষণ প্রসঙ্গে/২৪৪
২২. বিশ্বাস ও প্রেম সম্পর্কে আলোচনা/২৪৬
২৩. বিধান না দর্শন?/২৫০
২৪. মারেফত কী/২৫৪
২৫. ভাল করে জেনে রাখুন/২৫৫

মেজাজি কবর ও হাকিকি কবর

কবর দুই প্রকার : একটি মেজাজি কবর, অপরটি হাকিকি কবর; একটি রূপক কবর, অপরটি আসল কবর। রূপক কবর দিয়ে আসল কবরকে চিনতে হয়, জানতে হয়, বুঝতে হয়। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। একটি চোখে দেখা যায়, অপরটি চোখে দেখা যায় না। যে কবরটি চোখে দেখা যায় না উহার পরিচয় দেবার জন্যই মূর্ত কবরের প্রয়োজন হয়, রূপক কবরের প্রয়োজন হয়, মেজাজি কবরের প্রয়োজন হয়। মেজাজি কবরকেই একমাত্র কবর মনে করলে চিন্তার বাঁধনে বিরাট গণ্ডগোল লেগে যায়। মাটির গর্তটি মেজাজি কবর, রূপক কবর, মূর্ত কবর। তাই সহজেই চোখে দেখা যায়। জীবন্ত দেহটি জীবাত্মার হাকিকি কবর, আসল কবর, মূর্ত কবর। জীবন্ত দেহ-কবরে জীবাত্মা বাস করে। জীবাত্মা অবস্থান করলেই দেহটি জীবন্ত থাকে। এই জীবন্ত দেহ-কবরেই হরদম জীবাত্মার আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। আজাবের মাত্রা কখনো ছোট, কখনো মাঝারি, কখনো ভারি, কখনো অসহনীয় ভারি। জীবন্ত দেহের মাঝে ছোটবড় সব রোগগুলো এক একটি কবরের আজাব। এই কবরের আজাব কখনো সহ্য করা যায়, কখনো সহ্য করা যায় না। অতিমাত্রায় অসহ্য আজাব যখন এই জীবন্ত দেহটি ভোগ করতে থাকে, তখনই আত্মহত্যার প্রবণতাটি দেখা দেয়। জীবন্ত দেহটি হতে যখন জীবাত্মা বাহির হয়ে যায় তখন সেই জীবন্ত দেহটিকে লাশ বলা হয়। জীবাত্মা বিহনে দেহটি আর সচল থাকে না, একদম অচল এবং অথর্ব রূপ ধারণ করে। এই অচল এবং অথর্ব দেহটিকেই লাশ বলা হয়। জীবাত্মা আমি স্বয়ং, দেহ-খাঁচাটি আমি নই। আমার দেহ-খাঁচাটির মাপ মোটামুটি সাড়ে তিন হাত। যে আমি নামক জীবাত্মা দেহ হতে বাহির হয়ে যাই, সেই জীবাত্মার মাপ কয় হাত? জীবাত্মা মাপা যায় না, কারণ জীবাত্মা দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় না উহাকে নিরাকার বলে। জীবাত্মাকে আরবি ভাষায় নফ্‌স বলা হয়। এই জীবাত্মা তথা নফ্‌স আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, কারণ জীবাত্মা তথা নফ্‌স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। কিন্তু জীবাত্মার পাশেই রূহ তথা পরমাত্মাটিকে ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মা তথা রূহ আল্লাহ্‌র হুকুম, আল্লাহ্‌র আদেশ, আল্লাহ্‌র আমর। আল্লাহ্‌র হুকুম তথা আল্লাহ্‌র আদেশ আল্লাহ্ হতে আলাদা নয়। চরম সত্যে তথা উলঙ্গ সত্যে পরমাত্মা তথা রূহ আল্লাহ্ স্বয়ং। এই পরমাত্মা তথা রূহ জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণ করেন না। ইহার আদি ও অন্ত নাই। ইহা এক ও একক। ইহা সয়ম্ভু। পরমাত্মা তথা রূহ ঘুমায় না, তাই জাগরণের প্রশ্নটি অবান্তর। পরমাত্মা তথা রূহ-এর ক্লান্তি ও অবসাদ নাই, তাই জাগরণের প্রশ্নটি অবান্তর। এই পরমাত্মা তথা রূহ আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে তিনটি স্থান ব্যতীত কোথাও থাকে না। এই তিনটি স্থানের নাম হল : প্রথমটি লা মোকাম, তারপর জিনের অন্তর, এবং তারপর মানুষের অন্তর। এই তিনটি স্থানেই পরমাত্মা তথা রূহ স্বয়ং জাত-রূপে অবস্থান করে। আর কোথাও পরমাত্মা বা রূহ-এর অবস্থান করার কথাটি সমগ্র কোরানের কোথাও নাই। তাই কোরান প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, 'আমরা তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি।' কোন জীব-জন্তু, কোন গৃহপালিত পশু অথবা কোন হিংস্র জানোয়ারের শাহারগের নিকটে রূহ থাকার কোন দলিল পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্ত প্রাণীকুল, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, হাঙ্গর-কুমির, মাছ প্রত্যেকের নফ্‌স আছে, কিন্তু পরমাত্মা তথা রূহ নাই। মানুষ এবং জিনের নফ্‌সের সঙ্গে পরমাত্মা তথা রূহ অবস্থান করছে বলেই এই দুইটি প্রাণীকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। কারণ পরমাত্মা তথা রূহ যত ক্ষুদ্র রূপেই থাক না কেন, যত অণুপরমাণু রূপেই থাক না কেন, সেই জীবাত্মা তথা নফ্‌স, পরমাত্মা তথা রূহ-এর বহনকারী। যেহেতু জিন এবং মানুষ এ দু'টি জীব পরমাত্মাকে বহন করে চলেছে, তাই তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যথায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যেহেতু আল্লাহ্ স্বয়ং রূহ-রূপে মানুষ এবং জিন নামক প্রাণীতে অবস্থান করছেন, তাই তাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটির কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে। তাই মানুষকে আল্লাহ্‌র খলিফা বলা হয়েছে। আদম আল্লাহ্‌র খলিফা, সুতরাং আদমের বংশধরেরাও আল্লাহ্‌র খলিফা। হাতি, সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, নীল তিমি যত বড়ই হউক না কেন, যত শক্তিশালীই হউক না কেন, এদের নফ্‌সের সঙ্গে রূহ দেওয়া হয় নি, তাই এইসব প্রাণীকুলের নফ্‌স নিম্নমানের এবং নির্বাচন করার ক্ষমতা হতে বহির্ভূত; তাই এইসব প্রাণীকুল তৌহিদে বাস করে। সুতরাং এই প্রাণীকুল মনের অজান্তে সবাই মুসলমান। এই সূক্ষ্ম বিষয়টির গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকেরা তালগোল পাকিয়ে ফেলে, তাই এদের গবেষণার লেখাসমূহে আত্মবিরোধের ঝুড়ি পাওয়া যায়। এইসব গবেষকেরা মনে করেন যে, অনেক কিছু অবদান রাখলাম, কিন্তু মনের অজান্তে কতগুলো ভুলের ঝুড়ি পাঠকদের উপহার দিয়ে যায়। ইহাকেই অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী বলা হয়। ইহাদের লিখনিতে রস আছে, কিন্তু মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রশ্নে বিরাট শূন্য।

প্রাণীকুল যেহেতু তৌহিদে বাস করে তাই এরা মুসলমান : এরা আল্লাহ্‌কে সেজদা করছে, করে এবং চিরদিন করবে। মাথা নত করাকেও সেজদা বলে। এই মাথা নত করাটাকেই মেজাজি সেজদা বলা হয়। ইহা কখনোই হাকিকি সেজদা নয়। হাকিকি সেজদাতে মাথা নত করলেও চলে, না করলেও চলে। মানুষ মেজাজি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আল্লাহ্‌কে সেজদা দিচ্ছে, আবার আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধগুলো অমান্য করছে; কিন্তু হাকিকি সেজদা তথা আসল সেজদায় আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অমান্য করার প্রশ্নই আসতে পারে না, কারণ ইহা দায়েমি সেজদা, মেজাজি সেজদা নয়। মেজাজি সেজদার পটপরিবর্তন হয়, কিন্তু হাকিকি সেজদার পটপরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না, কারণ ইহাই দায়েমি সেজদা। মেজাজি নামাজিকে ওয়াইল নামক দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে কোরানে। দায়েমি নামাজিকে এ রকম ভয় দেখাবার প্রশ্নই আসতে পারে না; কারণ মহানবী বলছেন যে, 'ওয়াক্তিয়া নামাজ হতে অনেক বেশি দায়েমি নামাজের মর্যাদা।' স্বয়ং কোরান ঘোষণা করছে, 'মুসল্লি সে-ই, যে দায়েমি নামাজের মধ্যে অবস্থান করে'। মেজাজি নামাজ আদর্শলিপি পাঠ করা শেখায়, সুতরাং মেজাজি নামাজের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নাই। গবেষকরা যখন মেজাজি নামাজকেই একমাত্র নামাজ বলে ধরে নেন, তখনই মূল দর্শন হতে ছিটকে পড়েন এবং ভুল দর্শন প্রচার করেন। এই ভুল দর্শনের ফলে মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে দায়েমি

নামাজের দর্শনটি হারিয়ে যেতে থাকে এবং মেজাজি নামাজটি একমাত্র নামাজ বলে প্রতীয়মান হয়। কোনো একজন পরিচিত লোক বলেছেন যে, একটি মিথ্যাকে সতেরবার 'সত্য সত্য', বলে প্রচার করলে ইহাতে সত্যের তাছির পরিলক্ষিত হয়। লোকটির দর্শন যদিও হালকা দর্শন, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় সর্ববিষয়ে, সর্বদর্শনে ইহার তাছির আমরা হরহামেশা দেখতে পাই। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, একটি বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে অনেক বিষয়ের কথা আপনি এসে পড়ে, অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতো, তাই অধম লেখক নিরুপায় হয়ে এতগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছি।

এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি সেই বিষয়ে ফিরে গেলাম। জীবাত্মা বিহনে জীবন্ত দেহটি যখন লাশে পরিণত হয় তখনই সেই লাশটিকে মেজাজি গর্ত নামক মেজাজি কবরে ইজ্জতের সাথে শোয়ায়ে দেই এবং বাঁশ, চাটাই ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেই। এই বাঁশ-চাটাই, মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা কবরটিকেই মেজাজি কবর বলা হয়। এই কবরে কেবল লাশটি অবস্থান করে, জীবাত্মা নয়। সুতরাং জীবাত্মা তথা নফ্স তথা আমার এই রকম মেজাজি কবরে প্রবেশ করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যে মেজাজি কবরে আমি নাই অথচ লাশটি আছে, সেই কবরে আজাব হবার কথাটি ধরে নিতে হয়। এই মেজাজি কবরে নফ্স তথা আমি থাকলে তো আজাব হবে। আমি নাই, আছে আমার লাশটি। সুতরাং আজাবের প্রশ্নটি পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। মেজাজি কবরে আমি থাকলে তো শাস্তি হবে। যেহেতু আমি মেজাজি কবরে নাই, তাহলে শাস্তির প্রশ্নটিও মেজাজি। সুতরাং মেজাজি কবরটি হল আসল কবরের পরিচয় জানার আদর্শলিপি। অংক, এলজেবরা এবং গণিতের যে রকম ধারাবাহিক ফর্মুলা থাকে, সে রকম ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে ফর্মুলা আছে। এই ফর্মুলার প্রত্যেকটির দুইটি রূপ আছে : একটি মেজাজি এবং অপরটি হাকিকি।

শয়তান দুই প্রকার : একটি মেজাজি শয়তান, অপরটি হাকিকি শয়তান। মেজাজি শয়তান পৃথিবীর একটি দেশের একটি নগরীর একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করে : সেই দেশটির নাম সৌদি আরব, সেই নগরীর নাম পবিত্র মক্কা নগরী, সেই বিশেষ স্থানটির নাম মিনা। এই মিনাতেই তিনটি মেজাজি শয়তান অবস্থান করছে : একটি বড়, একটি মাঝারি এবং একটি ছোট। এই শয়তান তিনটিকে হাজিরা কংকর ছুড়ে মারেন। হাজিরা জানেন না যে, এই তিনটি শয়তান যে পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে সেই পাথরগুলো তৌহিদে বাস করে। হাজিরা জানেন না যে, যে কংকরগুলো এই তিনটি মেজাজি শয়তানকে ছুড়ে মারেন সেই কংকরগুলোও তৌহিদে বাস করে। হাজিরা জানেন না যে, তাদের যে হাত দিয়ে কংকরগুলো ছুড়ে মারেন সেই হাতগুলোও তৌহিদে বাস করে। হাজিরা জানেন না যে, তৌহিদে বাস করে না কেবল একটি জিনিস : সেই জিনিসটি হল প্রতিটি হাজির প্রতিটি অন্তর। এই তিনটি মেজাজি শয়তানকে হাজিরা যে কংকর ছুড়ে মারেন, এই মারাটাই আসল শয়তানকে চিনবার, জানবার এবং বুঝবার একটি উজ্জ্বল এবং পবিত্র আদর্শলিপি। সুতরাং এই আদর্শলিপিকে এড়িয়ে যাওয়া, গুরুত্ব না দেওয়া, এবং একটি হাল্কা বিষয় বলে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়, কারণ এই প্রেসক্রিপশন তথা ব্যবস্থাপত্রটি মহানবী দিয়ে গেছেন।

হিন্দু-শাস্ত্রে চিতা তথা শ্মশান দুই প্রকার : একটি মেজাজি চিতা তথা শ্মশান, এবং অপরটি হাকিকি তথা আসল শ্মশান। আসল শ্মশান তথা চিতাতে জীবাত্মাবহনকারী জীবন্ত দেহটি প্রতিনিয়ত বৈষয়িক চিতার লেলিহান আগুনে জ্বলছে। মুসলমান-শাস্ত্রে জীবন্ত দেহটিকে যেমন কবর বলা হয়, তেমনি হিন্দু-শাস্ত্রে জীবন্ত দেহটিকে জ্বলন্ত আগুনের চিতা বা শ্মশান বলা হয়। অপরপক্ষে মেজাজি চিতা তথা শ্মশানে জীবাত্মা তথা নফ্স না থাকা মৃত দেহটিকে দাহ করা হয়। সুতরাং নফ্স তথা আমি কখনোই মেজাজি তথা রূপক চিতা তথা শ্মশানে জ্বলব না, জ্বলছি না এবং কোনদিনও জ্বলি না। কারণ মেজাজি চিতা বা শ্মশানে আমার অবস্থানটি নাই, আছে কেবল আমার মৃতদেহটি। সুতরাং আমার মেজাজি চিতা তথা শ্মশানে জ্বলার তথা দাহ করার অগ্নিজ্বালা অনুভব করার প্রশ্নটি আসতে পারে না। কারণ জীবাত্মা তথা নফ্সটির বাহন হল এই দেহটি। বাহন কখনো আমি নই; সুতরাং মেজাজি কবর অথবা মেজাজি শ্মশানে আমার থাকার প্রশ্নটি অবান্তর। ট্রেন অথবা মোটর গাড়ির একসিডেন্টে পুরো পা-টি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, সেই পা-টি আমার চোখের সামনে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে, অথবা কোন গর্তে মাটি-চাপা দিয়ে রাখলে আমার কিছুই আসে যায় না, কারণ জীবাত্মা তথা নফ্স হতে সেই পুরো পা-টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং আমার মেজাজি কবরে যাওয়াটা অথবা মেজাজি চিতা বা শ্মশানে দাহ করবার প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ লাশটিতে তথা মরা দেহে আমার আর অবস্থান থাকে না, তাই এই বিষয়টিতেও গবেষকেরা মনের অজান্তে ভুল করে বসেন, এবং সুস্থ চিন্তাটিকে রোগা করে ফেলেন এবং নানা প্রকার আবোল-তাবোল, উল্টাপাল্টা এবং আজগুবি মনগড়া দর্শন প্রচার করে দর্শকের পাতে বিভ্রান্তির লাবড়া তুলে দেয় : এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য, এটাই আমাদের পোড়া কপাল। আচার-অনুষ্ঠান যখন মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলতে থাকে, তখনই সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো অনাচারে পরিণত হয় এবং বিভ্রান্তির গোলক-ধাঁধা আপনা আপনিই তৈরি হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিলেই বৈরাগ্য হয় না, বরং নিজের ভিতর খান্নাসরূপী শয়তানটিকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিতে পারলেই হয় সত্যিকার বৈরাগ্য। সুতরাং কোন মানুষই মেজাজি কবরে যায় না, এবং আল্লাহ্‌র কোনো অলী মাজার বা রওজায় অবস্থান করেন না : অবস্থান করে সাধারণ মানুষের লাশটি, অবস্থান করে মাজার ও রওজাতে অলীদের পবিত্র নুরানি লাশ মোবারক। সুতরাং অলীদের মাজার ও রওজা একটি পুতপবিত্র চিহ্ন বা নিশানা ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য প্রাচীন কালের সেমিটিক চিন্তাধারার গোবর-গণেশী-মার্কা চিন্তাধারার ফসল অনেক গবেষকের
মন-মস্তিষ্কে জিনের আছরের মত ভর করে বসে। সুতরাং চরম সত্যে এই গবেষকদেরকেও দোষারোপ করা যায় না, যদিও এদের

দর্শনগুলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত দূষিত, কলুষিত এবং কলঙ্কিত : অথচ এই গবেষকেরা মনে করেন যে, বিরাট বিরাট কর্মের দায়িত্ব পালন করে গেলাম। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এইসব শ্রদ্ধেয় গবেষকরা না বুঝে না শুনে মজ্জুব মাস্তানদেরকে যা-তা গালাগালি করতে দ্বিধাবোধ করেন না, এমনকি এদের অর্ধ-উলঙ্গ অথবা উলঙ্গ অথবা লাল শালুকাপড় পরা দেখে ভণ্ড বলতেও সামান্য চিন্তাভাবনা করেন না। পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমি মেজাজি কবরে যাব না, যেতে পারি না এবং যাবার বিধান নাই। যেহেতু আমার দেহটি আমারই পরিচয় এতকাল বহন করছিল, তাই মনের মধ্যে একটি ভুল ধারণা হয় যে, আমিও দেহের সঙ্গে কবরে যাব। এই ভুল ধারণাটি ইচ্ছাকৃত নয়, মনের অজান্তে এই ভুল ধারণাটি আপনা আপনি এসে যায়। আমি কখনোই মেজাজি শ্মশানে যাব না, যেতে পারি না এবং যাবার বিধান নাই। মেজাজি শ্মশানে আমার দেহটিকে জ্বালাবে, আমাকে নয়। কারণ আমি সমস্ত দেহ হতে বিদায় গ্রহণ করেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি; সুতরাং আমার লাশটাই মেজাজি শ্মশানে জ্বলবে। আমি নামক জীবাত্মাটি জ্বলবে না এবং জ্বলবার বিধান নাই। সুতরাং মেজাজি কবর এবং মেজাজি শ্মশান কেবল আমার লাশটিকেই ধারণ করতে পারে, আমি নামক জীবাত্মাটিকে ধারণ করতে পারে না এবং ধারণ করার বিধান নাই। জীবাত্মা দেহধারণ করলেই পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন আসে। জীবাত্মা দেহধারণ না করলে পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটি অবান্তর। বিদ্যুতের প্রকাশস্থল হল বাল্বটি। বাল্বের মধ্যেই বিদ্যুৎ আলো ছড়ায় এবং আলোর প্রকাশ ঘটে। কিন্তু মনে হবে বাল্বই বিদ্যুৎ। যখন বাল্বটি বিদ্যুৎ প্রকাশের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে তখনই বাল্বটি নামধারণ করে ফিউজ বাল্ব, তথা আলো ছড়ানোর শক্তি আর নাই, তথা মরা বাল্ব। মরা বাল্ব জঞ্জাল, তাই ফেলে দেওয়া হয়।

শয়তানের পরিচয়

মেজাজি শয়তানের পরিচয় ও ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তানের পরিচয় ও ব্যাখ্যা সামান্য দিতে চাই। হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তান, পবিত্র কোরান অনুসারে, চার প্রকার : ইবলিশ, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস। এই চার প্রকার শয়তানকে আল্লাহ্ পাক মাত্র দুইটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। এই দুইটি স্থান ছাড়া এই চার প্রকার শয়তানকে আর কোথাও থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি, এমনকি আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের আর কোথাও থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি। যে দুইটি নির্দিষ্ট স্থানে এই চারটি শয়তানকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেই স্থান দুইটির নাম হল : জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর ছাড়া এক পা-ও বাহিরে যাবার ক্ষমতা শয়তানের নাই। সুতরাং জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর ছাড়া এই চারটি শয়তানের থাকবার আর কোন বিন্দুমাত্র স্থান নাই। আকাশ হতে শয়তানেরা যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে তথা ফেলতে থাকে, উহা পৃথিবীর আকাশ নয়, বরং প্রতিটি মানুষের মনের আকাশ। এই মনের আকাশ হতেই শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার তরে, দিশেহারা করার তরে, বিপথে নেবার তরে, অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। চরম সত্যে মানুষের মনের আকাশে শয়তান যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে, ইহা শয়তানের ডিউটি। মানুষটি দুনিয়াই চায়, না আল্লাহ্কে চায়, এই পরীক্ষা করার জন্যই এহেন আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার কথাটি আসে। যদি পরীক্ষা করার প্রশ্নটি না থাকত তাহলে মনের আকাশে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার প্রশ্নই উঠত না। সুতরাং শয়তান বাহিরে থাকে না, থাকবার বিধান নাই। দুধ আর মাখন যেভাবে দুধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, এবং দুধের মাঝে যে মাখন আছে ইহা বুঝবার উপায় থাকে না, সে রকম মানুষের অন্তরে যে শয়তান অবস্থান করছে ইহাও বুঝবার উপায় থাকে না। সুতরাং প্রতিটি মানুষ মনে করে যে সে একা, কিন্তু আসলে সে মোটেই একা নয়। যেহেতু প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শয়তানকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে সেই হেতু মানুষ দুইজন, অনেকটা একের ভিতরে দুইয়ের মত। কিন্তু ইহাও সত্য নহে। কারণ জীবাত্মার সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান পাশাপাশি অবস্থান করছে, সে রকমভাবে আরেকজন অবস্থান করছে। সেই আরেকজনের নাম হল রূহ তথা পরমাত্মা তথা স্বয়ং আল্লাহ্। তাই প্রতিটি মানুষের শাহারগের নিকটেই আল্লাহ্ আছেন বলে ঘোষণাটি দেখতে পাই। অন্য কোনো
জীব-জানোয়ারের শাহারগের নিকটে আল্লাহ্র অবস্থানটির ঘোষণা কোরানে পাই না। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, যেহেতু জিন নিয়ে আমাদের কোন কাজ কারবার নাই, তাই আমরা ইচ্ছা করেই জিন বিষয়টিকে বাদ দিলাম, যদিও জিন এবং মানুষকেই আল্লাহ্র ইবাদত করার কথাটি বলা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহ্র ইবাদতে ডুবে আছে, তাই ইবাদত করার আদেশ দেবার প্রশ্নই আসে না। যেহেতু মানুষ এবং জিনকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে, সেহেতু ইবাদত করার উপদেশটি প্রযোজ্য। যখন শয়তান অহংকার করে তখন শয়তানের রূপটির নাম হল ইবলিস। বালাসা শব্দটির অর্থ হল অহংকার। ইহা হিব্রু ভাষা, আরবি ভাষা নয়। বালাসা তথা অহংকার শব্দটি বিশেষ্য তথা নাউন, ইবলিস তথা অহংকারী শব্দটি বিশেষণ তথা এডজেকটিভ, সুতরাং শয়তানের আদিরূপ ইবলিস তথা অহংকারী। কারণ আদমকে সেজদা দিবার হুকুমটি সরাসরি অমান্য করার দরুণ সে অহংকারী হয়ে গেল, তথা ইবলিস হয়ে গেল। তাই ইবলিসই হল শয়তানের প্রথম এবং আদিরূপ। মানুষ জীবনধারণের প্রশ্নে যখন বিভিন্ন প্রকার লোভ-লালসার খপ্পরে পড়ে যায় এবং জীবনধারণের প্রশ্নে বৈষয়িক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাতে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হতে থাকে, সেই আঘাত-খাওয়া অবস্থানটির নাম শয়তান। তাই পবিত্র কোরানের যে কোনো পবিত্র সূরা পাঠ করার আগে আমাদের বলতে হয় যে, পাথরের আঘাত-খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই। হাজিরা যে শয়তানকে পাথর ছুড়ে মারে সেই মেজাজি বিষয় হতেই হাকিকি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বুঝতে পারে, কেউ

পারে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। সুতরাং চরম পর্যায়ে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে বিন্দুমাত্র ভুলের অবকাশ নাই। ইহাই পবিত্র কোরানের পবিত্র সূরা মুলকে বলা হয়েছে। কেউ বোঝেন, কেউ বোঝেন না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। তকদিরের বলয় হতে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ছাড়া বেরিয়ে আসা অসম্ভব। জিন এবং মানুষের অন্তর ছাড়া শয়তানের অবস্থানটির কথা যদি অন্য কোথাও আছে বলে কেউ লিখে তো ধরে নিতে হবে যে, সে ইসলামের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, কেবল হাউকাউ করে বড় বড় কথার ফুলঝুড়ি ছড়ায়ে, আরবি ব্যাকরণের তেলেসমাতি দেখিয়ে সরল মানুষগুলোকে লিখনির মাধ্যমে বিভ্রান্ত, দিশেহারা করে তুলছে। যে মানুষটি কেবলমাত্র দুনিয়াই চায় এবং যার দুনিয়া চাওয়া ছাড়া আর কোন চাওয়াই থাকে না, তাকে মরদুদ বলা হয়। মরদুদের স্থান হাবিয়া দোজখ। হাবিয়া দোজখের তলা থাকে না। যে মানুষটির দুনিয়া চাওয়ার সীমা থাকে না সেই মানুষটিকে তলা-ছাড়া হাবিয়া দোজখে যেতে হয়। এই মরদুদ শব্দটি পবিত্র কোরানে কয়েকবার পাওয়া যায়। যে শয়তান সর্ববিষয়ে সর্বঘটনায় পিছু পিছু কুমন্ত্রণা দিতে থাকে তার নাম খান্নাস। শয়তানের এই খান্নাসরূপটি ভয়ংকর এবং বিপদজনক। তাই খান্নাসের কুমন্ত্রণা হতে পবিত্র কোরান মুক্তি চাইবার উপদেশ দিয়েছেন। অবাক লাগে যে, শয়তানের এই খান্নাসরূপটি এত ভয়ংকর অথচ সমগ্র কোরানে মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে। কাউসার শব্দটি এবং আহাদ শব্দটি সমগ্র কোরানে মাত্র একবার করে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি খান্নাস শব্দটিও একবার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এই তিনটি শব্দের মাঝে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। এই তিনটি শব্দের অর্থ ব্যাকরণ দিয়ে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মাতে পারে, কিন্তু গভীর রহস্য অনুধাবন করতে হলে হৃদয় দিয়ে গবেষণা করতে হয়। সুতরাং পরিশেষে আবার একই পুরোনো কথাটি বলতে চাই যে, জিন এবং মানুষের অন্তর ছাড়া শয়তানের থাকার আর একটি স্থানও নাই। এই খান্নাসরূপী শয়তানটি, যাহা প্রতিটি মানুষের অন্তরে অবস্থান করছে, উহাকে তাড়িয়ে দেবার বহু প্রকার উপদেশের আরেক নাম পবিত্র কোরান। যত প্রকার মোরাকাবা, মোশাহেদা, ধ্যানসাধনা, এবাদত- বন্দেগি, কান্না ও বিলাপ, নফ্‌সকে ইচ্ছা করে নানা প্রকার কষ্ট দান করা, সবই এই খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার একমাত্র উদ্দেশ্যে। আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নাই এবং থাকার কোন বিধান রাখা হয়নি। তাই পবিত্র কোরানের সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে মানুষ, তুমি একা হও এবং একা হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাক দাও, তাহলে ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে। আরবি ভাষায় দুইজনে ডাক দিলে বলা হয় উদ্‌উনা, আর একজনে ডাক দিলে হয় উদ্‌উনি। কোরান উদ্‌উনি তথা একা শব্দটি ব্যবহার করেছে। উদ্‌উনা তথা দুইজন থাকলে ডাকের জবাব পাওয়া যাবে না। আমি এবং খান্নাসরূপী শয়তান মিলে দুইজন। কারণ খান্নাসরূপী শয়তান বাহিরে থাকে না, বরং আমার অন্তরেই অবস্থান করছে। সুতরাং আমরা দুইজন। এই দুইজন থাকলে আল্লাহ্‌ ডাকের জবাব দেন না। এই দুইজনের অবস্থানটাকেই উদ্‌উনা বলা হয়। খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়াও এবং তাড়াতে পারলে তুমি একা হবে, এবং একা হলে ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে। ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি (র.) জাবরুত মোকামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রব (আল্লাহ্‌), আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।' রব বললেন, 'বায়েজিদ, তুমি মিথ্যুক। কেননা যদি তুমি সত্যিই সন্তুষ্ট থাকতে তাহলে সন্তুষ্ট থাকার কথাটি বলতে না।' বায়েজিদ লজ্জায় মাথা নত করে পুনরায় কঠোর ধ্যানসাধনায় মগ্ন রইলেন। এভাবে দুই বৎসর ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থাকার পর বায়েজিদ একদিন বলে ফেললেন, 'আমিই সুবহানি, সব শান আমারই।' *('আনা সুবহানি মাআজামু শানি।')* লা মোকামে প্রবেশ করতে পারলেই এই রকম কথা বলা যায়। সুতরাং নাসুত, মালাকুত ও জাবরুত মোকামে সাধককে পীরের ধ্যানটি করতেই হবে এবং কোনো রহস্যজনক বিষয় দেখতে পেলে আপন পীরের রূপেই দেখা যায়। কিন্তু

সাধক যখন লা মোকামে প্রবেশ করেন তখন দেখতে পান, আপন পীর ডান দিক দিয়ে চলে গেছেন এবং বাম দিক দিয়ে খান্নাসরূপী শয়তানটি ভেগে গেছে। তখনই সাধক নিজের মধ্যে দেখতে পান যে, তাঁর পীরও তিনি এবং তাঁর মুরিদও তিনি। এখানেই তৌহিদ। সুতরাং পীর ধরাও শেরেক, কিন্তু ইহাই শেষ শেরেক। সুতরাং আপন পীরের অবস্থানটি জাবরুত মোকাম পর্যন্ত। লাহুত মোকামে পীর আর থাকেন না। সুতরাং লাহুত মোকামে সাধক যখন প্রবেশ করেন তখন দেখতে পান যে, আপন পীরের আধ্যাত্মিক মূল্য এক টাকাও নয়। সুতরাং আপন পীরের অবস্থানটি তিনটি মোকাম পর্যন্ত। লাহুত মোকামে প্রবেশ করলেই পীর আর থাকেন না এবং পীরের দাম আর এক টাকাও নহে। এই কথাগুলো উঁচু স্তরের নীতিনির্ধারণের কথা। তাই অনেকের ভুল বোঝার সম্ভাবনাটি থেকে যায়। এখানে পীর ধরাটা মুখ্য বিষয় নহে, মুখ্য বিষয়টি হলো আল্লাহ্‌র তৌহিদ সাগরে অবগাহন করা।

ধ্যানসাধনা সম্পর্কে আলোচনা

নিজের ভেতর যে খান্নাসরূপী শয়তানটি আছে, উহাকে কেমন করে তাড়াতে হবে? কী পথ ও মত অবলম্বন করলে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়? এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার প্রেসক্রিপশন তথা ব্যবস্থাপত্রটি একমাত্র সুফিবাদই দিয়ে গেছে। সুতরাং সুফিবাদই হল ইসলামের মূল বিষয়। ইসলামের আগমন হজরত আদম (আ.) হতে এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে আল্লাহ্‌ পাক নবী ও রসুল প্রেরণ করেছেন। আপনার ভিতরে, পরীক্ষা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেওয়া, খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে, কী উপায় অবলম্বন করলে তাড়িয়ে দেওয়া যায় তারই ব্যবস্থাপত্রটি যুগে যুগে, কালে কালে, সর্বসময়ে তাঁরা দিয়ে গেছেন।

আজ হতে অনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে যমদগ্নি মুনি যখন ধ্যানসাধনা করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন, তথা আপনার ভিতরের খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন, তখনই যমদগ্নি মুনি বলে ফেললেন, 'সোহ্‌হম সোহমী' তথা তিনিই আমি, আমিই

তিনি। সুতরাং পীর তথা গুরু ধরতেই হবে। এই পীর তথা গুরুর মাধ্যমে শিষ্যকে তথা মুরিদকে শিখে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে, কেমন করে কীভাবে কী উপায়ে নিজের ভিতরের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। আরবি ভাষায় যাকে আমরা খান্নাসরূপী শয়তান বলি উহাকেই বৈদিক যুগের মুনি ঋষিরা 'মায়া' বলে থাকেন। বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা এই মায়ার বন্ধনকেই ছিন্ন করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা বলেছেন যে, কর্ম করা বন্ধন নয়, বরং কর্মের মাঝে যখন মায়া এসে উপস্থিত হয় তখনই কর্ম বন্ধন হয়ে যায়। মায়া কর্মকে কলুষিত করে। কলুষিত কর্ম বন্ধন। মায়া বিহনে কর্ম বন্ধন নয়, বরং এবাদত। হাঁস জলের পুকুরে সারাদিন অবস্থান করে, কিন্তু সাঁঝের বেলায় পুকুর হতে যখন উঠে আসে তখন হাঁসের শরীরে আর জল থাকে না। কর্মের পুকুরে অবস্থান করো, কিন্তু মায়ার জল যেন গায়ে না লাগে। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। এ বড় ভয়ংকর সাধনা। এ বড় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হওয়া। মায়ার বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, কোনো মামুলি বিষয় নয়, কোনো ছেলের হাতের মোয়া খাওয়ার মত নয়। তাই অতি অল্প সংখ্যক মানুষই কামিয়াব হতে পারে, তথা সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তথা কামালিয়াত হাসিল করতে পারে। তাই পবিত্র কোরান বলছে যে, যাকে হেকমতের জ্ঞানদান করা হয় তাকে যথেষ্ট রহমত তথা কল্যাণ দান করা হয়। এই রকম পীর তথা গুরু ধরেই মোরাকাবা-মোশাহেদার পথেই এগিয়ে যেতে হয়। পীর তথা গুরুর আচার-আচরণের বিষয়টি এখানে মুখ্য নয়, বরং মুখ্য বিষয়টি হল কেমন করে নিজের ভেতর হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। যে পীর বা গুরু মোরাকাবা-মোশাহেদা তথা ধ্যান-সাধনার কথাগুলো মুরিদ তথা শিষ্যদের শিখিয়ে দেয় না, অথবা শেখাবার পদ্ধতি নিজেই জানে না, সে কেমন করে পীর তথা গুরু হয়? অনুমানের গুল মারা বিদ্যা এবং মহাপুরুষদের বাণীগুলোকে অনুমানের ভিত্তিতে প্রচার করে মুরিদদেরকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এই জাতীয় পীর ও গুরুদের আমরা কখনোই ব্যবসা করছে বলব না, কিন্তু এদের কাছে আসল পথটি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। কারণ সুফিবাদ বাকিতে পাবার কথাতে বিশ্বাস করে না; তথা মরে গেলে পাবে এ রকম উদ্ভট আজগুবি কথায় সুফিবাদ বিশ্বাস করে না। মহানবী হেরাগুহায় যে ধ্যানসাধনাটি করেছেন উহাতে নবুয়ত নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়; পবিত্র কোরান নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়; জিবরিল আমিনকে নগদই দেখেছেন, বাকিতে নয়। সুতরাং সুফিবাদ নগদ পাবার একটি মূল্যবান দর্শন। সুফিবাদ বলে যে, বাকির নাম ফাঁকি। সুফিবাদ বলে যে, দুনিয়াতে যে অন্ধ আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে। হজরত বাবা বু আলী শাহ্ কালান্দার সরাসরি বলেছেন যে, আসো, আমার কাছে মুরিদ হও, আমার কথা মত মোরাকারা-মোশাহেদা কর মাত্র একশত বিশ দিন, তারপর দেখ সত্যের রহস্যের দর্শন পাও কি না। যদি না পাও তাহলে দুই হাতে দুইটি পাথর নিয়ে আমার (কালান্দার) মাজারে ছুড়ে মেরে দিয়ে বলে দিও, কালান্দার মিথ্যুক। এই একশত বিশ দিনের ধ্যানসাধনায় তুমি কামেল হবে না সত্যি, কিন্তু কামালিয়াতের কিছুটা রহস্য অবশ্যই বুঝতে পারবে। ধোঁয়া যেমন আগুনের কথা মনে করিয়ে দেয়, সে রকম একটানা একশত বিশ দিন মোরাকাবায় অবশ্যই রহস্যলোকের কিছুটা পরিচয় বুঝতে পারবে। বু আলী শাহ্ কালান্দার যদিও সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারেন নি, কিন্তু আশার আলোর কথাটি জানিয়ে দিলেন। এ রকম খাড়াধাড়া কথা খুব কম অলী বলে থাকেন। পবিত্র কোরানও একশত বিশটি দিন আপন দেহের মাঝে ভ্রমণ করার উপদেশ দিয়েছেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল ফেসানী সিরহিন্দ বলেছেন 'তোমার পীরই হল তোমার প্রথম মাবুদ।' 'পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত' (*মাতলা উল উলুম* কিতাবের ছিয়াশি পৃষ্ঠা)। বাক্যটি সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এখানে লক্ষ করার বিষয়টি হল যে, উনি পীরকে প্রথম মাবুদ বলেছেন, কিন্তু আখের তথা শেষ মাবুদ বলেন নি। কারণ পীর নাসুত, মালাকুত এবং জাবরুত মোকাম পর্যন্ত ই থাকেন। সুতরাং পীর, সুফিবাদের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম মাবুদ। তাহলে শেষ মাবুদ কে? শেষ তথা আখের মাবুদ আপন রব তথা আল্লাহ্। যখন সাধকের আপন নফ্স হতে খান্নাসরূপী শয়তান বাহির হয়ে যায় তখনই আপন রব তথা আল্লাহ্ রূহ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। তখনই সাধকেরা 'আমিই সত্য' বলে ঘোষণা করেন।

আমার সুরেশ্বরী বাবার শান কত বড় রে! আমার বাবা ভাণ্ডারীর শান কত বড় রে! আমার খাজা বাবার শান কত বড় রে! আমার বড় পীর গাউসুল আজমের শান কত বড় রে–এই কথাগুলো বলা অবশ্যই ভাল; কিন্তু 'শান কত বড় রে' বললেও শান আছে, না বললেও শান আছে। প্রশ্ন হলো, আমি কী পেলাম? আমি তো বকরির তিন নম্বর বাচ্চার মত দুধ না পেয়ে সারাটি জীবন লাফালাফি করে গেলাম। একটি বারের তরেও তো একশত বিশ দিনের একটি মোবাকাবার ধ্যানসাধনা করলাম না। কেবল একবস্তা সুফিবাদের কথাই শিখলাম, একবস্তা সুফিবাদের দলিল-দস্তাবেজ আয়ত্ব করলাম এবং বাহাসের মধ্য দিয়ে, কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে হারিয়ে দিলাম, এবং মনে মনে আত্মতৃপ্তি পেয়ে বলতে লাগলাম, 'আমি কী হনুরে!' কিন্তু সুফিবাদের রহস্যলোকের বিন্দু-বিসর্গও জানার আগ্রহটি প্রকাশ করলাম না। আগের দিনের পীর-ফকিরদের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাই যে, প্রতিটি পীর-ফকির বছরের পর বছর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে গেছেন। অথচ আফসোস, অথচ বড়ই দুঃখের কথা যে, এই আধুনিক যুগের পীর-ফকিরেরা মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির কথা ভুলেও একবার উচ্চারণ করেন না। যথেষ্ট সন্দেহ করার অবকাশ থেকে যায় যে, এরা নিজেরাই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করেছেন কি না। নিজে না জানলে অপরকে জানাবে কেমন করে? তাই এত বড় মহাসত্য সুফিবাদটির দর্শন মানুষের মনে আর তেমন দাগ কাটতে দেখা যায় না। সৈনিক ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার নিয়ম-শৃংখল এদের মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু মোরাকাবার ধ্যান-সাধনার কথাটি দুরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ কিছু একটা ধরে রাখতে চায়, এটাই মানুষের স্বভাবধর্ম। উপযুক্ত পথের সন্ধান দিতে পারলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ

নির্বিশেষে গ্রহণ করে নেবার আগ্রটি প্রকাশ করবে। মানুষ কোনো কিছু পাবার একটি নিশ্চয়তা চায়। কিন্তু নিশ্চয়তা দেওয়া তো দূরে থাক, নিজেরাই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির বিষয়ে উদাসীন, না হয় তো অজ্ঞ। এরা সুফিবাদের ধারক বাহক হয়েও সুফিবাদের দর্শনটিকে বাকিতে বিক্রি করে, তথা মরে গেলে পাবার সুসংবাদটি দান করে। অথচ সুফিবাদের দর্শনটি হল একদম নগদ। তাই আজকাল আমরা সুফিবাদে বিশ্বাসীদের সঙ্গীতে বাকিতে পাবার বিলাপ শুনতে পাই : 'মরণ কালে দয়াল দেখা দিও রে', এ রকম তেলেসমাতি গান বিলাপ আর কান্নায় গেয়ে থাকে। অবশ্য এ কথাটিও অপ্রিয় সত্য যে, যাদের বুঝবার আন্তরিক আগ্রহটি নাই তাদেরকে শত বুঝালেও কোনো কাজ হবে না। বিত্ত-বৈভবের মোহ যাদেরকে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের মত গ্রাস করে ফেলেছে তাদের কাছে সুফিবাদের তো বহু দূরের কথা, ধর্ম বিষয়ের সাধারণ আদেশ-উপদেশগুলো কোনো কাজে আসে না। এরাই মানুষের সুরতে অসুর। এরাই সমাজের ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলাকে ভেঙে চুরমার করেছেন। এরা প্যাঁচঘোচ দিয়ে কথা বলার ঝানু সৈনিক। এরাই গরিব-দুঃখী, এতিম-মিসকিনের হক মেরে দিতে সামান্য দ্বিধাও করেন না। এরাই গরিব-দুঃখীদের বুকের উপর পারা দিয়ে মিলাদ মাহফিলে যোগ দেয়। এরাই কাঁচা-গলা মোমের মত সহজ-সরল গরিব-মিসকিনদের জন্য দেওয়া ত্রাণসামগ্রী মেরে দিয়ে গুদামজাত করে। এরা মানুষের চেহারায় হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও খারাপ। হিংস্র জানোয়ার সিংহ-বাঘের পেট ভরে গেলে বিশ্রাম নেয়, আর শিকার করে না। এরা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েও গরিব-মিসকিনদের ত্রাণসামগ্রী লুণ্ঠন করে গুদামজাত করে। এদের অনেক আছে, কিন্তু এদের চাওয়ার শেষ নাই, এদের পাওয়ার শেষ নাই। পবিত্র কোরান এদের বিষয়ে বলছে, 'তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ, যে ধর্মকে প্রথমে অস্বীকার করে? সে সেই মানুষটি, যে এতিম-গরিব-মিসকিন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

নফ্স তথা আমি পবিত্র। তখনই নফ্স অপবিত্র হয়, যখন খান্নাসরূপী শয়তানটি আমার মধ্যে অবস্থান করে। আমি + খান্নাসরূপী শয়তান = আমিত্ব/অহম/হাস্তি/খুদি/ইগো সেন্ট্রিসিটি। এই আমিত্বকেই পরিত্যাগ করার আদেশটির নাম কোরান শরীফ। কোরানে আদেশ-উপদেশের বিচিত্র ভঙ্গি ও শৈলী পাওয়া যায়। বিচিত্র আদেশ-উপদেশে, বিচিত্র কথা ও রূপকথার মাধ্যমে এই আমিত্বটিকে তাড়িয়ে দিয়ে একা হতে বলছে পবিত্র কোরান। চরম সত্যে এই একটি মাত্র আদেশ-উপদেশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন আদেশ-উপদেশ নাই। ঘাত অনেক, নদী একটাই। স্বর্ণের অলংকার বহু, কিন্তু গলিয়ে ফেললে একই সোনা। দেশ ও জলবায়ুর প্রশ্নে গরুর আকার অনেক রকম, কিন্তু দুধ একই। বৈদিক যুগের মুনি-ঋষি হতে আজকের এই আধুনিক যুগের সুফিদের একই কথা, একই উপদেশ। কিন্তু উপদেশের ভাষা ও বাক্যের স্টাইল অনেক রকম। তাই এক কামেল পীরের যদি উপযুক্ত হতে পার, তাহলে সকল পীরের রহমতের দরজা তোমার জন্য খোলা থাকবে। যদি এক কামেল পীরের দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত হও, তাহলে দেখতে পাবে, সকল কামেল পীরের রহমতের দরজা বন্ধ। কামেল পীরেরা অনেক ধ্যান-সাধনা করার পর আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত অর্জন করতে পেরেছেন। সেই রহমতটি আর কিছুই নয়; কেবলমাত্র খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রূহ তথা আল্লাহ্ স্বয়ং রবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন নফ্সটি হয়ে যায় রূহ-এর বাহন মাত্র। নফ্স মোতমায়েন্না হবার পর আরও যদি ঊর্ধ্বস্তরে গমন করতে পারে, এবং পরিশেষে চরম পর্যায়েও অবস্থান নেয়, তবু নফ্স সৃষ্ট; তথা প্রতিটি মানুষ যদি ঊর্ধ্বজগতে বিচরণও করে, তবু সে সৃষ্ট। কারণ নফ্স সৃষ্ট, কিন্তু রূহ সৃষ্ট নয়। রব আল্লাহ্র আদেশ তথা আল্লাহ্ স্বয়ং। চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের মত যখন মানবীয় নফ্সটিকে রূহ তথা আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে, তখন নিজেকে আর দেখতে পান না। তখনই সাধক বলে ফেলেন, *'আনাল হক'* তথা আমিই সত্য। তখনই শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব বলে ফেলেন, *'তুই মুই, মুই তুই'* তথা তুইই আমি, আমিই তুই। এই দর্শনটিকে পবিত্র কোরান এভাবে বলছে যে, *'আপনি পাথর ছুড়ে মারেন নি বরং আমিই ছুড়ে মেরেছি। ওটা আপনার হাত নয়, বরং ওটা আমার হাত।'* যদিও মানবীয় সত্তাটি সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সেফাত তথা গুণ, সেফাত কখনো জাত নয়, বরং জাত হতে সেফাতের আগমন। তাই বলা হয়ে থাকে, মানুষ আল্লাহ্ নয় : আবার আল্লাহ্ হতে আলাদাও নয়। ডালিম গাছ নয় : আবার গাছ হতে আলাদা নয়। পবিত্র বোখারি শরিফেও বলা হয়েছে যে, বান্দা নফল এবাদত করতে করতে আল্লাহ্র এত নিকটে এসে পড়ে যে, বান্দার জবান আল্লাহ্র জবান হয়ে যায়; বান্দার চোখ আল্লাহ্ চোখ হয়ে যায় এবং সেই চোখে দেখে; বান্দার কান আল্লাহ্র কান হয়ে যায় এবং সেই কানে শ্রবণ করে; বান্দার হাত আল্লাহ্র হাত হয়ে যায় এবং সেই হাতে কর্ম করে; বান্দার পা আল্লাহ্র পা হয়ে যায় এবং সেই পা দিয়ে হাটে। যদিও চরম সত্যে বান্দা সেফাত, জাত নয়, তবু সেফাতের মধ্যে জাত আপনরূপে উদ্ভাসিত হতে পারে; কিন্তু জাতের মধ্যে সেফাতের অবস্থানটি হয় না। ইহা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ইহা একটি চিকন চিন্তা। ইহা একটি রহস্যলোকের কথা, যা সবার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভবপর নয়। মহানবী রহমাতুল্লিল আল আমিন তথা সমস্ত আলমের রহমত, তাই মহানবী সবারই শিক্ষা ও দীক্ষার মহাগুরু। যারা এই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়টি অবগত নয় তথা বুঝতে পারে না তাদেরকেই মহানবী সৈনিক-ধর্ম পালনের প্রেসক্রিপশন তথা ব্যবস্থাপত্রটি রহমতরূপে দিয়ে গেছেন। পাঠশালার শিক্ষা, স্কুলের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা–সবই শিক্ষা, তবে প্রকারভেদ অবশ্যই আছে। কোন শিক্ষাকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নাই। প্রতিটি সেফাত তথা গুণ জাত হতে আগমন করেছে। এমনকি একটি ধুলিকণাও আল্লাহ্র সেফাতের সেফাত হয়ে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো অস্তিত্বই নাই। অস্তিত্ব না থাকাটাই একটি বিরাট শূন্য। শূন্য যোগ শূন্য সমান সমান শূন্য। আধুনিক বিজ্ঞান অস্তিত্ববিহীন কিছুরই অবস্থান থাকতে পারে না বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছে। তাই বলা হয়েছে, *'ওয়াহাদাহু লা শরিকা লাহু।'* তথা তিনিই একমাত্র এবং তার কোন শরিক নাই। সামান্য একটি ধুলিকণাও যদি বলে ফেলে যে, আমি যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, আল্লাহ্র অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থান করছি, তাহলে ধুলিকণা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন

আল্লাহ্‌র সঙ্গে শেরেক করছে। তাই আল্লাহ্‌ লা শরিকা লাহু। সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক যেমন ওয়াহেদ তথা এক, তেমনি আবার আহাদও, তথা স্বয়ম্ভু। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা আল্লাহ্‌র এই স্বয়ম্ভু রূপটির রহস্য অনুধাবন করতে না পেরে আল্লাহ্‌কে পৃথকরূপে দেখার দর্শনটি প্রচার করে। দার্শনিক কান্ট, হেগেল, বার্গসঁ, দেকার্তে এ রকম ভাবেই আল্লাহ্‌র পরিচয়টি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যতটুকু উপলব্ধি, ততটুকুই বৃত্ত। উপলব্ধি যত বড়, বৃত্তটিও ততই বড়। সুতরাং চরম সত্যে গালি নাই। তাই কোরান বলছে যে, যে যতটুকু বোঝা বহন করার উপযুক্ত তাকে তার বেশি বোঝা দেওয়া হয় না। মত ও পথের বিভিন্নতা আছে বলেই জ্ঞানরাজ্যে যে রকম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তেমনি অনেক রকম বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কুলি-মজুর, কামার-কুমার, তাঁতি-জেলে হতে ডাক্তার -ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী-দার্শনিক সবাইকে আল্লাহ্‌ পাকের একটি অদৃশ্য সুতার মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই লীলাখেলা বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই আল্লাহ্‌ নিজেকে নব নব রূপে সেফাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

নফ্‌স আমি, রূহ আমি নই। নফ্‌স আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব, রূহ কখনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না, কারণ রূহ সৃষ্টি নয়, বরং জাত তথা আল্লাহ্‌। যেহেতু নফ্‌স আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব, সেহেতু নফ্‌সের মাগফেরাত চাইতে হয়। যেহেতু রূহ স্রষ্টা এবং রূহ কখনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না, সেহেতু রূহের মাগফেরাত চাওয়া যায় না। যারা রূহের মাগফেরাত চায় তারা মনের অজান্তে বিরাট ভুলটি করে থাকে। যে রূহ মৃত্যুর স্বাদই গ্রহণ করে না, সেই রূহের মাগফেরাত চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এই সামান্য বিষয়টিতেও আমরা ভুল করতে দেখি। এই সামান্য বিষয়টি যারা জানে না তারা কেমন করে বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ হয়?

আল্লাহ্‌র মধ্যে কথা নাই, কথার মধ্যে আল্লাহ্‌ নাই। যখন আল্লাহ্‌ কথা বলেন, তখন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সেফাতরূপী মানুষের মুখ দিয়েই কথা বলেন। সুতরাং মানুষ যে রকম আল্লাহ্‌র রহস্য, সে রকম আল্লাহ্‌ও মানুষের রহস্য। ইহার দলিল আছে, তবে বিবেকের জ্ঞানীদের কাছে এর দলিলের দরকার হয় না। মোটামুটিভাবে দুনিয়ার একটি উপমা তুলে ধরা যায়। যৌন বিশেষজ্ঞরা একটি কথা বলে থাকেন যে, যৌন মিলনের চরম মুহূর্তে কারো পক্ষে একটি বাক্যও শুদ্ধ করে বলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং রূহরূপী আল্লাহ্‌ যখন সাধকের ভিতর উদ্ভাসিত হয়, তখন রূহ কথা বলে; যদিও সাদা চোখে আমরা দেখতে পাই যে মানুষটি কথা বলছে। তাই অলীরা বলে থাকেন যে, যার কথা সে-ই বলছে, মানুষটি তো কেবলমাত্র একটি বাহানা। তাই কোরান বলছে যে, মহানবী নিজ হতে একটি কথাও বলেন নি, বরং আল্লাহ্‌ যা বলেছেন তা তিনি বলে গেছেন। যেহেতু প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক খান্নাসরূপী শয়তানকে পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেইহেতু আবু জাহেল, আবু লাহাব, ওকবা, সায়বা এবং আবদুল্লাহ্‌র মত প্রচণ্ড সন্দেহপ্রবণ মানুষগুলো কোনো কালেই এই কথাগুলো গ্রহণ করে নিতে পারেন নি, পারে না এবং পারবেও না। যত প্রকার উপমা এবং দলিলই দেখানো হউক না কেন, এই জাতীয় প্রচণ্ড সন্দেহবাদীরা বিনাবাক্যে মেনে নিতে পারে না; ইহাই তাদের তকদির, যাহা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন। অবশ্য এ কথাটিও আংশিক সত্য বলে ধরে নিতে চাই যে, তথাকথিত মানব সভ্যতার সৃষ্টি একদিনে হয়নি বরং ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। এই তথাকথিত মানব সভ্যতার অবদান কেবলমাত্র মানুষের নয়, বরং খান্নাসরূপী শয়তানের অবদান অস্বীকার করার জো নেই বলে মনে করি। হজরত দাউদ (আ.) এবং হজরত সোলায়মান (আ.) যে বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করেছিলেন ইহাতে খান্নাসরূপী শয়তানের যে অবদান আছে ইহা কোরানেরই ঘোষণা। শয়তান কেবলমাত্র আত্মদর্শনের ধ্যানসাধনা হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। কারণ শয়তান ভাল করেই জানে যে, যে তার নফসের পরিচয়টি জানতে পেরেছে, সে তাঁর রবরূপী আল্লাহ্‌র পরিচয়টি জানতে পেরেছে। সুতরাং শয়তান ভাল করেই জানে যে, আত্মদর্শনেই রবের দর্শন হয়, এবং এই আত্মদর্শনের পথ হতে ফিরিয়ে রাখাটাই শয়তানের ধর্ম; কারণ শয়তানকে বলতে শুনি যে, সে আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণরূপে ভয় করে। শয়তান আল্লাহ্‌কে মানে, কিন্তু আদমকে মানে না, মেনে নিতে পারে না এবং মেনে নেবার ধর্মটি শয়তানের নেই। ইহাই শয়তানের অভিশপ্ত তকদির।

এখন বিরাট প্রশ্নটি হল যে, মোরাকাবা-মোশাহেদার ধ্যানসাধনাটি কেমন করে এবং কী উপায়ে এবং কী পদ্ধতিতে করলে আপনার অভ্যন্তরে রবরূপী আল্লাহ্‌ উদ্ভাসিত হবে? এখানেই পীরের প্রয়োজন, এখানেই গুরুর প্রয়োজন। গু মানে অন্ধকার, রু মানে আলো। সুতরাং যিনি অন্ধকার হতে আলোর পথ দেখিয়ে দেবেন তিনিই গুরু, তিনিই তো পীর। অবশ্য গুরু তথা পীর ধরার আগে তথা মুরিদ হবার আগে এই শর্তটি অবশ্যই থাকতে হবে যে, আপনার দেখানো এবং শিখানো মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় যদি রহস্যলোকের কোন নিদর্শন দেখতে না পাই তাহলে আপনাকে পরিত্যাগ করে অন্য গুরু তথা পীর ধরতে বাধ্য হব। কারণ পীরধরাটি এখানে আসল বিষয় নয়, বরং রহস্যলোকের রহস্য দর্শন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আমরা আগের দিনের অলীদেরকে দেখতে পাই যে, শর্তযুক্ত চুক্তিভিত্তিক মুরিদ হয়েছেন। আজ সেই বিষয়টির গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেছে। আরও অবাক লাগে যে, এই শর্তযুক্ত মুরিদ হবার কথাটি শুনলে পীর সাহেবেরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। অনুষ্ঠান করে যাও, ওয়াজ-নসিহত শুনে যাও, ইত্যাদি তাগিদ দেওয়া হয়; কিন্তু মোরাকাবা-মোশাহেদার ধ্যানসাধনার কথাটি বলা হয় না। অবশ্য আজকের বেশির ভাগ মুরিদদের মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করার আগ্রহটিও দেখা যায় না। সুতরাং রূহ আন মান ফেরেস্তা, তথা যেমন মানুষ তেমন পীর। তা ছাড়া মুরিদদের সংখ্যা দিয়ে পীরের গুণ নির্ণয় করা হয়। আমার পীর কুতুবুল আখতার, আমার পীর দরবেশ, আমার পীর গাউসুল আজম বলাটি অবশ্যই ভাল এবং শোভনীয়, কিন্তু আমি কী পেলাম, আমি কী জানলাম, আমি কী বুঝলাম, আমি রহস্যলোকের কী পরিচয় পেলাম ইত্যাদি প্রশ্নগুলো যাদের বিবেকের দরজায় আঘাত করতে থাকবে, তারা অবশ্যই সত্য-সুন্দর পথে এগিয়ে যেতে পারবে। আমার পীর আদর্শবাদী না মাংগু পীর, অথবা ফুজায়েল ইবনে আয়াজের মত ডাকাত কি না, সেই বিষয়টি এখানে ধর্তব্য নয়। কারণ আদর্শ ও প্রেম এক জিনিস নয়। আদর্শ দিয়ে আদর্শবাদী হওয়া যায় এবং

প্রেম দিয়ে প্রেমিক হওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের এডওয়ার্ড ধোপার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, যার দরুণ বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসতে পারেন নাই। সিংহাসনে বসাটা ছিল একটা নিরেট আদর্শ, আর সিংহাসনটি হাসিমুখে পরিত্যাগ করে ধোপার মেয়ে নিয়ে সংসার করাটা ছিল প্রেম। আল্লাহ্ বলেছেন, 'কে আমাকে ভালবাসতে চায়? সে যেন আমার রসুলকে অনুসরণ করে।' এখানে ভয় এবং সুন্নত শব্দটি নাই, বরং আছে হুব্বুল তথা প্রেম। এখানে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, অনুকরণ নয়। কারণ মহানবীকে পরিপূর্ণরূপে অনুকরণ করাটি সম্ভবপর নয়। সুতরাং অনুসরণ আর অনুকরণ এক বিষয় নয়। যিশুখ্রিস্ট যখন কাঁটায় বানানো মুকুট পরে নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক কিশোরি অবাক হয়ে বলেছিল, 'প্রভু, এ কী দৃশ্য দেখছি আমি! কয়েক মাস আগে আমার নিকটাত্মীয় মৃত লেজারাসকে "জীবিত হও" বলার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে গেল। যিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন, যিনি অন্ধকে চক্ষুদান করতে পারেন, যিনি কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করতে পারেন, যিনি মাটি দিয়ে বানানো পাখিটিকে ফুঁৎকার দিয়ে জীবন্ত করতে পারেন, তিনি কেন কাঁটার মুকুট পরিধান করে নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন!' যিশুখ্রিস্ট তথা হজরত ঈসা (আ.) কিশোরিকে বললেন, 'কন্যা, মানুষের সুরতে যারা অসুর তারা কোনোদিন দেবতাকে গ্রহণ করে নি, করে না এবং করবেও না। তাই আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি।' ক্রুশে বিদ্ধ করার পর ইহুদি আলেম-ওলামারা একটি সাংঘাতিক যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছিল। বলেছিল, 'আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার; কিন্তু আজ আমরা তোমাকে শূলে চড়িয়েছি এবং এই শূল হতে যদি তুমি বেরিয়ে আসতে পার তাহলেই তোমাকে সত্য নবী বলে মেনে নিব। আর যদি আমাদের দেওয়া শূলীতেই তোমার মরণ হয়, তাহলে সত্য নবী বলে মানব না।' কী সাংঘাতিক ধারালো যুক্তিপূর্ণ কথা। আজও এই যুগে যদি আমরা সেই স্থানে অবস্থান করতাম তাহলে কি ঐ ইহুদী আলেম-ওলামাদের ধারালো যুক্তির খপ্পরে পড়ে যেতাম না? কারণ ইহুদিদের শূলীতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যিশু বেরিয়ে আসেন নি, কারণ ঐ শূল হতে বেরিয়ে আসলে আল্লাহ্‌র পরীক্ষাটির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং অবশ্যই যুক্তিতর্ক যেমন পথ দেখায় সে রকম কখনো কখনো বিভ্রান্ত করে। এই বিষয়টি বড়ই নাজুক বিষয়। খান্নাস জড়িত নফ্‌স এই নাজুক বিষয়টি সহজে মেনে নিতে চায় না।

মেজাজি কাবা হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত কাবাটি। হাকিকি কাবা তথা আসল কাবাটি হল মোমিনের দিল। মোমিনের দিলই হল আসল কাবা। মনে রাখতে হবে যে, আমানু তথা যারা ইমান এনেছে তারা ইমানদার কিন্তু মোমিন নয়। আমানু এবং মোমিনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ইমানদারকে আবার আল্লাহ্‌তে ইমান আনার আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রথমটি হালকা ইমান, তথা অন্ধবিশ্বাসের ইমান এবং অপরটি দর্শনীয় ইমান। দর্শনীয় ইমান নষ্ট হবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ যিনি সত্যদর্শন করতে পেরেছেন, তিনি কেমন করে সত্য পথ হতে বিপথে যেতে পারে? আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নে, সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে হয়তো কখনো কখনো এদিক-সেদিক হতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি হতে বিচ্যুত হবার প্রশ্নটি অবান্তর। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, আবদুহুদের কোনো প্রকার এবাদত-বন্দেগি করতে হয় না। ইহা মেশকাত শরিফের হাদিসেই আমরা দেখতে পাই। ধর্মের অনুষ্ঠানের পল্লবগ্রাহিতায় যারা নিমজ্জিত, তারা আবদুহুদেরকেও এবাদত-বন্দেগির অনুষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে। সুরা কাহাফে আমরা একজন আবদুহুর সঙ্গে হজরত মুসা (আ.)-কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সাক্ষাত করতে দেখি। হজরত মুসা এই আবদুহুর সাথে তিনবার ধৈর্যধারণ করার চুক্তিটি রক্ষা করতে পারেন নি, আবদুহুর জ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নটি তো বহু দূরের কথা। আবদুহু মাঝির নূতন নৌকাটিকে ছিদ্র করে নদীর কিনারায় ডুবিয়ে দিলেন। কেন ডোবালেন, কী কারণে ডোবালেন, ডোবাবার পেছনে কোনো ঘটনা ঘটবে কি না এই এলমে গায়েবগুলো হজরত মুসাকে জানিয়ে দিলেন। এভাবে তিনটি বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণের চুক্তিটিকে ভঙ্গ করার পরই আবদুহু হজরত মুসা হতে পৃথক হয়ে গেলেন। আমরা কোরানে দেখতে পাই, আবদুহুকে তথা মহানবীকে রাত্রিতে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে রসুলকে বা নবীকে নেবার কথাটি না বলে আবদুহু কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই আবদুহুকে সহজ ভাষায় বুঝবার জন্য জ্ঞানীরা একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। সেই প্রতিশব্দটির নাম হল খিজির। খিজির অর্থ হল চিরসবুজ। যে সবুজের মধ্যে কোনোদিন কোনো কালেই অন্য কোনো রং ধারণ করে না তাকেই চিরসবুজ বলা হয়। খিজিরের অপর নামটি হল চিরসবুজ। আসলে খিজির শব্দটি সূরা কাহাফে একটিবারও ব্যবহার করা হয় নি। অতএব ইসলামের প্রতিটি বিষয় অংকের হিসাবের মত মিলে যেতে বাধ্য। অমিল-বেমিল, উল্টা-পাল্টা চিন্তাধারার সমাবেশ তখনই দেখতে পাই, যখন এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়, এবং ইহাতে দুজনেরই গর্তে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা দেখতে পাই, তাবেইন হজরত ওয়ায়েস কারনি মহানবীর মহব্বতে পাথর দিয়ে নিজের বত্রিশটি দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। জাগতিক দৃষ্টিতে এই দাঁত ভাঙার বিষয়টির কোন জাগতিক মূল্য আছে বলে মনে করা হয় না। তাই শরিয়ত কখনোই প্রতিটি মুসলমানের দুইটি দাঁত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় নাই। অথচ ভালবাসার প্রশ্নে, গভীর প্রেমের প্রশ্নে, এই দাঁত ভাঙার বিষয়টিতে সবাইকে চমকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ মহানবীর জুব্বা মোবারক মহানবী কোন সাহাবিকে দিয়ে যান নি, বরং ইয়েমেনের করন প্রদেশের ওয়ায়েস নামক এক মজ্জুব আবদুহুকে দিয়ে যাবার কথাটি বলে গিয়েছিলেন। যেখানে মহানবীর বিছানায় বসা ঠিক নয়, মহানবীর বাসন ও গ্লাসে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা ঠিক নয়, মহানবীর কণ্ঠস্বর হতে উচু কণ্ঠস্বরে কথা বলা ঠিক নয়, সেখানে তাবেইন হজরত ওয়ায়েস কারনি নামক আবদুহু কী করে মহানবীর জুব্বা মোবারক পান? এই কথাগুলোর মধ্যে অতি গোপনীয় গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে এবং তা প্রকাশ করে দেওয়াটিকে ঠিক মনে করলাম না।

বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন তিনটি ডিমের রহস্যের পাড়-কূল করতে পারেন নি, এবং অবশেষে বিজ্ঞানী কেলভিনকে বলতে বাধ্য করা হল যে ইহা একটি নিছক দৈবশক্তি। বিজ্ঞানী কেলভিন দুটো কুমিরের ডিম, দুটো হাঁসের ডিম ও দুটো মুরগির ডিম নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানী কেলভিন দেখতে পেলেন যে, তিনটি ভিন্ন জাতের তিনটি ডিম একই উপাদানে গঠিত। এই তিনটি ডিমের একটিতেও বেশি অথবা কম উপাদান বিজ্ঞানী কেলভিন পেলেন না। অপর তিনটি ডিমকে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বাচ্চা ফুটিয়ে দেখতে পেলেন যে, কুমিরের ডিম হতে কুমিরের বাচ্চা বের হচ্ছে, হাঁসের ডিম হতে হাঁসের বাচ্চা বের হচ্ছে এবং মুরগির ডিম হতে মুরগির বাচ্চা বের হচ্ছে। কেন এ রকম হয়, এই প্রশ্নটির উত্তর বিজ্ঞানী কেলভিন না পেয়ে দৈবশক্তির দোহাই দিয়ে গেছেন। অস্তিত্ব শূন্য হতে পারে, কিন্তু শক্তি শূন্য হতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নবম শক্তিতে ঔষধের অস্তিত্ব থাকে না, তাহলে দুই শত, হাজার এবং লক্ষ শক্তিতে শক্তির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পদার্থের অস্তিত্ব নাই। মহামান্য ডা. হ্যানিম্যান এই বিস্ময়কর সূত্রটির আবিষ্কারক। তাই জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ আছে, কিন্তু ডাক্তার নাই; আবার এলোপ্যাথিতে ডাক্তার আছে, কিন্তু ঔষধ নাই। অবশ্য ইহা একটি নিছক কথার কথা তথা প্রবাদ বাক্য। বস্তু বিজ্ঞানের কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গেলে যেমন ভয়ংকর পরিশ্রম এবং গবেষণা করতে হয়, সে রকম নিজের ভিতরে রূহরূপী আল্লাহ্‌র পরিচয়টি জানবার ইচ্ছা থাকলে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি জীবন বাজি রেখে করে যেতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি আবিষ্কার একটি বিস্ময়, একটি অবাক কাণ্ড। মানব সভ্যতা বিবর্তনবাদের পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ , লুলা, স্থবির পদযুগল যেমন হাঁটতে পারে না, তেমনি গবেষণার ধ্যানসাধনা ছাড়া কোনো নূতন জিনিস আবিষ্কার করা যায় না। সুতরাং, বিবর্তনবাদই সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, স্থবিরতা নয়। এখানেই শেষ, আর কিছু নেই−এ কথা যারা বলে তারা সবজান্তার ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যেই আমরা অহংকারের আস্ফালন কমবেশি দেখতে পাই। পশুত্ব অহংকারের জন্ম দেয়। গতি অহংকারকে ভেঙে খান খান করে দেয়। তাই আমরা দেখতে পাই, পবিত্র কোরানের সূরা লোকমানের সাতাশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলছেন যে, 'আমার এই কোরানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যদি কেউ লিখতে চায়, তাহলে দুনিয়ার পানিগুলো যদি কালি হয় এবং গাছগুলো যদি কলম হয়, তবু লিখে শেষ করা যাবে না। এমনকি সাতবার পানিগুলো কালি এবং সাতবার গাছগুলো কলম হলেও নয়।' এতবড় নির্জলা সত্যটি জানবার পরও আমরা অহংকার করি, আমরা আস্ফালনের প্রচণ্ড ঢেউ তুলি, আমরা অনেক কিছু জানবার তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। অথচ একটিবারও বলতে শিখলাম না যে এই মহা-অসীমের মহাজ্ঞানের মহাসাগরের কিনারেও দাঁড়াতে পারি নি।

মেজাজি শয়তান তিনটি মক্কার মিনাতে অবস্থান করে। হাকিকি চারটি শয়তানকে মাত্র দুটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ্ পাক। হাকিকি চারটি শয়তান কেবলমাত্র জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তরেই থাকার অনুমতি পেয়েছে। সুতরাং অন্য কোথাও হাকিকি চারটি শয়তানের থাকার কথাটি বলা হয় নি। মানুষের অন্তরের ভেতরই শয়তান অবস্থান করে, অথচ কী নির্মম দুর্ভাগ্য যে, সেই মানুষটি চারটি হাকিকি শয়তানকে বাহিরে খোঁজে। মানুষ মনেই করতে চায় না যে, শয়তান তার অন্তরেই অবস্থান করছে। সেই জন্য মানুষ এই কথাটি বলতে ভালবাসে, খুব পছন্দ করে, 'ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়।' কিন্তু যখনই বলা হয় যে, ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়, তখনই মুখমণ্ডল বিবর্ণ রূপ ধারণ করে, মলিনতার কালো ছায়া মুখমণ্ডলটিকে ছেয়ে ফেলে। কী বিচিত্র লীলাখেলা! কী রহস্যময় প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা! কখনো উত্তর পাই, কখনো আহত পাখির মত ছটফট করি। তাই তো আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'তোমরা যত চালাকিই কর না কেন, জেনে রাখ, আমিই (আল্লাহ্) সবচাইতে বড় চালাক।' বর্ণমালা নাই, শব্দচয়ন নাই, বাক্যগঠনের শৈলী নাই, ছবিতে সিংহ-বাঘ নাই : অথচ প্রকৃতির মাঝে বর্ণমালা আছে , শব্দচয়ন আছে, বাক্যগঠনের শৈলী আছে, জীবন্ত বাঘ আর সিংহও আছে। তাই তো মাওলা আলি বলেছিলেন যে, 'ভাষায় লিখিত কোরানটি বোবা কোরান, আর আমি আলি জীবন্ত কোরান।' একটি মেজাজি, অপরটি হাকিকি। এই কথাটি বুঝতে হলেও প্রয়োজন হয় তকদির।

বাহিরের যে কোন বিষয় জানতে হলে কমবেশি লেখাপড়া করতে হয়। আর গবেষণা করতে হলে সেই বিষয়টির উপর প্রচুর লেখাপড়া করতে হয়। বাহিরকে জানতে হলে বাহির দিয়েই জানতে হবে। সুতরাং বাহিরের চোখ খুলেই বাহিরের বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতে হয়। ভিতরের বিষয়টি আছে বলে বাহির ইঙ্গিত দিয়ে যায়, কিন্তু ভিতরের বিষয়টি জানতে হলে মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া সম্ভব নয়। ইহাই সুফিবাদের প্রথম এবং শেষ কথা। তাই সুফিদের ধর্ম হল সুফিবাদ এবং সুফিবাদের অনুসারীদের পরিচয়টি হল সুফি। সুফিরা ভেতরের জ্ঞানটি অর্জন করার জন্য মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করার জন্য বারবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। ইহাকে রহস্যলোকের জ্ঞানও বলা হয়। লোভ-মোহের জালপাতা ফাঁদগুলো যখন কোন সাধক একটি একটি করে ছিন্ন করে ফেলতে পারে, তখনই রহস্যলোকের রহস্যময় জ্ঞানটি ধাপে ধাপে আপনার ভিতর উদ্ভাসিত হতে থাকে। যত ধ্যানসাধনা, ততই রহস্যলোকের পর্দাগুলো খুলে যেতে থাকে। অবশেষে সাধককে মোকামে জাবরুত তথা শক্তির মোকামের শেষ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কারণ লাহুত মোকামে যেতে হলে ধ্যানসাধনাটি করতে হয় বটে, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত ছাড়া লাহুত মোকামে প্রবেশ করা অসম্ভব।

গুরু যদি মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির কথা এবং কেমন করে করতে হবে তার বিশদ প্রয়োগ-পদ্ধতি মুরিদকে জানিয়ে দিতে না পারে, তাহলে সে তো গুরু নামের কলঙ্ক। সে তো গুরু সেজেছে, কিন্তু গুরু হতে পারে নি। সাধু সাজা যত সহজ, সাধু হওয়াটি ঠিক ততটুকু কঠিন। মোরাকাবার ধ্যান-সাধনাটি একেক গুরুর একেক রকম হতে বাধ্য। মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য এবং স্বাভাবিক। কিন্তু মূল বিষয়টি অভিন্ন। একটি ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একেক জনের একেক রকম হতে পারে, কিন্তু মূল

বিষয়টি এক থাকতে বাধ্য। মানুষ চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতির এবং একটি বিষয় হতে আরেকটি বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে ভালবাসে। মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি এই চঞ্চলতাকে দূর করে দেয়। লাফিয়ে লাফিয়ে যাবার পথে ধ্যানসাধনাটি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ কোরবানির কথাটি বলতে গেলেই বুঝতে চায় যে পশু কোরবানি করতে হবে। হ্যাঁ, পশুটিই কোরবানি করতে হয়, তবে পশু দুই প্রকার : একটি বাহিরের পশু এবং অপরটি মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী পশু। বাহিরের পশুটিকে কোরবানি করার নামটি হল মেজাজি কোরবানি, আর মনের ভেতর যে খান্নাসরূপী শয়তান নামক পশুটি আছে উহাকে কোরবানি করার নাম হল হাকিকি কোরবানি। মেজাজি কোরবানি দিয়েই হাকিকি কোরবানিকে জানতে হয়, বুঝতে হয়। হাকিকি কোরবানি তথা মনের ভিতরে খান্নাসরূপী শয়তান নামক পশুটিকে যে পর্যন্ত মানুষ কোরবানি করতে না পারবে সেই পর্যন্ত বারবার কেয়ামতের মুখোমুখি হতে হবে। মেজাজি কোরবানির বিষয়টিকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। অনেকে মেজাজি কোরবানির বিষয়ে অতিমাত্রায় পশুর উপর দরদি সাজে এবং নানা রকম মন্তব্য করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। বাহিরের পশুটি তথা মেজাজি পশুটি বড় জোর পনের-বিশ বছর বেঁচে থাকে। তারপর পশুটির যখন স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তখন শিয়াল-শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়। সুতরাং একটু আগে একটু অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরা ভক্ষণ করতে পারে। সুতরাং দয়ামায়ার প্রশ্নটিও আপেক্ষিক, সার্বজনীন নয়। সুতরাং প্রতিটি মেজাজি বিষয়ের উপর বিরূপ মন্তব্য অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ঠিক নয়।

ইমান সম্পর্কে আলোচনা

অবশেষে একটি মারাত্মক বিষয় নিয়ে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি। সেই বিষয়টির নাম হল বিশ্বাস তথা ইমান। মোট কথায়, বিশ্বাসকেই আমরা ইমান বলে জানি এবং বুঝি। এই বিশ্বাস তথা ইমানের প্রকারভেদ কোরানেই পাই : এলমুল ইয়াকিন, আইনুল ইয়াকিন এবং হাক্কুল ইয়াকিন। ইমানের প্রথম সিঁড়ি তথা ধাপ তথা সোপানকে বলা হয় ইলমুল ইয়াকিন। আল্লাহ্‌, ফেরেস্তা, কেতাব, নবী, রসুল এবং অদৃশ্যের উপরেও অদৃশ্য বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাস করাটাকেই বলা হয় এলমুল ইয়াকিন, তথা বিশ্বাসের প্রথম সিঁড়ি তথা ধাপ। এই বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাস করাটাকে বলা হয় ইমান। যিনি বা যারা এই রকম বিষয়গুলোর উপর বিনাশর্তে মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করে বা করেছে তাদেরকে ইমানদার বলা হয়। কোরানের ভাষায় এদেরকেই বলা হয় আমানু। এই আমানুদের ইমানের ভিত্তি হালকা, দুর্বল এবং চলে যাওয়ার ভয় থাকে বলেই আল্লাহ্‌ পাক এই রকম ইমানদারদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'হে ইমানদারেরা, তোমরা আবার আল্লাহ্‌তে ইমান আনো।' এর পরের ইমানটি তথা বিশ্বাসটির নাম হল আইনুল ইয়াকিন, এবং এই ইমানটি গভীরতার প্রশ্নে দ্বিতীয় সিঁড়িতে অবস্থান করছে, যদিও এই ইমানটি প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুস জ্ঞানের ইমান। এই ইমানে রহস্যলোকের অনেক কিছু ধ্যানসাধনার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ইমানটি ধ্যানসাধনার আওতায় আসে। তার পরের ইমানটির নাম হল হাক্কুল ইয়াকিন, এবং এই ইমানও একটানা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই হাক্কুল ইয়াকিনে এসেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশটি দেখা যায়। তাই এই ইমানই হল বিশ্বাসের চরম তথা চূড়ান্ত পর্যায়। এখান থেকেই তৌহিদ এবং মিলনের শুরু হয়। এই ইমানের বলয়ে যখন সাধক ধ্যানসাধনার মাধ্যমে অবস্থান করেন, তখন পরমাত্মার চাক্ষুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা ফানা হয়ে যায়, অনেকটা পানিতে চিনি মেশানোর মত। চিনি পানিতে মিশে যায় সত্য, কিন্তু পানি পানিই এবং চিনি চিনিই। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায় বটে, তথা ফানা হয়ে যায় বটে, কিন্তু হাকিকতে জীবাত্মা জীবাত্মাই, এবং পরমাত্মা পরমাত্মাই। মিশে যাওয়ার রূপটিও দেখছি, আবার উভয়ের অবস্থানের পার্থক্যটিও ফেরত পাই। মনসুর হাল্লাজের জীবাত্মাটি পরমাত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পরই বলেছিলেন, *'আনাল হক'*, তথা আমিই একমাত্র সত্য। আমিই একমাত্র সত্য, এই কথাটি পরমাত্মাই বলেছেন। জীবাত্মার এ রকম কথা বলার অধিকার নাই, এবং বিধান রাখা হয় নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীবাত্মার অধিকারী মনসুর হাল্লাজই বলছেন, 'আমিই একমাত্র সত্য।' বাণীটি একমাত্র পরমাত্মার বাণী এবং ঘোষণা। পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে মিশে যেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার সত্তাটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হবে। মাইক এবং স্পিকার বলছে, আসলে পরমাত্মার বাণী পরমাত্মাই ঘোষণা করছেন। এখানে এসেই সুফিবাদের বিষয়টিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়। কারণ ইহা তথা এই বিষয়টি একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়। মনে হয় জীবাত্মা 'আনাল হক' ঘোষণাটি দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পরমাত্মারই ঘোষণা। ধ্যানধারণার কিছুটা অবশিষ্ট থাকলেও মিলন এবং হাক্কুল ইয়াকিন তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা মোটেও সম্ভবপর নয়। তৌহিদের স্তরে যখন জীবাত্মাটি অবস্থান করে, সেই অবস্থাটির নাম হল ফানাফিল্লাহ। সুতরাং তৌহিদের স্তরে অন্তরটিও ফানা হয়ে যায়। এই স্তরে খান্নাসরূপী শয়তানটি আর অবস্থান করতে পারে না। সাধক দেখতে পান যে সাধকের বাম দিক দিয়ে খান্নাসরূপী শয়তান পালিয়ে যায়। সাধকের ডান দিক দিয়ে খান্নাসরূপী শয়তানের পালাবার বিধান নাই। কারণ ফানাফিল্লাহ্‌র স্তরে অবস্থান করা মাত্র সাধক দেখতে পান যে, আপন গুরু তথা পীরও চলে যান; তবে আপন গুরু তথা পীর সাধকের ডান দিক দিয়ে চলে যান। এবং আপন গুরু তথা পীরের ডান দিক দিয়ে চলে যাবার বিধানটি রাখা হয়েছে। সুতরাং গুরু তথা পীর ধরাটাও শেরেক, তবে ইহাই শেষ শেরেক। কারণ গুরু তথা পীর এবং মুরিদের অবস্থানটির মাঝে তৌহিদ থাকে না। তৌহিদে তখনই সাধক তথা মুরিদ অবস্থান করেন যখন সাধক দেখতে পান যে, বাম দিক

দিয়ে খান্নাসরূপী শয়তান পালিয়ে গেছে এবং ডান দিক দিয়ে আপন গুরু তথা পীর চলে গেছেন। সাধক তখন একা। সাধক তখন সম্পূর্ণরূপে একা। এই একেতে অবস্থান করাই তৌহিদে অবস্থান করা। এখানেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন হয়। এবং কোরানের ভাষায় এদেরকেই মোমিন বলা হয়। মোমিনের পরিচয়টি জানা না থাকলে মোমিনের আগে আসল, প্রকৃত, খাঁটি, এই জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার হওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। আগুনের পরশে কালো লোহা লাল টকটকে আগুনের রং ধারণ করে। আগুনের প্রচণ্ড পরশে লোহা গলে পানির মত হয়ে যায় এবং আগুনের চূড়ান্ত রূপটি ধারণ করে। যত চূড়ান্ত রূপই লোহা ধারণ করুক না কেন, লোহা লোহাই এবং আগুন আগুনই; জীবাত্মা জীবাত্মাই এবং পরমাত্মা পরমাত্মাই। বিশ্বাস নামক শব্দটি সাধকের মনে প্রাণে যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধক ফানা হতে পারে না। তাই হজরত বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী তাঁর রচিত *মাতলাউল উলুম* বইটির পয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একস্থানে লিখেছেন যে, 'বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কেউ আল্লাহ্‌র অলী হতে পারে না।'

কোরান বলছে, *'ওয়াবুদু রাব্বুকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াকিন'* তথা 'বিশ্বাস অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তোমার প্রভুর এবাদত কর।' এই কথা দ্বারা অনেক তফসিরকারক মৃত্যু বোঝাতে চেয়েছেন। তাহলে এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃত্যুই বিশ্বাসের শেষ স্তর তথা ধাপ তথা সোপান। এখন প্রশ্ন আসে, মৃত্যু তো নাস্তিক, কাফের ও ফাসেকদেরও হয়। তাহলে মৃত্যুর পর একজন নাস্তিক, একজন কাফের কী করে ইরফান তথা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানী হবে? এখানে আর একটু কথা থেকে যায় যে, যদি রিপু ও প্রবৃত্তির কলুষিত খান্নাসরূপটির উপর বিজয় অর্জন এবং এগুলোর বিনাশ তথা এগুলোর মৃত্যু বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি ঠিক আছে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ কোনো অবকাশ রাখা হয় নাই। তা ছাড়া আল্লাহ্ ইয়াকিনের আওতার বাহিরে বলে কোন প্রমাণ নাই। তাই এই বাক্য দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ মিলনের স্তর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। মিলন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অনেক উর্ধ্বে। বান্দার জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন সে ইমানের স্তর অতিক্রম করে চলে যায়, যাকে বেলায়েত এবং রহস্যলোক পরিভ্রমণ বলা হয়। তাই কোরান আমাদেরকে বলেছে যে, মাত্র চারটি মাস আপন দেহের মাঝে ভ্রমণ করে দেখ যে রহস্যলোকের রহস্যগুলো কত মধুর, কত বিস্ময়কর। সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনরত অবস্থায় আনুষ্ঠানিক ইবাদতটি আর থাকে না। তাই গাউসুল আজম বড় পীর সাহেব বলেছেন, *'মান আরাদাল ইবাদাতা বাদাল বিসালী ফাহুয়া কাফিরান'* তথা 'যে ব্যক্তি মিলনের পর ইবাদত করতে চায়, সে ব্যক্তি কাফের' (*মাতলাউল উলুম*)। এই বিষয়গুলোর রহস্য বিস্তারিত জানবার আগ্রহ থাকলে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী রচিত *মাতলাউল উলুম* বইটি পড়বার অনুরোধ করছি।

তকদির সম্পর্কে আলোচনা

প্রবৃত্তির আপন অস্তিত্বে অগণিত চোখ আর জিহ্বা আছে। অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে আঘাতে আঘাতে অস্তিত্ব বিচূর্ণ হতে থাকে যত বেশি, তত বেশি চোখ আর জিহ্বা পরিণত হয় ধারালোয়, খুরের মত ধারালো। অভিজ্ঞতার জ্ঞান এইভাবেই সাধারণত অর্জিত হয়। আপন অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার সাজানো ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পেরেছেন যাঁরা, তাঁরাই সমাজে চিন্তাশীল বলে পরিচিত। অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে অহঙ্কার, না হয় আস্ফালন, না হয় সবজান্তার ভূমিকা পালন করা, অথবা আরো কিছু যা আমার জানা নেই। মনের অজান্তে মনের ভেতর আপসে তৈরি হয়ে যায় একটি অভিজ্ঞতার বৃত্ত। বুঝবার উপায়ই নেই যে, কখন তৈরি হয়ে আছে। জ্ঞানের বিভিন্নতার এবং মতবিরোধের কারখানাটার নামই এই বৃত্ত। অভিজ্ঞতার সত্য বদলায় সময়, যুগ এবং পরিবেশের দিকে চেয়ে। কিন্তু আর একটু গভীরে যদি আপন অস্তিত্বকে গলা ধরে টেনে নিয়ে আসা হয়, তখন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাগুলো বোবা হয়ে যায়। আর বলতে চায় না কোন কথা, কোন মন্তব্য। মুখরা অস্তিত্ব সহজে অত গভীরে যেতে চায় না। তাই নিজের অভিজ্ঞতার দর্শনে নিজেই হয়ে পড়ে অবিশ্বাসী। এবং ফ্রাসট্রেশন তথা নৈরাশ্যের হা-হুতাশের দহন এই সিঁড়িতেই যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের।

কনট্রাডিক্শন তথা আত্মবিরোধই ফ্রাস্ট্রেশনের জন্মদাতা। এই কনট্রাডিকশন আপনা হতে আসে না, অভিজ্ঞতার অস্তিত্বে নিজেই বানিয়ে নেয় নিজের মনের অজান্তে। অথচ অবাক হবেন আপনি একটি কথা শুনে আর সেটি হল : আপন অভিজ্ঞতার অস্তিত্বের ভুল এবং বড় বড় ভ্রান্তিগুলো কখনোই স্বীকার করে নেওয়া তো দূরের কথা বরং জোর করে নিজেকে নির্ভুল বলে ঘোষণা করতে চায় এবং চিৎকার করে ঘোষণা করে বেড়ায়। অথচ অবাক হবেন এই কথা শুনে যে, সে একান্ত গোপনে সংশয়ের রোগের যাতনায় ভুগছে অথচ স্বীকার করতে চায় না এবং এটাই হল ইগো, আমিত্ব, খুদি অথবা অহঙ্কার ইত্যাদি। ইহাই আরো গভীরে গিয়ে জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং ইহাই গভীর এবং গহীনে প্রবেশের উপকরণের ওপর অহঙ্কারের আগুন ধরিয়ে দেয় এবং উপকরণগুলো পুড়িয়ে ফেলে, যেমন আগুন পুড়িয়ে ফেলে একটি সুন্দর কাঠের তৈরী ফার্নিচারকে। ইহা তকদিরের সমষ্টিগত প্রতিফলন কিনা জানি না। ইহা অভিনয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা সুনির্দিষ্ট চরিত্রের প্রতিফলনের অভিনয়ের বিচিত্র বিকাশ কিনা জানি না। অভিনয়ের যে চরিত্রটি করতে হয় সেটা কি সেই অভিনেতার কিছুক্ষণের তকদিরের প্রকাশভঙ্গি নয়? পছন্দের বাইরে, মনের বিরুদ্ধে যে অভিনয়টি করতে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই

অভিনয়ের চরিত্রটিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করছে, কিন্তু কোন উপায় নেই; কারণ এই মহানাটকের মহাপরিচালক সেই ঘৃণিত চরিত্রের অভিনয়টি একটি মহৎ মানুষকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এটা তার তকদিরের লিখন ছিল কিনা জানি না। তকদির একটি সাংঘাতিক জটিল বিষয়; মারাত্মক রহস্যের আবরণের ঘোমটায় লুকিয়ে থাকে এই তকদির। ইহার কি পরিবর্তন করা যায়? এই রহস্যের ঘোমটা কি আপন হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে প্রকৃত রূপটি দেখাবার শক্তি অর্জন করা যায়? তকদির আপাতস্থায়ী বলে মনে হলেও উহা অনেক সময় স্থায়ীরূপে প্রতিভাত হয় না। এ জন্যই কোরান অনেকবার ঘোষণা করেছে, 'যাকে ইচ্ছা আমরা রহমত দান করি।' যুক্তিতর্ক আর আইনের দৃষ্টিতে কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হয়, আসলে ইহা কাচের মত স্বচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়েছে হাজারো উদাহরণের মাধ্যমে। সীমার দেয়াল থাকা সত্ত্বেও সীমার দেয়াল ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। এটারও কি ব্যাখ্যা দিতে হবে? লালন ফকির নিরক্ষর ছিলেন। শিষ্যরা লিখে রাখতেন তাঁর কথার সাজানো গভীর রহস্য। নিরক্ষর লালন ফকিরের পক্ষে এত বড় অবদান রাখার যুক্তিতর্ক আইনের ধারাগুলো কি মূল্যহীন হয়ে পড়ছে না? নিরক্ষর লালন ফকির কি বাইরে হতে কিছু অর্জন করেছিলেন? আপন সত্তার অস্তিত্বের ভেতর অদৃশ্য প্রচণ্ড ঝাঁকুনির মাধ্যমে অনেক গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যে গভীরতার গহীনে সবার পক্ষে প্রবেশ সম্ভবপর নয় বলে লালন ফকির আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং ইহাই লালন ফকিরের তকদির। এই তকদিরকেই কোরান বলছে, *'ইউতিহি মাইয়াসাউ'* অর্থাৎ যাকে ইচ্ছে দান করি। অভিনয়ের শিল্পীদের চরিত্র বণ্টনের মালিক যেমন ঝানু পরিচালক এবং মাথা নত করাটাই শিল্পীদের তকদির। তাহলে কাকে গালি দেবো? কার সমালোচনা করবো? কাকে দেব ঘৃণার অভিশাপ? মীর জাফরের অভিনয় করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের ছুড়ে মারা জুতো কি পুরস্কার নয়? আসলেই কি সেই অভিনেতা মীর জাফর? তাহলে কি ছুঁড়ে মারা জুতো বুকে জড়িয়ে অভিনেতা সার্থক অভিনয়ের সার্থকতা প্রচার করতো? এই জুতো উপহার পাওয়াটা সেই অভিনেতার তকদির। কারণ, পরিচালকের আদেশেই মীর জাফরের অভিনয় করতে হয়েছিল। স্রষ্টার এই সৃষ্টির মঞ্চে যারা বিভিন্ন কাজে ছুটে চলেছে সেই কাজগুলো কি তাদের তকদির নয়? আবার সেই তকদিরকেও কেটে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য তকদিরে সমাসীন করা হয়েছে, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চোর-ডাকাত আর পাপী বলে পরিচিত, রাজা-বাদশা বলে পরিচিত ছিল এ রকম অনেককে দেখা গেছে, তাদের জীবনের মাঝে কে যেন আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন? তিনি কে? তাঁর নাম কী? তাঁর শক্তির পরিচয় জানবার জন্যে কোরানে বহুবার বহু রকমে বলা হয়েছে। সেই শক্তির পরিচয় বাইরে হতে জানবার আহ্বান জানালেও খুবই অল্প উপদেশের মাধ্যমে হয়েছে। আসলে সেই শক্তির পরিচয় জানবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আপন অস্তিত্বের ভেতর। তোমার অস্তিত্বের ভেতর তোমাকে খোঁজার আদেশ দেয়া হয়েছে বহুবার এবং বলা হয়েছে, তোমার অস্তিত্বের কোনো একস্থানে লুকিয়ে আছেন তিনি, এবং উহা জাগিয়ে তোলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে তোমাতেই তোমাকে দর্শন করতে, এবং এই দর্শনকেই বলা হয়েছে খোদা-দর্শন তথা মহাশক্তির দর্শন লাভ করা, এবং এই দর্শনের ভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই খোদার রহস্য এবং খোদাও তাঁদের রহস্য। এই রহস্যের ভেদ সহজে খোলা হয় না। কারণ তাহলে সব খেলার শেষ হয়ে যায়। হা-হুতাশ, বিরহ-বেদনা, অন্তর্জ্বালা, ছটফট করা, ফুঁপিয়ে কাঁদা, পাগলের মত ছুটে বেড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়গুলোর আর তেমন কোন মূল্যই থাকে না বলে মনে হয়।

পরিচালক যখন একটি ছবি বানায়, সেই ছবিটি পরিপূর্ণ করতে পরিচালককে 'আমি'-র ভূমিকা ফেলে দিয়ে 'আমরা'-র ভূমিকা নিতে হয়। ছবিটির কোথায় কতটুকু রাখা হবে এবং কোথায় কতটুকু বাদ দিতে হবে পরিচালক এই বিষয়টির দায়িত্ব দান করেন এডিটরকে। এ বিষয়ে এডিটরই সর্বেসর্বা। আবার এই এডিটর সাহেব এডিটিং-এর বেলায়ও 'আমি'-র ভূমিকা গ্রহণ করেন না। সেখানেও দেখতে পাই, সহকারীদেরকে নিয়ে এডিটিং করতে হচ্ছে। সুতরাং এক 'আমি'-টাই পরিণত হয় বহু 'আমরা'-য়, কিন্তু আসলে বহু 'আমরা'-র মধ্যে একেরই লীলাখেলা চলছে। কী সুন্দর অপূর্ব নৈপুণ্যের শৈলীর ঝলকে সৃষ্টি করার রহস্যপূর্ণ বিজ্ঞানময় কৌশল। একটি মানুষ যখন সাধনার রাজ্যে প্রবেশের জন্য সংগ্রামে আহত পাখির মত ছটফট করতে থাকে এবং সেই ছটফট দেখে যদি তাঁর দয়া হয় এবং এই দয়ার প্রশ্নটিই সাংঘাতিক মারাত্মক। কারণ, তাঁর ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। এই ইচ্ছার ওপর সাধকের কোনো হাত নেই তথা বল প্রয়োগের প্রশ্নটিই অবান্তর। এই জন্যে সাধক যত কঠোর সাধনাই করুন না কেন, রহস্য-জগতের ভেতর আপন শক্তিতে প্রবেশ করতে পারে না, এবং প্রবেশের বিধান নেই। সাধক রহস্য-জগতের দিকে চেয়ে থাকতে পারেন, যাকে কোরানে 'ইলা' তথা দিকে বলা হয়েছে। ইহাকে তাকওয়াও বলা যেতে পারে, আবার নফসে লাউয়ামাও বলা হয়, আবার তাসাব্বুরে শায়েখ তথা পীরের ধ্যানে মগ্ন থাকাও বলা যায়। নাম অনেক কিন্তু বিষয় আসলে একটি। অনেকটা ঠুমরি গানের মতো। গানের বাক্য মাত্র একটি, কিন্তু সুরের বিভিন্নতার মাধুর্যের কান্তির চমকগুলো অনেক। যদি সাধক এখানেই এসে থেমে থাকেন তাহলে ইহা তাঁর তকদির, আর যদি আল্লাহ্‌র 'আমরা'-রূপীর কোনো সদস্য দয়া করে রহস্যলোকের ভেতর ঢুকিয়ে দেন তখন ইহাকে কোরান 'ইলা' না বলে 'ফিল' তথা ভেতরে নেওয়া হল বলেছে। রহস্য জগতের ভেতর প্রবেশ করানোটাই বিশেষ দয়া। এই দয়াকে কোরান রহমান বলেনি। এই দয়ার নাম রহিম। কারণ, এই দয়া বিশেষ দয়া। এই বিশেষ দয়া দান করা হয় সাধনার অস্থিরতার কানে প্রচণ্ড চড় মেরে, অর্থাৎ আপন অস্তিত্বের ভেতর যেটুকু আমিত্বের বিষ ছিল উহা সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া, এবং তখনই সাধক বুঝতে পারেন, তিনিও যিনি আমিও তিনি। তাই মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন, আমিও যিনি তিনিও আমি। মজনুও ঐ একই কথা বলেছিলেন, কারণ দুই তখন সম্পূর্ণরূপে নেয় বিদায়। তাই শামসুদ্দিন তাবরেজ বলেছিলেন যে, তিনি একের মধ্যে নিদ্রা যান, একের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করেন, একের মধ্যে একেরই দর্শন করেন, এবং ইহাই আপন অস্তিত্বের অভ্যন্তরের

জ্বালাময় সাধনা–যা বাইরে হতে বুঝবার উপায় থাকে না। এ জন্যেই অধিকাংশ আমরা ধোঁকার মায়াজালে পড়ে যাই। আপন অস্তিত্বের ভেতরই যে খোদা-দর্শনের রহস্য, সে কথা বলতে গিয়ে হজরত বায়েজিদ বোস্তামি-র এক মুরিদ আপন পীরের নিকট উপদেশ চেয়েছিলেন এই বলে যে, 'কাহার সঙ্গে ভালবাসা করবো, অথবা কাহার নিকট হতে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করতে পারবো?' উত্তরে হজরত বায়েজিদ তাঁর মুরিদকে বলেছিলেন, 'সেই মানুষের সঙ্গেই ভালবাসা রাখিও এবং জ্ঞান অর্জন করিও, যাহার মধ্যে আমি এবং তুমি নাই।' এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে আপন অস্তিত্বের ভেতর লুক্কায়িত রহস্যময় সত্যগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হয়। ইহাই সাধনা। ইহাই ইসলামের মূল সাধনা। এই ইসলাম কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (আ.)-এর সময় হতে চালু হয় নি। যারা ইহা মনে করবে তারা সাংঘাতিক ভুল করবে অথবা ধর্মের আসল বিষয়টিই অপরিচিত হয়ে রয়েছে এবং এই ঠেঁটামির বিধান রেখে গেছেন অনুষ্ঠানপ্রিয় সর্বস্ব কাটমোল্লা, ঠেঁটা, ঘাড়মগরা এবং 'সব কিছু বুঝে গেছি' মার্কা মোল্লার দল, পাদ্রীরা, হিন্দু পুরোহিত-পাণ্ডারা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। এরা ধর্মের সৌন্দর্যের মাথায় যে কুৎসিত টুপি পরিয়ে দিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন সেই সর্বনাশের ভয়ঙ্কর গর্ত হতে সত্যকে উদ্ধার করতে গেলে আপনিই বরং অপমানিত হবেন। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্যকে বুঝে নিতে সামান্য কষ্ট হয় বৈকি। তবে একবার যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই সাধারণেরা অনেক সময় এমন অসাধারণ হয়ে পড়ে যে চমকে যেতে হয়। আপন অস্তিত্বই সব কিছু এবং ইহাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য–ইহা আমার কথা নয়, ইহা *কোরান*, *বাইবেল*, *তাওরাত*, *যবুর*, *বেদ*, *গীতা* এবং *ত্রিপিটক*-এর কথা। খুব ভাল করে লক্ষ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, সব মহাগ্রন্থ একই মূল বক্তব্যকে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করে গেছে। এই বাচনভঙ্গির ভাষার সমস্যায় মানুষ সত্যপথ হতে আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও মনের অজান্তে সরে পড়ে বহুদূরে এবং সরে পড়াটাও একটি রহস্যময় তকদির। আপনারা একটা জঘন্য কথা শুনে আসছেন, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়; আর সেই জঘন্য কথাটি এমনভাবে মাথার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হিটলারের চেলা গুয়েবেলসের কায়দায়! আর সেই কথাটি হল : কোরান নাকি ঘোষণা করছে যে, আগের সবগুলো ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। কোরানে যেভাবে বলা হয়েছে উহার অর্থটিকে নিজেদের মনের তৃপ্তি পাবার জন্য প্রায় আরবি ভাষার পণ্ডিতেরা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাটিকে বিকৃত এবং জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে। যার যা মনে লেগেছে তাই লিখে রেখে গেছে আর পাঠক এই অখাদ্য খেয়ে বিভ্রান্ত এবং বিপথে পা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং ইহাও একটি রহস্যময় তকদির। এরকমভাবে *বাইবেল*, *তাওরাত*, *যবুর*, *বেদ*, *গীতা* এবং *ত্রিপিটক*-এর মূল বক্তব্যগুলোকে যে নিজেদের মনের দলগত শান্তি দেবার জন্য বিকৃত করা হয় নি তার কি নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে? সবাই দলগত সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলিয়ে দলের বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলেছে এবং এই দলগত সাইনবোর্ড কাঁধ হতে নামানো যে সামাজিকভাবে কত কষ্টকর তা তারাই বুঝতে পারেন যারা দলগত সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলতে পেরেছেন। দলের প্রভাব যে কত মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর তা আজকের এই আধুনিক পৃথিবী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সব কটা দলই কিন্তু বলে বেড়ায় যে তারা সার্বজনীন; কিন্তু আপনি যদি সেই দলগুলোতে প্রবেশ করেন তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, তাদের সংকীর্ণতার নোংরামির দুর্গন্ধের ওপর সুগন্ধের প্রলেপ মাখা হয়েছে। ওপরটায় কী সুন্দর সুগন্ধির আবেশ, কিন্তু ভেতরটা ঠিক তার বিপরীত। অনেকটা আম কাঠের চেয়ার-টেবিল বানিয়ে অপূর্ব রং-এর বার্নিশ মেরে ঝকমকে করে রাখা হয়েছে; আপনার সেগুন কাঠের বানানো বলে ধোঁকা খাবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকতে পারে; এবং অগত্যা যদি ধোঁকা খেয়েই যান তাহলে বছরখানেক পরেই আসল পরিচয়টি আপনা আপনি ধরা দেবে আর আপনি বোকার মত অনেক কিছু ভাবতে থাকবেন; এবং ইহাও একটি রহস্যময় তকদির। আমার কথাগুলো যদি আপনার ভাল না লাগে তাহলে আপনার অস্তিত্বের ভেতর লুক্কায়িত বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন না, আপনার সেই বিবেকটি কী উত্তর দেয়? প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক বলে মনে করে নেন, তাহলে ইহা আপনার তকদির; আর যদি মেনে না নেন তাহলে ইহাও আপনার তকদির। কারণ, আপন তকদির আপনার নিকটেই আছে। আপনি যদি মনে করেন, বসে বসে জীবন কাটাবো, তাহলে এটা আপনার তকদির। আবার যদি মনে করেন যে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে কোটি টাকার মালিক বানাবো, তাহলে ইহাও আপনার তকদির। আপনি যদি মনে করেন যে, জীবনটা কোনো রকমে চালিয়ে যেতে পারলেই হয়, তাহলে ইহাও আপনার তকদির। আপনি যদি মনে করেন যে, ডাকাতি করে অর্থ উপার্জন করবো, তাহলে এটাও আপনার তকদির। আপনি যদি মনে মনে চিন্তা করেন যে, রাতারাতি দুই নম্বর ব্যবসা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নেতা হবো, তাহলে এটাও আপনার তকদির। আপনি যদি মনে করেন, এই ধনসম্পদ, এই সরদারি করার সম্মান, নেতা হয়ে ফুলের মালা নিয়ে আবার সেই ফুলের মালা ফাঁসির দড়িতে পরিণত হতে পারে তাই এসবের জাগতিক মূল্য হয়তো থাকতে পারে কিন্তু স্থায়িত্বের প্রশ্নে একেবারেই মূল্যহীন, সুতরাং এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে এটাও আপনার তকদির। আপনি যদি মনে করেন যে, বেঁচে থাকাটাই একটা শূন্যতা রোগের বোবা যাতনা, সুতরাং মৃত্যুই মুক্তি, এবং এই ভেবে আত্মহত্যা করেন, তাহলে এটাও আপনার তকদির। সুতরাং এই তকদিরকে মনে হবে জলের মত সহজ, গ্লাসে ভরে ঢকঢক করে পান করে ফেলবো, এবং ইহা প্রায় সবাই মনে করছে, করে এবং করবে। কারণ, তকদিরকে মানুষ অস্বীকার করতে চায় অতি সহজে, তকদিরের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিদ্রোহ করতে চায় এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু তকদিরের রহস্য যে কত গভীর আর মারাত্মক উহা বুঝেও বুঝতে চায় না, মেনে নিতে চায় না। কী আশ্চর্য সৃষ্টির নৈপুণ্য। সুরা মুলকের তিন নম্বর আয়াতটি আপনি অনেকবার মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখুন, আপনার মনের অস্তিত্বের সত্তাগুলো আহত পাখির মত অসহায় চাহনি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হবে। তাই পাঠক ভাইদেরকে অনুরোধ করতে চাইছি–মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদের গভীরতা মাপতে যাবেন না যেমন, তেমনি যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে বিচার করতে গেলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকতে পারে; এবং পুরোহিত আর পাণ্ডা দিয়ে কৃষ্ণ এবং মহাদেবকে মাপতে যাবেন না; আর খাদেম দিয়ে খাজা বাবার মানদণ্ডের পাল্লা হাতে নিলে হয়তো ভুল করবেন;

এবং যদি আমার অনুরোধের পর অবহেলায় গা ভাসিয়ে দেন তবে জেনে রাখুন যে, ইহাও আপনাদের রহস্যময় তকদিরের অদৃশ্য সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ, যা আপনাকে বুঝবার সুযোগই দেওয়া হবে না। কারণ প্রতিটি মানুষই হল তার নিজের জন্য বিরাট অথচ ধরা-পড়ছে-না জাতীয় আত্মবিরোধ তথা সেলফ্ কনট্রাডিক্শন।

প্রতিটি মানুষ কমবেশি এ রকম আত্মবিরোধ তথা কনট্রাডিক্শনকে ঘৃণা করে, অথচ সেই ঘৃণার নদীতে যে নিজেই হাবুডুবু খাচ্ছে সেটা সে বুঝতেই পারে না, এবং এই না বুঝবার বিজ্ঞানময় কৌশলগুলোও হল নিজ নিজ তকদির। কত সহজ কথা আর সহজ ভাব, অথচ এই সহজের ভেতর লুকিয়ে থাকে কত কঠিন সত্য আর গোপনীয়তা, আর এই গোপনীয়তাকেই বলা হল মারেফতের গোপন কথা।

সৃষ্টির বিশেষত্ব ও এককাতারে বিশ্বমানবতা

সৃষ্টি এবং অনুসরণ পাশাপাশি চলে এবং চলতে হয়। এখানে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার ধার ধারতে হয় না। একটা অপরটাকে প্রেরণা দেয়, এগিয়ে নিয়ে যায় নতুনের দিকে। অনুসরণ বাইরে থাকে এবং বাইরে থাকাই অনুসরণের ধর্ম। সৃষ্টি ভেতর হতে বাইরে চলে যায় এবং প্রকাশিত হয়। আর অনুসরণ বাইর হতে ভেতরে চলে যায় এবং নতুন কিছু দেবার প্রেরণা দেয়। সুতরাং একটাকে বাদ দিয়ে অপরটাকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি আপন অস্তিত্বের ভেতর হতে তৈরি হয়। সুতরাং ইহা মৌলিক বা একদম নতুন। অনুসরণকারী অনুসরণ করেন। এই অনুসরণ আপন অস্তিত্বের ভেতর হতে তৈরি হয় না। সুতরাং ইহা মৌলিক বা একদম নতুন নয়। বাইরের জ্ঞান বাইরে ছড়ানো যায় এবং ইহাকেই অনুসরণের মাধ্যমে জ্ঞানের অনুশীলন বলা হয় এবং ইহা একদম খাঁটি অনুসরণ। স্রষ্টার ভেতরের জ্ঞান বাইরে ছড়ানো যায়, তবে সবটুকু নয়, কিছুটা। তাও ভাষার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে। ভাষার বাহন স্রষ্টার ভেতরে জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে, তবে সবটুকু নয়। ছবির মত রং-তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু ভেতরের জ্ঞান ভেতরের অনুভূতির অভ্যন্তরেই লুকিয়ে থাকে। এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় সাধনার একাগ্রতার মধ্য দিয়ে। এবং ইসলামি পরিভাষায় এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় প্রজ্ঞার মসজিদে বাস করে। প্রজ্ঞার মসজিদ বলতে যেন ইটের তৈরি মসজিদকে ভুল করে না বসেন। কারণ ইটের তৈরি মসজিদকে কোরানে মসজিদই বলা হয়নি। এই কথা কয়টি বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে। এই জাতীয় বিশেষ জ্ঞান ভেতর হতে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তাই বাইর ইহা বুঝতে পারে বা কিছুটা অনুভব করতে পারে, কিন্তু এর বেশি এগিয়ে যাবার ক্ষমতা বাইরের থাকে না। কারণ বাইর চিরদিনই বাইর। ভেতরের জ্ঞান রহস্যে ঢাকা থাকে। রহস্যের জ্ঞান যত সুন্দর ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হোক না কেন, আসল রহস্য কোনদিনও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না এবং পেতে পারে না। বরং ভাষার বাহন অনেক রকম হওয়াতে অনুসরণকারীদের অবস্থা অনেকটা লেজে গোবরের মত হয়। এক একজন এক এক রকমভাবে বোঝে এবং মতের হয় অমিল এবং এই অমিলগুলো জন্ম দিয়ে ফেলে বিভিন্ন দল ও মতাদর্শ। কারণ, ভেতরের জ্ঞানকে পুরোপুরি বুঝবার আর উপায় থাকে না। তখন অনেক রকম মতাদর্শের নতুন নতুন গাছ গজায় এবং এই সব গাছে যত আজব আর অদ্ভুত ধরনের পাতা গজায়, যা দেখে সাধারণ অনুসরণকারী মানুষের মধ্যে আসে রং-বেরং-এর নিত্তনৈমিত্তিক হতাশা, যাকে ফ্রাসট্রেশনও বলা যায়। কারণ, এদের ভেতরের চোখটি অন্ধ হয়ে আছে। কী করে খুলতে হবে সেই চোখ তা নিয়েও লেগে যায় গণ্ডগোল। এই গণ্ডগোলের মধ্যেই ভেতরের চোখ খোলার অনেক রকম নিয়মকানুন প্রচার হয়ে যায়। যদি কারো ভেতরের চোখটি খুলে যায় তাহলে সেটা তার সাধনার কর্মফল নয়। কারণ, ভেতরের চোখ কেবল সাধনার দ্বারাই খোলা যায় না, সাধনার সঙ্গে রবরূপী আল্লাহ্র রহমত থাকতেই হবে। নতুবা অসম্ভব। এই রহমত যাঁর ওপর বর্ষিত হয় তিনিই ভাগ্যবান এবং ইহা একটি রহস্যময় তকদির। কোরানকে তাই বলতে হয়েছে, যাকে খুশি তাকেই দান করা হয়। এখানে সাধক ভেতরে প্রবেশ করার দরজা পর্যন্ত আপন সাধনা দ্বারা যেতে পারেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার কোন ক্ষমতাই থাকে না। অর্থাৎ সাধনার দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করার দরজা পর্যন্তই যেতে পারবে, যাকে কোরানে ইলাল মসজিদ, ইলাল কাহাফ ইত্যাদি ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ইলাল' অর্থ হল দিকে, আর 'ফিল' অর্থ হল ভেতরে। ফিল কাহাফ অথবা ফিল মসজিদ যেখানে কোরান বলেছে, সেখানে আল্লাহ্কে 'আমি'-রূপে পাওয়া যায় না। সেখানে আল্লাহ্র রূপ হয়ে পড়ে 'আমরা'। আমরা-রূপেই আল্লাহ্ সাধককে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন এবং তখনই সাধক বুঝতে পারে যে, নিজের অস্তিত্বের ভেতরই তিনি লুকিয়ে আছেন এবং ইহা দেখামাত্র সাধক বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে পড়েন এবং অনেক সাধকই তখন চিৎকার দিয়ে বলে বসেন : 'আনাল হক', 'আনা সুবহানি মা আজামুশানি', 'লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্ তায়ালা' ইত্যাদি, যাহা বাইরের অনুসরণকারীরা কিছুই বুঝতে পারে না এবং অনেক রকম গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসে। এই গণ্ডগোলের খেসারত দিতে হয়েছে অনেক সাধককে : যেমন মনসুর হাল্লাজ, শামস্ তাবরেজ এবং সারমাস্তের মত সাধকদের। কারণ, তাঁরা আপন অস্তিত্বের ভেতর রবরূপী আল্লাহ্র দর্শন পেয়েই বলেছেন, যা সাধারণ অনুসরণকারীরা বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে নি। কারণ, তারা বাইরে আল্লাহ্কে খুঁজে বেড়ায় এবং বাইরে খুঁজে কাঁচকলা পায়; কারণ, বাইরে হতে আল্লাহ্কে বুঝা অসম্ভব। তাই কোরানে বলতে হয়েছে, 'আমরা (আমি নই) তোমাদের

শাহারগের কাছেই আছি' অথবা 'যে তার নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার রবকে চিনতে পেরেছে' অর্থাৎ অস্তিত্ববাদের ভেতরই তিনি থাকেন এবং অস্তিত্ববাদের অনুশীলনের মাধ্যমেই খুঁজতে হবে। বাইর হতে নয়। কারণ, বাইরে আছে অনুসরণের বড় বড় ঢেউ, যা আপনাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসিয়ে নেবে এদিক সেদিক। এই অস্তিত্ববাদের সঙ্গে যেন আবার জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদকে মিলিয়ে না ফেলেন : তাহলে অস্তিত্ববাদের প্রশ্নেও আপনার অবস্থা হবে লেজে গোবরে।

আপন অস্তিত্বের ভেতর আপনাকে যে খুঁজে পায় নি সে সাধক কিন্তু সিদ্ধিলাভ না-করা সাধক। এ রকম সাধকেরা অনেকটা অন্ধের মত। অন্ধ যেমন কখনোই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না, সে রকম এইসব সাধকেরাও সত্যের মাপকাঠি নয়; তবে এরা ভণ্ডও নয়। এরা পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রাণপণ অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু কর্মফল হয়েছে ফেল তথা ব্যর্থ এবং ইহাও একটি জন্মচক্রের অভ্যন্তরের রহস্যময় তকদির। এর চেয়ে পরিষ্কার করে লিখতে গেলে বড় বড় ধর্মগুলোর দর্শনে একই জলের অনেক নামের বিভিন্নতাই কেবল পাবেন, কিন্তু আসলে ঐ একই জল বলে ঘোষণা করতে হয়; আর এ রকম বেহায়াপনা করতে গেলে সাধারণ অনুসরণকারীর দল বইটিকে ব্যান্ড তথা বাজেয়াপ্ত করার সুখবর ঘোষণা করতে চাইবে বার বার। অধম লেখকের নাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর হল ফারসি ভাষার একটি শব্দ। ইহার অর্থ হল জাহাঁকে যে জয় করেছে। জাহাঁ বলতে ফারসি ভাষায় বিশ্বকে বুঝায়। তাহলে জাহাঙ্গীর শব্দটি হুবহু বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে বিশ্বজিৎ হয়। আমার নাম বাবা জাহাঙ্গীর না লিখে যদি বাবা বিশ্বজিৎ লেখা হয় তাহলে কাজ সেরেছে! কিন্তু আসলে একই জিনিস। মানসিকতার মধ্য হতে এ রকম সংকীর্ণতাকে উপড়িয়ে ফেলা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। কারণ, বিভক্তির অভিশাপ আমাদের মন-মগজে এমনভাবে বাসা বেঁধে আছে যে, একই কথার দুটো ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ করলেই গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় এবং সাম্প্রদায়িকতার খসবু পায়।

আবার অধম লেখকের নামের আগের 'বাবা' শব্দটিতে কিছু লোক আতঙ্কিত হন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, একমাত্র জন্মদাতাকেই বাবা বলা যায়, আর কাউকে নয়। যারা আতঙ্কিত হন তাঁরাই মনের অজান্তে প্রতিদিন কতবার ভুল করছেন সেটা ভুলেও একবার ভেবে দেখেন না। বেশি কথা না বলে একটি উদাহরণ দিয়েই বুঝিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। নিজের ছেলেকে বাবা এবং মেয়েকে মা বলে ডাকি। তাই বলে কি নিজের ছেলেকে মাতার স্বামী বলে ধরে নেব? অথবা নিজের মেয়েকে বাবার স্ত্রী বলে জানবো? পাগলামি আর মোটা বুদ্ধিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

অধম লেখকের স্বাধীনতা নেই বলেই লিখতে পারবো না যে, হজরত মোহাম্মদ (আ.)-এর পূর্বের সবগুলো ধর্ম বাতিল তো হতেই পারে না, বরং সত্য এবং শাশ্বত বাণী বহন করছে। যারা বাতিল হয়ে গেছে বলে এতকাল প্রচার করেছে, তারা নিজেদের মনকে খুশি করার জন্য দলীয় সাইনবোর্ডখানাকেই তুলে ধরেছে। এ রকম মানসিকতার জন্ম হয় হিংসা আর ছোট-বড় করার গবেষণার পেটে এবং এ রকম হীনমন্যতার পরিচয় সব কয়টি ধর্মের মধ্যেই কমবেশি পাবেন। যার দরুণ আসল সত্যটিকে উদ্ধার করা, এই পর্বতপ্রমাণ স্তূপ হতে, হয়ে পড়ে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং ইহাও কিন্তু একটি উদ্দেশ্যমূলক রহস্যপূর্ণ তকদির। এই তকদিরকে হটিয়ে দেবার ইচ্ছাটি মনে হবে খুবই সহজ, আসলে ইহা খুবই কঠিন।

নিজেদের আপন আপন ধর্মের সাইনবোর্ডখানা সবার ওপরে উঠাবার প্রতিযোগিতা পূর্বে অনেক হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। কেবল আপন ধর্মটিকে উঁচুতে উঠাবার মানসিকতার পরিচয়টুকু প্রকাশ পেলে তেমন কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু অন্য সব ধর্মের ওপর কুৎসিত মন্তব্য এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি যে যত বেশি দিতে পারে বা পেরেছে সে তত দলীয় বাহ্বা পেয়েছে। অথচ দলের বাঁধ ভেঙে সবার হয়ে যারা কিছু বলতে চেয়েছে, তাদের ভাগ্যে যুগে যুগে জুটেছে বিশ্রী ভর্ৎসনা আর অপমান। একবার যদি আমরা ভাবি যে, সব মানুষই তো আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব, সবাই তো আমরা আদম আর হাওয়ার সন্তান; তাহলে কোরান কি কোন বিশেষ দলের একচেটিয়া অধিকার এবং সেই অধিকার আর কারো নেই? *বাইবেল* কি কেবল খ্রিস্টান নামক বিশেষ একটি দলের একচেটিয়া অধিকার এবং তারা বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে যে সমস্ত গবেষণামূলক বিষয় লিখবে উহাই কি একমাত্র ধর্তব্য বিষয়? অন্য কোনো দলের সে রকম অধিকার থাকতে পারে না, যতটুকু খ্রিস্টানদের থাকবে? *বেদ*, *গীতা* আর *উপনিষদ*-এর উপর কি কেবলমাত্র হিন্দু নামক একটি বিশেষ দলের অধিকার থাকবে? তারাই কি এইসব মূল্যবান গ্রন্থের একচেটিয়া অধিকার পাবার উদ্ধত আস্ফালন করবে? *ত্রিপিটক* আর *ধর্মপদ* কি বৌদ্ধ নামক একটি বিশেষ দলের সাইনবোর্ড হয়ে কাঁধে ঝুলতে থাকবে? এ কী রকম কথা? এ রকম কথার বিষ মানব সমাজে কারা ছড়ায়? এ কী রকম নোংরামি? আমার এটা, তোমার ওটা–এ রকম খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে দেবার খণ্ডিত মতবাদের কুৎসিত প্রচার কারা করে? তারা কারা? তারা কি ধর্মব্যবসায়ী, না বিকৃত আত্মতৃপ্তি পাবার পৈশাচিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রচার করে? তারা কি একই আদম সন্তানদের মাঝে ভেদাভেদের নোংরা দেয়াল তৈরি করে সেই দেয়ালের নাম সার্বজনীন বলে ঘোষণা করে? তারা কি মানুষের পরিষ্কার চিন্তাধারার পরিষ্কার বাতাসে দলীয় গ্যাস ছড়িয়ে দিয়ে সার্বজনীন নামক আদর্শটিকে ধানের পোকা মারার মত মেরে ফেলতে চায়? এক আদম সন্তানদের দলীয় কোন্দল কতটুকু চরমে উঠতে পারে এবং কতটুকু চরমে উঠতে পারলে ভাই ভাইয়ের রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এই পৃথিবীতে! সবুজ মনের মানুষগুলো দলীয় ধর্মের উন্মাদনায় কতটুকু হিংস্র পশুতে পরিণত হতে পারে ও তার ফলাফল কত ভয়াবহ, কত করুণ এবং কত মারাত্মক হতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতাগুলোতে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত স্মৃতিগুলো প্রচণ্ডভাবে বিবেকবান মানবতাবাদীদেরকে ভাবিয়ে তোলে। হে পৃথিবীতে বাস করা মানুষেরা! তোমরা কবে বলতে শিখবে এবং সবাইকে বুঝিয়ে দেবে যে–এই

কোরান, এই *বাইবেল*, এই *বেদ*, এই *গীতা*, এই *উপনিষদ* এবং এই *ত্রিপিটক* আর *ধর্মপদ* এসব পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের সবার এবং সবার সমান অধিকার। এসো হে পৃথিবীর মানুষেরা! আমরা সবাই এক দেহ এক মন নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গবেষণা চালাই সাগরের ডুবুরির মত মণিমুক্তা তুলতে এসব পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর মহাসাগরে। এতকাল তো কেবলই সাপ আর শামুক তোলার নোংরা গবেষণায় বিভোর ছিলাম নেশাগ্রস্ত মাতালের মত, কিন্তু আর নয়। সবগুলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আমাদের তথা আদম সন্তানদের। *কোরান* কেবল মুসলমানের নয়, বাইবেল কেবল খ্রিস্টানদের নয়, *বেদ*, *গীতা* আর *উপনিষদ* কেবল হিন্দুদের নয়, আর কেবল বৌদ্ধদের নয় *ত্রিপিটক* আর *ধর্মপদ।* দল আর গোষ্ঠীর গণ্ডির বাঁধ ভেঙে দিয়ে আমরা গবেষণা চালাবো আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর। পীরপূজারক মানুষের রচিত আর-এক কোরান *মসনভী*-র রচয়িতা মওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর পীর-মুরশেদ-কেবলায়ে কাবা বাবা শামসুদ্দীন তাবরেজ তাঁর দিওয়ানে এই কথাই চিৎকার করে ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন আজ হতে প্রায় হাজার বছর আগে, 'আমি ইহুদিও নই, আমি খ্রিস্টানও নই, আমি অগ্নি উপাসকও নই, আমি হিন্দুও নই এবং আমি মুসলমানও নই।' (*দিওয়ানে শামসেত্তাব্রীজ*)।

ধর্ম ও সাধনা

আরবি ভাষায় দ্বীনকেই আমরা ধর্ম বলি। এই দ্বীন হল দুই প্রকার : একটি আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং অপরটি হল মানুষের দ্বীন। আল্লাহ্‌র দ্বীন সব সময় এক, অখণ্ড এবং যাঁর দ্বিতীয় নেই। যাকে বলা হয় 'লাসানি দ্বীন'। তাই কোরানকে ঘোষণা করতে হয়েছে, *'সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদিলা'* অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আইন কখনোই বদলায় না তথা পরিবর্তন হয় না। সুতরাং পরিবর্তনের প্রশ্নটিই অবান্তর। যাহার পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয় অথবা ধরে নিতে হয়, উহা আল্লাহ্‌র দ্বীনের নীতির পরিবর্তন নয়, উহা হল ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকেই দ্বীনের নীতির পরিবর্তন মনে করে ধর্মবিষয়টির অবস্থা হয়ে পড়েছে লেজে গোবরে। আসলে মূলনীতি এক, একক এবং অখণ্ড বলে কোরানকে ঘোষণা করতে হয়েছে। হজরত আদম (আ.) হতে হজরত মোহাম্মদ (আ.) পর্যন্ত যত ধর্মের আগমন হয়েছে আসলে মূলত উহা হল একটিমাত্র ধর্ম এবং সেই ধর্মের নাম হল ইসলাম ধর্ম। সুতরাং হজরত মোহাম্মদ (আ.) হতে ইসলামের শুরু হয়েছে বলে প্রচার করাটা একটা মারাত্মক ভুল এবং এই জঘন্য ভুলের জালে আমরা প্রায় অধিকাংশ আটকা পরে গেছি। একটা ডাহা মিথ্যাকে বার বার সত্যরূপে প্রচার করার ফলে তার তাছির কমবেশি সবার মধ্যে মনের অজান্তে পড়ে যায়। এমনি তো মানুষের স্বভাব হল নিজের দলের প্রতি ভালবাসার টান এবং আপন গোত্রের বাহাদুরি জাহির করতে সবাই আনন্দ পায় এবং অহঙ্কারী হয়ে উঠে, তার ওপর এ রকম বানোয়াট উপদেশবাণী পেলে তো তেলের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেবার মত। এদিক দিয়ে হিটলার সাহেবের বন্ধু গুয়েবেলসকে একজন সার্থক দার্শনিক কি বলা যায় না? কত বড় মারাত্মক জিনিয়াস ছিল গুয়েবেলস, ভাবতেও অবাক লাগে।

তাহলে মানুষের দ্বীন তথা ধর্ম কী? মানুষের দ্বীন তথা ধর্ম এক নয়, বহু তথা অগণিত। এই মানুষের অগণিত দ্বীনের ওপর "লেইজহিরাহু" তথা উহাকে জাহির করার কথাই কোরান ঘোষণা করছে। অথচ ভুল ব্যাখ্যা করা হল এই বলে যে, পূর্বের সবগুলো ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। হিংসার বীজ হতে যে বিষময় জঘন্য ফলের জন্ম হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত প্রায় সবকটি ধর্মের মধ্যেই কমবেশি পাওয়া যায়। কেউ বলতে পারবে না যে, আমরা তুলসী পাতা ধোয়া একদম পবিত্র জল। যার দরুণ মানবতার মহামিলনের জলকে আমরা সবাই ঘোলা করে ফেলছি। আমি একজন হাজি সাহেবকে দেখেছি, তিনি গান বাজনা, ছবি তোলা ও দেখার এবং আধুনিকতার ঘোর বিরোধী; কিন্তু তার একমাত্র পুত্রধনের নতুন বাড়ি গুলশানে গিয়ে যা দেখলাম এবং নাতি-নাতনিদের যে উগ্র আধুনিকতা দেখলাম, তা হাজি সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত। শুনলাম হাজি সাহেব গ্রামের বাড়িতেই থাকেন এবং ছেলের কিছুই গ্রহণ করেন না; কিন্তু নাতি-নাতনিদের জেনারেশনকে কি হাজি সাহেব ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন বা পারবেন? আমার ওপর হয়তো অনেক ধর্মভাই রাগ করতে পারবেন এবং যা-তা মন্তব্যও করতে পারবেন; কিন্তু আমরা কি আমাদের ভবিষ্যতের ভয়াবহতার দিকে চেয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না? মনে হয় ঐ হাজি সাহেবের মত আমাদের অবস্থা হতে খুব বেশি একটা দেরি নেই। কারণ, আমাদের ভেতরের ফাঁকিবাজিগুলো দু'দিন আগে না হয় দু'দিন পরে ধরা পড়বেই। এবং এটাও কি আমাদের তকদিরের লিখন?

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (আ.) আমাদেরকে আপন অস্তিত্বের ভেতর যে রবরূপী আল্লাহ্‌ লুকিয়ে আছেন সেই শিক্ষা দেবার জন্য নিজের জীবনের একটি বেশ বড় অধ্যায়কে চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমরা দেখেও, জেনেও সেই চরম সেই জ্বলন্ত অধ্যায়টিকে চরম অবহেলা করে চলি। আর সেটি হল, তিনি বেশ কয়টি বছর হেরা পর্বতের মত উঁচু পর্বতের একটি নির্জন গর্তের ভেতরে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। এই নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার বিরাট এবং মহামূল্যবান আদর্শটি কি আমরা অতি যত্নের সহিত এড়িয়ে চলছি না? কেন আমাদের মহানবী সংসার জীবনের মাঝে থেকেও হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হলেন? এই একাকী নির্জনে ধ্যানমগ্ন হবার কারণ কী? আপন অস্তিত্বের অভ্যন্তরের রবরূপী আল্লাহ্‌র পরিচয় পাবার একাগ্র সাধনা। এই মহামূল্যবান সাধনার কথাটি কেন জোরেসোরে প্রচার করা হয় না? কোরান কি বলেনি যে, আল্লাহ্‌কে যে বা যারা অনুসরণ করতে চায় তারা যেন মোহাম্মদকে অনুসরণ

করে এবং মোহাম্মদকে অনুসরণ করাই হল আল্লাহ্কে অনুসরণ করা? তবে কেন হেরা পর্বতের গুহায় এই ধ্যানমগ্ন হবার সাধনার বিষয়টি অবহেলার চোখে দেখি? কিছুটা বাদ দেওয়া আর কিছুটা যোগ করে দেবার মাঝে কি মুনাফেকির পরিচয় বহন করে না? ভুল করা কি অনেক ভাল, জেনে শুনে ভণ্ডামি করার চেয়ে? তবে আমরা কি তাই করছি না? *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র মত বিশ্বকোষ লিখতে কয়েক হাজার জাঁদরেল অধ্যাপকের প্রয়োজন হয় এবং প্রতিটি অধ্যাপক এক একটি বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ, আর আসমান জমিন, ফেরেস্তার জগত, রূহের জগত ইত্যাদির মহাস্রষ্টার মহাগ্রন্থ কোরআনুল করিমের তফসির করে ফেলে জলের মত হাতেগোনা ক'জন অথবা অনেক ক্ষেত্রে একজন আরবি ভাষা জানা পণ্ডিত? এ জন্যই বোধহয় আমাকে একবার অনেক আগে এক মজ্‌জুব, যিনি সমাজে পাগল বলে পরিচিত, তিনি বলে ছিলেন যে, কোন অলী-দরবেশ, কামেল পীর-ফকির কোরানের তফসির করে যান নি। তিনি আরো বলে ছিলেন যে, জালাল উদ্দিন রুমী *মসনভী* লিখেছেন কিন্তু কোরানের তফসির করে যান নি। অবশ্য এ বিষয়ের গভীরতা বুঝবার বয়স ও বুদ্ধি তখন আমার হয় নি, তাই মুচকি হেসেছিলাম মাত্র। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে, সেই মজ্‌জুবের কথা কত বড় সত্য কথা এবং কত বড় সাংঘাতিক মন্তব্য।

মহানবীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই হল হেরা পর্বতের গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন হবার সাধনা, তথা আপন অস্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত পরম সত্তার পরিচয় লাভ করার সাধনা। এই সাধনা ঘরে থেকেও ঘরের বাইরের সাধনা। এই সাধনা জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকেও একার সাধনা। এই বৈরাগ্য ঘরকে একদম ছেড়ে নয়। ঘরে থেকেও ঘরে না থাকার মত সাধনার নামই একটি উন্নতমানের সাধনা। এই সাধনার মাধ্যমেই তিনি জিবরিল আমিনের দর্শন লাভ করেন। এবং কোরান নাজেলের আসল রহস্যই হল এই নির্জন সাধনা। এই সাধনা আপন অস্তিত্বের অভ্যন্তরে কী আছে তা জানার সাধনা। এই সাধনা ছাড়া কোনো কিছু লাভ করা বা অবগত হওয়া যে প্রায় অসম্ভব, সেটা তাঁর নিজের জীবনের ওপর দিয়ে আমাদের শিক্ষার একটি বিরাট মূল্যবান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। অথচ সেই সাধনার মূল্যায়ন আমরা অনেকটা ইচ্ছা করেই করতে চাই না। যার পরিণাম হল আমাদের এই লেজে গোবরের দশা। এই সাধনার নাম বৈরাগ্য সাধন। এই বৈরাগ্য সংসার জীবনে বাস করেও করা যায়, আবার সংসার জীবন ত্যাগ করেও করা যায়। সংসারে থাকা অথবা না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত ব্যক্তিগত। এখানে 'ইহা করতেই হবে' এমন কোন শর্ত নেই। যদি কোন সম্প্রদায় জোর করে যে কোন একটিকে বাধ্যতামূলক বলে ধরে নেয়, উহা মোটেই ঠিক নয়। কারণ উহা হল প্রবৃত্তি প্রসূত তথা মনগড়া আইন তৈরি করে জোর করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া। এ রকম জোর খাটানো ইসলামের মধ্যে নেই। তাই সংসার জীবনে থেকেও বৈরাগ্য সাধন করা যায়, আবার সংসার ত্যাগ করেও যায়। সংসার জীবন ত্যাগ করতেই হবে এমন কথা যেমন বৈরাগ্য সাধনের প্রশ্নে ইসলাম বলে নি, তেমনি সংসার জীবনে থেকেই বৈরাগ্য সাধন করতে হবে বলা হয় নি। দুটোর একটিকেও 'অবশ্যই' করতে হবে বলে ইসলাম ঘোষণা করে নি। সবার জন্য একই রকম ব্যবস্থাপত্র হতে হবে, এমন কথা ইসলামের মধ্যে যেমন হাস্যকর, তেমনি দুনিয়ার জীবনে চলার মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাস্যকর।

সুরা ফাতাহ্‌র আটাশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, তিনি তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ সমস্ত দ্বীনের ওপর উহাদের জাহের বা প্রকাশ করার জন্য।

সকল দ্বীন বলতে মানব রচিত পার্থিব আইন-কানুন বা বিধানগুলোকে বুঝায়। ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজ জীবন পরিচালনার জন্য মানুষকে অনেক প্রকার দ্বীন তথা বিধান তৈরি করে নিতে হয়। এই সব মানুষের দ্বীনগুলো তথা বিধানগুলো আল্লাহ্‌র একমাত্র দ্বীনের তথা আল্লাহ্‌র মৌলিক সৃষ্টি বিধানের ধারার সঙ্গে যোগসূত্র না রাখলে মানুষের কর্মজীবন তৌহিদভাব হতে সরে পরে। এই জন্যই আল্লাহ্‌র একমাত্র দ্বীনের রঙে মানবীয় দ্বীনগুলোকে রাঙিয়ে নিতে হয়। তবেই আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা সৃষ্টির মূল কার্য ও কারণ মানবীয় সকল প্রকার দ্বীনগুলোর ওপর জাহির হয়ে যায় তথা প্রকাশ লাভ করে। মোহাম্মদি ইসলামের (আসলে ইসলাম একটিই, কিন্তু পাঠককে বুঝাবার জন্য বলতে হচ্ছে) পূর্ববর্তী ইসলাম ধর্মগুলোও মানব রচিত অগণিত দ্বীনের ওপর একই রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং কোরানের এই বাক্যের দ্বারা আগের ইসলাম ধর্মগুলো, যাহা আল্লাহ্ কর্তৃক পাঠানো হয়েছিল, উহা বাতিল হয়ে যাবার কথা মোটেই বুঝায় না।

কোরানের এই বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন আমরা পবিত্র বাইবেলের প্রথম খণ্ডের মথির পাঁচ অধ্যায়ের সতের নম্বর বাক্যে দেখতে পাই : হজরত ঈসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্ট বলছেন, 'এই কথা মনে করিও না, আমি মুসার শরিয়ত আর নবীদের বাণী বাতিল করিতে আসিয়াছি। আমি সেইগুলি বাতিল করিতে আসি নাই বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।'

মহানবী সংসার জীবনে বাস করেও হেরা পর্বতের সেই নির্জন গুহায় একান্ত একাকী ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন আপনার ভেতর আপনাকে চেনবার, জানবার এবং বুঝবার জন্য। 'মোহাম্মদকে অনুসরণ করা হল আল্লাহ্কে অনুসরণ করা'-কোরানের এই কথা এবং উপদেশটি আমাদের প্রায় সবারই জানা আছে, অথচ এত বড় সাধনার বিষয়টির অনুসরণ করার গুরুত্ব আমরা কতটুকু দিতে পেরেছি? মনে হয় এর প্রয়োজনকে আমরা আমাদের জীবনের চলার পথ হতে বাদ দিয়ে ফেলেছি। ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তা বলতে পারবো না, তবে বাদ যে দেওয়া হয়েছে এটা কমবেশি সবাই বুঝতে পারে। এই নির্জনতার ভেতরই কোরানের প্রথম বাণীটির আবির্ভাব। এই নির্জনতার ভেতরই রুহুল আমিন তথা হজরত জিব্রিলের প্রথম আগমন এবং প্রথম দর্শন লাভ। অথচ এই নির্জনতার এত বড় মহান গুণগুলোর গুরুত্ব দিনে দিনে হারিয়ে ফেলেছি। এই রকম নির্জনে ধ্যানমগ্ন হবার আদর্শটি কি আমাদের ওপর অন্যান্য আদর্শের মত বর্তায়

না? নিজেকে চিনতে হলে, জানতে হলে, রহস্যের পর্দা উঠাবার এতটুকু আগ্রহ থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই নির্জনবাস করতে হবে : নির্জনে ধ্যানমগ্ন হতে না পারলে বিদ্যার একটি বড় সাগর হতে পারবো সত্যি, কিন্তু নিজেকে চেনা ও জানার প্রশ্নে একটা পচা ডোবাও হতে পারবো না–এটা অন্ততঃ অধম লেখক হলপ করে বলতে চায় এবং ফরমান জারি করতে চায় যে, এত কিছু জানবার পরও একটি হতাশার বোবা ব্যথা নিয়ে ইহলোক হতে প্রস্থান করতে হবে। আমরা প্রায় সবাই অন্য কিছুকে জানবার আগ্রহে উৎসাহী। অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রকার মন্তব্য করতে ভালবাসি। পৃথিবীর মানুষ আর মাটি চেনার কত আগ্রহ আর উৎসাহ, কিন্তু নিজেকে চেনার কথা বললেই কেমন যেন আপসে চুপসে যাই। আর ভাল লাগতে চায় না। মনের ভেতর যে শয়তানটি লুকিয়ে আছে সে নড়াচড়া দিয়ে ওঠে এবং নানা প্রকার যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর প্রমাণ হাজির করে মুখটাকে বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। কারণ মহানবী নিজেই বলেছেন যে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান দেয়া হয়েছে। সুতরাং সেই শয়তানের কি কোনো কাজ কর্ম নেই? আপনি আর আমি বেকার থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মাঝে যে দু'টি শয়তান দেয়া হয়েছে তারা কি তাদের ডিউটি ফেলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে? শয়তানের বুদ্ধি দেওয়া এত সূক্ষ্ম এবং সাংঘাতিক যে, মানুষ বুঝতেই পারবে না যে, সে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আছে। অবশ্য নিজেকে চেনার প্রচণ্ড তাগিদ থাকলেও সবার পক্ষে তা অসম্ভব, বরং অতি অল্পই এই তাগিদের প্রকৃত গুরুত্ব দিয়ে থাকে; যেমন বৈজ্ঞানিক হবার উপদেশ সবাইকে দিলেও অতি সামান্যই বৈজ্ঞানিক হতে পারে। 'ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়' তথা অপরকে চেনা দায়, শুনলে প্রত্যেকের মন হি হি করে হাসতে চায়। তার মানে মন সায় দেয় যে বাক্যটি একদম সত্য। কিন্তু যদি বলা হয়, ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় রে, তথা খুবই কঠিন, তাহলে আপসে মনের হাসিটুকু চুপসে যায় এবং মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। সবাই অন্যকে বুঝতে ভালবাসে, কিন্তু নিজকে চেনার কথা অল্পই ভাবে। কেন অল্প লোকে নিজেকে চেনার কথা ভাবে এই কথারও সুন্দর রহস্য আছে। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা লেখার মত স্বাধীনতা অধম লেখকের নেই। এবং এরপরেও যদি পাঠককে বুঝবার জন্য কিছু লেখতে যাই তবে সঙ্গে সঙ্গে বইটি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা শুনতে হবে। কারণ ইহা উপন্যাস, নাটক অথবা ছোট গল্প লেখা নয়, বরং ইহা ধর্ম বিষয়ের ওপর আলোচনা। এখানে অধম লেখক অনেকটা কৃষকের বানানো, মুখে মুখোশ লাগানো, গরুর মতো : ফসলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও মুখ লাগাবার স্বাধীনতা নেই। কেবল চোখে দেখেই যেতে হবে, কিন্তু মুখ দিয়ে চেখে দেখার কোন উপায় নেই।

আমরা যদি একটু ভাবি তাহলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রতিটি জিনিস আমাদের উপকারে আসে (অবশ্য মারণাস্ত্র নয়)। কিন্তু সেই আবিষ্কৃত জিনিসগুলো নিজেকে চেনার জন্য কতটুকু সহায়ক? হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক, আবার হয়তো অনেক কম। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের দানকে মানবজাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে এবং করা উচিত; কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিকেরাও নিজেকে চেনার সাধনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কারণ, এটাই ছিল তাদের তকদিরের লেখা। তকদিরে যতটুকু পৃথিবীকে দেবার ছিল ঠিক ততটুকু একজন বৈজ্ঞানিক দিতে পেরেছে এবং এর চেয়ে একচুলও এগিয়ে যাবার ক্ষমতা কোন বৈজ্ঞানিকের নেই। জন্মচক্রের ঘূর্ণায়মান মঞ্চের বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ করার এক একটা অপূর্ব ভঙ্গিই কেবল। এই চরিত্রের ভঙ্গিগুলো কি চক্রাকারে ঘুরছে না অন্য কিছু? চক্রাকারে ঘোরার নামই কি পুনর্জন্ম? তবে কি এই পুনর্জন্মের কথা কোরানের পাতায় পাতায় আছে? না একদম নেই? কোনটার কথা কোরান বলছে? অধম লেখক জানলেও তা বলবে না। কারণ, প্রচলিত শরিয়তের আইনকে একান্ত বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে।

কম্পিউটার আপনাকে অনেক রকম নতুন নতুন হিসেব দিতে পারবে এবং আরো অত্যাধুনিক হিসাব ভবিষ্যতে দিয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। রোবট আজ আধুনিক কারখানার জটিল কাজগুলো অপূর্ব নৈপুণ্যে সমাধা করে দিচ্ছে, যা একটা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সময় সাপেক্ষ এবং এ রকমভাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি খণ্ডিত ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়ে চলছে এবং চলবে। কিন্তু এই চরম আধুনিক বিজ্ঞান তো দূরে থাক, চরমতম আধুনিক বিজ্ঞানও কি পারবে কোনো দিন নিজেকে চেনার মেশিন বা যন্ত্র আবিষ্কার করতে? যদি পারে তবে ধন্য এই বিজ্ঞানকে। আর যদি না পারে তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ, এই বিষয়টির প্রশ্নে বিজ্ঞান কোনদিন পারে কিনা তা প্রায় সন্দেহজনক বলেই অধম লেখকের মনে হয়। যদিও মনেপ্রাণে দোয়া করি যে, অচিরেই যেন অধম লেখকের সন্দেহটি একদম বরবাদে পরিণত হয় এবং ধর্মের নামে নানা প্রকার উদ্ভট মতবাদগুলো আপনা আপনি আগুনের ধোঁয়া বাতাসে মিলিয়ে যাবার মতো মিশে যায়।

হজরত আদম (আ.) হতে হজরত মোহাম্মদ (আ.) পর্যন্ত একটিমাত্র ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। সেই একটিমাত্র ইসলাম ধর্মের মূল এবং একটিমাত্র কথাটি হল নিজেকে চেনা। যুগের চাহিদা অনুযায়ী কেবল শরিয়তেরই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, কিন্তু মূলনীতির পরিবর্তনের প্রশ্নই অবান্তর। কারণ, আমরা দেখতে পাই, কোরান পূর্ববর্তী নবীদের সালাত কায়েমের উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং মহানবীর আগের নবীদের সালাত কায়েমের প্রয়োগগুলো এক একজন নবীর এক এক রকম, কিন্তু মূল বিষয় ও বক্তব্য মাত্র একটি, তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা, তথা সালাত কায়েম করা, তথা ফারসি ভাষায় যাকে নামাজ আদায় করা বুঝায়। যখন নিজেকে চেনা হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌কেও চেনা হয়ে যায়। একথা ঘোষণা করতে গিয়ে ইসলাম একটি শব্দ ব্যবহার করছে এবং সেই শব্দটি হল 'ফাকাদ', অর্থাৎ কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, অবশ্য অবশ্যই। অর্থাৎ নিজেকে চেনার অপর নামই হল আল্লাহ্‌কে চেনা। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর তা হল, এখানে আল্লাহ্‌কে চেনার আহ্বান না জানিয়ে নিজেকে চেনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিজেকে চিনতে পারলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল। এমনকি যে স্রষ্টাকে জানার একটা আকাঙ্ক্ষা কমবেশি মানুষের মনে উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাটিও পূর্ণ হয়ে গেল বলা হয়েছে। আল্লাহ্ থাকলেই বা আমাদের কী লাভ হবে, আর না থাকলেই বা আমাদের কী ক্ষতি হবে–ঐ বিষয়টির প্রশ্নে যুক্তিতর্ক, দার্শনিক মতবাদের নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে স্থূল মনের বিকারগ্রস্ততাই প্রকাশ পাবে এবং এই বিকারের হা-হুতাশ দার্শনিকদের দর্শন পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তাই ইসলাম এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে বরং নিজেকে চেনার ও জানবার আহ্বান করেছে। এবং এই একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার চির অবসান হবার কথাও বলা হয়েছে। অবশ্য দার্শনিকদেরও দোষ দিতে চাই না, কারণ চিন্তার বিভিন্নতা এবং জটিলতা না থাকলে এ রকম উপদেশ দেবার সার্থকতাও থাকে না। রোগ আছে বলেই বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার নিয়ম-কানুন চালু দেখতে পাই, কিন্তু রোগ না থাকলে কি চিকিৎসার প্রয়োজন হতো? অভাব আছে বলেই তো সমস্যা, পাপ আছে বলেই তো ত্রাণ পাবার উপদেশগুলোর এত দাম। নিজেকে চেনার প্রশ্ন উঠলে নির্জনবাস করতেই হবে। তা ঘরে থেকে হোক অথবা ঘরে না থেকে হোক সেই প্রশ্নটি মুখ্য নয়। মুখ্য হল নির্জনবাস করতেই হবে এবং সেই শিক্ষা মহানবী তাঁর নিজের জীবনের ওপর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন হেরা পর্বতের গুহায় একাকী নির্জনবাসের ধ্যানমগ্ন সাধনার মাধ্যমে। আপনি যদি এ রকম সাধনাকে অস্বীকার করতে চান তাতে কারো কিছু বলার নেই; কারণ, সাধনা করা না-করার স্বাধীনতা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং এই স্বাধীনতার সময়সীমা মৃত্যু নামক ঘটনা পর্যন্ত। উপদেশ দেবার তাগিদ থাকতে পারে, কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করা না-করার ইচ্ছাটি একান্ত ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণ করতেই হবে, এ রকম শক্তি খাটানোর আদেশ বিশেষ করে এই বিষয়টিতে নেই, বরং এই বিষয়টিকে গ্রহণ করা অথবা বর্জনের আছে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা।

কেবলা ও কাবার পরিচয়-ভিত্তিক সাধন-পদ্ধতি

নির্জনবাসের প্রকারভেদ অনেক রকম হতে পারে। এই নানা প্রকার নির্জনবাস পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সময়সীমার মাপকাঠি বিভিন্ন রূপধারণ করতে পারে। সব নির্জনবাসই যে এক রকম হতে হবে এমন কথা ইসলামের বিধানে নেই। কারণ, প্রচণ্ড শীতের দেশগুলোর পরিবেশ অন্যান্য দেশের মত এক রকম হতেই পারে না। সুতরাং নির্জনবাসের প্রশ্নে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের প্রয়োগ-পদ্ধতিও ভিন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রশ্নে এক হতে বাধ্য। তবে ধ্যানের গভীরতার প্রশ্নটিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কারণ, সবার ধ্যানের গভীরতা এক রকম হয় না এবং হতেই পারে না। কারণ ধ্যানমগ্ন হবার বিষয়টি একান্ত মনোগত ব্যাপার এবং মনোগত ব্যাপারটি কখনই এক রকম হয় না। আজকের এই আধুনিক যুগে নির্জন সাধনাটি শহরে বাস করা মানুষের পক্ষে একটু কষ্টকর বৈকি। তার ওপর জীবিকার প্রশ্নটি তো আছেই। যদি নির্জন সাধনার একটি প্রয়োগ-পদ্ধতির খুঁটিনাটি নিয়মগুলো বলতে চাই তাহলে কি সবার পক্ষে একই নিয়মে সম্ভবপর হতে পারে? যেমন ধরুন, নিজের বাড়ি অথবা ভাড়া করা বাসায় নির্জন-সাধনা করতে হলে একটি ছোট ঘর নিজের জন্য অবশ্যই রাখতে হবে এবং সেই ঘরটিকে জাহিরি সুরতেও অবশ্যই পাকপবিত্র রাখতে হবে এবং সেই ঘরটিতে অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। এমনকি আপন পুত্র-কন্যা তো বটেই, তার ওপর নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত সেই ঘরে ঢুকতে দেবেন না। সেই ঘরের সাজানো গোছানো হতে শুরু করে সব কিছুই আপনার নিজ হাতে করতে হবে এবং নির্জন সাধনার সময়টুকু অতিবাহিত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে তালা দিয়ে সেই চাবি নিজের কাছে রাখতে হবে। কারণ, আপনার মনের অজান্তে যদি কেউ ভুলক্রমে ঢুকে পড়ে তাহলে চলবে না। এক কথায় সেই ঘরে আপনি ছাড়া আর কেউ ঢুকার প্রশ্নই উঠে না। তবে নিজের পীর ও মুরশেদ কেবলায়ে কাবার জন্য সেই আদেশ খাটবে না। তিনি অবশ্যই সেই ঘরে ঢুকতে পারবেন, থাকতে পারবেন এবং নির্জন সাধনের প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলো সেখানে থেকে আপনাকে শিখাতেও পারেন। অর্থাৎ এক কথায় নিজের পীর কেবলায়ে কাবার জন্য সেই আদেশটি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

আপন পীর ও মুরশেদই হল আপনার হাকিকতের কেবলায়ে কাবা। সুতরাং কেবলা ও কাবা বলতে কী বোঝায় সেই বিষয়টি পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে বোঝাতে গেলে বিষয়টি কিছুটা ঘোলাটে থেকে যেতে পারে। তবে যারা নির্জন-সাধন করার মনমানসিকতার উপযোগী, তারা এই কেবলা ও কাবা বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারেন। তবুও কেবলা ও কাবা কাকে বলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবশ্যই দেবার প্রয়োজন অনুভব করি। কারণ, যারা এই বিষয়টির রহস্য জানেন না, তাদের কাছে পীর ও মুরশেদ কেবলায়ে কাবা কথাটি কেমন যেন বেখাপ্পা এবং উল্টাপাল্টা মনে হতে পারে। অবশ্য না বুঝতে পারলে সবাইকে কমবেশি এ রকম অবস্থায় পড়তে হয়, আবার বুঝিয়ে দিলেই সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারে। তারপর সেই ঘরটিতে একটি বাঁধাই করা ছবি রাখুন। সেই ছবিটি কার? নিজের পীরের ছবি। যদি সামর্থ্য থাকে তবে একটি টেপ রেকর্ডও রাখতে পারেন এবং কিছু ভক্তিমূলক গানের ক্যাসেটও। সেই গানগুলোর ক্যাসেট রাখবেন, যে গানগুলো আপনার হৃদয়ে ভক্তির আগুন ধরিয়ে দেয়। তা সে যে ধরনেরই গান হোক না কেন। আপনি রাতের কিছু অংশ অথবা যদি সারা রাত পারেন সেই বন্ধ ঘরে বসে এক মনে আপনার পীরের দিকে চেয়ে থাকুন। এমনভাবে চাইবেন যেন সেই ছবিটি আপনার ধ্যানের

ছবি হয়। মনমগজে কেবল পীরের ছবিটিই থাকে, আর কিছু নয়। অবশ্য প্রথম প্রথম মন এদিক-সেদিক যাবেই, তারপর ধীরে ধীরে সাধনার মাধ্যমে একাগ্রতার গভীরে অগ্রসর হতে থাকবে। এই গভীরতা সময়সাপেক্ষ, তবে ধ্যানের গভীরতার প্রশ্নে সবারই একই রকম সময়ের প্রয়োজন হয় না। কারো তাড়াতাড়ি হয়, আবার কারো বা বেশি সময় লেগে যায়। আপনি আপনার পীরের ছবিটির দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করুন যে, পীরের ছবিতে যে হাত দুটো দেখা যাচ্ছে উহা আপনার নিজের হাত, পা দুটো আপনার নিজের পা, চোখ দুটো আপনার চোখ। তারপর আরো ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকুন। এভাবে আপনি মনে করতে চেষ্টা করুন যে, পীরের যে ছবিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন উহা আপনার নিজের ছবি, অর্থাৎ আপনার এই দেহটিতে সম্পূর্ণরূপে তিনিই বর্তমান এবং আপনার মন তাঁরই মন, সুতরাং আপনার বলতে আর কিছু রইলো না। সব কিছুতেই তিনি, এই ধ্যানে মগ্ন হতে চেষ্টা করুন। প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। এই চেষ্টার মাঝে শয়তান প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইবে। কারণ, এই সাধনেই শয়তানের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করে দেয়। আপনি কখনো শয়তানের কাছে হেরে যাবেন, আবার কখনো জিতে যাবেন। এই হারজিৎ-এর সাধনায় আপনাকে পাথরের মত থাকতে হবে অবিচল। শয়তান নাড়াতে চাইবে যত প্রাণপণে, আপনি তার চেয়ে বেশি অবিচল থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকুন। কারণ, সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শয়তান আমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে আছে, আর আমি শয়তানের বাসায় আগুন ধরিয়ে দেবার সাধনায় রত আছি। সুতরাং বিরোধ এবং সংঘাত অবধারিত। যেখানে বিরোধ এবং সংঘাত অবধারিত সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটিও অবধারিত। সুতরাং সাধনার গভীরতা যত বেশি হবে, শয়তানের অবস্থাও তত খারাপের দিকে যেতে থাকবে। শয়তান কীভাবে চিৎকার শুরু করে দেয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করবেন, যখন আপনার সাধনা গভীরের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকবে। এই সাধনার নামই তাসাব্বুরে শায়েখ, তথা পীরের ধ্যান করার সাধনা। প্রথম দিকে পীরের ছবির ধ্যান করা খুবই কঠিন মনে হবে। তাই আপনি পীরের দেওয়া জিকির আর অজিফায় কিছুক্ষণ লিপ্ত থাকুন এবং ধ্যানের পরিবেশ নিজের মধ্যে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জিকির আর অজিফায় লিপ্ত থাকুন। যদি আপন পীর কোনো জিকির এবং অজিফা না দেন তাহলে আপনার মন মতো যে কোনো প্রকারের হোক জিকির এবং অজিফায় লিপ্ত থাকুন এবং কিছুক্ষণ থাকার পর ধ্যানের সাধনায় যেতে চেষ্টা করুন। পীরের এ রকম ধ্যান করা সবচাইতে কঠিন বিষয়, অথচ বলতে গেলে মনে হবে কত সহজ। কারণ ধ্যান বিষয়টিই হল একান্ত মনের বিষয়। মনকে সকল স্থান হতে ছুটিয়ে এনে একস্থানে রাখা এবং তাহাতে নিমজ্জিত হওয়া যে কতটুকু কঠিন বিষয় উহা সাধনা না করা পর্যন্ত বুঝতেই পারবেন না। কারণ, এই মন এত চঞ্চল এবং এত দ্রুত গতিসম্পন্ন যে, এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে এমনভাবে ছুটে চলে যে, তা টের পেতে না পেতেই ছুটোছুটির রং-তামাশাগুলো সুন্দর বুঝতে পারবেন এবং মনের অজান্তে সাধনা করতে গিয়ে আপনি ফক করে হেসে ফেলবেন আপনার মনের এই ছুটোছুটির রূপ দেখে। দিনে দিনেই আপনি গভীরতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন। তারপর আপনি অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পর দেখতে পাবেন যে, আপনি একধাপ উপরে উঠে গেছেন এবং একধাপ যে ওপরে উঠেছেন তা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, কারণ এই ধাপটি বড়ই লোভনীয় ধাপ। এই লোভনীয় ধাপে এসে অনেক সাধক থমকে যায়। কারণ, এই ধাপ হতেই সাধকেরা কিছু নতুন নতুন পুরস্কার পাবার রূপ দেখতে থাকে। এই ধাপেই জিনের সঙ্গে সাধকের দেখা হয়। জিন অতি সূক্ষ্ম, তাই সূক্ষ্মতার পরিচয় এখান থেকেই সাধকের শুরু হয়। সাধক বিভোর হতে চায়, কিন্তু খবরদার! আপনি ভুলেও থেমে যাবেন না, অথবা এই লোভনীয় সিঁড়িতে এসে ভুলেও বসে পড়বেন না। কারণ, এখানেও আপনার সঙ্গে শয়তান আছে, তবে শয়তানের আসল রূপটির রহস্য এই সিঁড়িতেই সুন্দর ধরা পড়ে যায়। তাই আপনি একমনে আপনার সাধনা চালিয়ে যেতে থাকুন। যত লোভনীয় সিঁড়িগুলো একের পর এক আসতে থাক না কেন, আপনি কোথাও থেমে যাবেন না। ভুলেও না। আপনাকে যে ফানাফিল্লাহ্তে পৌঁছুতে হবেই। তাই আপনি একটি উন্নত ধাপে গিয়ে দেখতে পাবেন যে, চোখ দিয়ে আপনি দেখছেন না, দেখছেন আপনার পীর। খেতে বসে দেখবেন, আপনি খাচ্ছেন না, খাচ্ছেন আপনার পীর। এভাবে দৈনন্দিন প্রতিটি কাজকর্ম মনে হবে আপনি করছেন না, করছে আপনার পীর এবং এভাবেই ধীরে ধীরে একদিন আপনার মনের অজান্তে ফানার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন। সুতরাং নির্জনে ধ্যানমগ্ন হবার জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘরের কতটুকু প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। এত কিছু বুঝবার পরও যদি আপনি সাধনা করতে পারলেন না, বা সাধনা করার সময় ও সুযোগ করে নিতে পারলেন না, তাহলে এই না পারাটাও আপনার তকদির এবং এই তকদিরের লাথি-উস্টা যে কী রকম খেতে হবে তা পরে হাড়ে হাড়ে টের পাবেন আর অনুশোচনার দহনে দগ্ধ হতে থাকবেন। এই ব্যবসা-বাণিজ্য, এই মালপানির মোহ সব কিছু আপনাকে কিছুদিনের জন্য চোখ থাকতেও অন্ধ করে দিতে পারে এবং তাই দিয়ে আসছে। কারণ এদের কত প্রচণ্ড শক্তি থাকলে আপনার চোখ দুটো সব কিছু দেখতে পেরেও আবার কিছুই দেখতে পায় না এ রকম করে রাখতে পারে–একবার মনে মনে পাঁচ মিনিট ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। দিন শেষ হয়ে আসছে, তবু মালপানির মোহ কেটে উঠতে পারছি না। মনকে শান্তি দেবার জন্য কত রকম নতুন নতুন বিদ্যার দর্শন দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে যাই। হায়রে মন! কত বিচিত্র রঙ নিয়ে খেলতে ভালবাসে এই রঙ্গিলা মন।

ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি যখন মুরিদ হলেন হজরত ইমাম জাফর সাদেকের নিকট, তখন হজরত বায়েজিদ বোস্তামির সাধনার স্তরগুলোর বর্ণনা খুবই চমৎকার, আমাদের জন্য মূল্যবান শিক্ষার বিষয় এবং বিশেষ করে তাদের জন্য যারা নিজেকে চেনার সাধনা করতে চায় বা আগ্রহী। প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, হজরত বায়েজিদের পীর ও মুরশেদ কেবলায়ে কাবা হলেন সেই বিখ্যাত ইমাম জাফর সাদেক, যিনি সরাসরি মহানবীর বংশের নাতি ইমাম হোসায়েনের নাতি ইমাম জাফর সাদেক। হজরত বায়েজিদ মুরিদ হবার

সঙ্গে সঙ্গে একটি আলাদা ঘরে সাধনা করার নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন। সেই জামানায় প্রথমে চার বছর একটানা বায়েজিদ সাধনায় ধ্যানমগ্ন হলেন এবং চার বছর শেষ হবার পর বায়েজিদের সাধনার কতটুকু সিদ্ধিলাভ হয়েছে তার পরীক্ষা নিতে চাইলেন। একদিন ভোরবেলায় বায়েজিদের মুরশেদ ইমাম জাফর সাদেক তাঁর নিজ ঘরে ডেকে এনে হুকুম দিলেন, ঘরের এক কোণে রেখে দেওয়া কোরান শরীফটি এনে তাঁর হাতে দিতে। হজরত বায়েজিদ পীরের হুকুম অনুযায়ী তাই করলেন অর্থাৎ কোরান শরীফটি তুলে এনে পীরের হাতে দিলেন এবং দেবার সাথে সাথে পীর সাহেব বললেন যে, বায়েজিদের সাধনায় এখনো সিদ্ধিলাভ হয়নি অর্থাৎ কামালিয়াত হাসিল হয়নি। সুতরাং পুনরায় চার বছর সাধনা করার আদেশ দেয়া হল। হজরত বায়েজিদ কোনো কিছু না বলে পীরের হুকুম মান্য করে আবার একটানা চার বছর সাধনায় ধ্যানমগ্ন হলেন এবং পুনরায় চার বছর করার পর পীর সাহেব বায়েজিদকে ডেকে আপন ঘরে এনে সেই চার বছর আগের পুরাতন একই হুকুম দিলেন–ঘরের কোণে রাখা কোরান শরীফটা এনে দিতে। হজরত বায়েজিদ পীরের হুকুম অনুযায়ী তাহাই করলেন এবং এতে ইমাম জাফর সাদেক বললেন যে,বায়েজিদের সাধনায় এখনো সিদ্ধি লাভ হয়নি, অর্থাৎ কামালিয়াত হাসিল হয়নি। সুতরাং পুনরায় চার বছর সাধনা করার আদেশ আবার দেওয়া হল। হজরত বায়েজিদ কোনো কিছু না বলে পীরের হকুম শিরোধার্য মনে করে আবার একটানা চার বছর সাধনায় ধ্যানমগ্ন হলেন। এবং সাধনার প্রচণ্ডতা আগের চেয়ে বেশি বাড়ানো হল এবং চার বছর সাধনা করার পর পীর সাহেব বায়েজিদকে ডেকে আপন ঘরে এনে সেই একই হুকুম দিলেন–ঘরের কোণে রাখা কোরান শরীফটা এনে দিতে। পীরের আদেশ অনুযায়ী বায়েজিদ ঘরের কোণ হতে কোরান শরীফ আনতে গেলেন, কিন্তু খালি হাতে পীরের সামনে এসে হাজির হওয়াতে পীর সাহেব খালি হাতে ফেরত আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হজয়ত বায়েজিদ ভয়ে ভয়ে পীর সাহেবকে বললেন যে, তিনি ঘরের কোথাও কোরান শরীফ দেখতে পেলেন না, তাই খালি হাতে ফেরত আসতে হয়েছে। হজরত ইমাম জাফর সাদেক বললেন, 'কেন? ঐ তো কোরান শরীফটি রাখা আছে! যাও, নিয়ে আস।' পুনরায় কোরান শরীফ আনতে গেলেন, কিন্তু খালি হাতে ফেরত আসাতে পীর সাহেব অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন খালি হাতে ফেরত আসা হল?' এবার বায়েজিদ ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন এই বলে যে, তিনি ঘরের কোথাও কোরান শরীফ দেখতে পাচ্ছেন না। হজরত ইমাম জাফর সাদেক প্রশ্ন করলেন : 'তবে তুমি ঘরের ভেতর কি কিছুই দেখতে পাওনি?' উত্তরে বায়েজিদ বললেন, 'হুজুর, না তবে যেদিকেই তাকাই না কেন কেবলই আপনাকে দেখতে পাই এবং আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তাই এবার আপনার হুকুম অনুসারে কোরান শরীফটি আনতে পারলাম না, কারণ যেখানে কোরান শরীফ থাকার কথা সেখানে গিয়ে কোরান শরীফ দেখতে পাই না, পাই কেবল আপনার চেহারা মোরারক, তাই অগত্যা বাধ্য হয়ে আমাকে ফেরত আসতে হল এবং এজন্য আমি খুবই লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।' বায়েজিদের মাথায় হাত বুলিয়ে ইমাম জাফর সাদেক বললেন যে তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে, তথা কামালিয়াত হাসেল হয়ে গেছে এবং এখন তিনি ইসলামের তবলিগ করার উপযুক্ত। সুতরাং ইসলামের তবলিগ তথা দাওয়াত দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকা সমীচীন বলে বিদায় করে দিলেন। ইসলামের তবলিগের জন্য বায়েজিদ দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং এই তবলিগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অধম লেখক কোন কটাক্ষ করে বলছি না অথবা সমালোচনাও করতে চাই না, কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে, হজরত বায়েজিদের তবলিগ আর আজকের এই বিংশ শতাব্দীর তবলিগের মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য কি দেখতে পাই না? নিজের নেই কোন ঠিকানা আর আত্মপরিচয়ের সাধনালব্ধ জ্ঞান, অথচ অন্যকে আদেশ আর উপদেশ দিতে পারি অনেক। সেই মহানবীর সময় বদরের যুদ্ধটির কথা মনে পড়ছে। হজরত ওমর ফারুক সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিজের আপন মামাকেও হত্যা করেছিলেন, কারণ তাঁর মামা মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। আর আজ আমরা কোথায় নেমে এসেছি! সেই মহানবীর বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এই বিংশ শতাব্দীর কিছু মুসলমান নামধারীরা 'আল বদর বাহিনী' নাম দিয়ে কী জঘন্য একটি কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করে গেল এই বাংলার মাটিতে। উভয়টির নাম যদিও এক, কিন্তু কাজের বেলায় দুটোর ব্যবধান কত আকাশ আর পাতাল। অধম লেখকের আজও মনে আছে যে, কুষ্টিয়া জেলার এক কুখ্যাত ডাকাত ধরা পড়ার পর সেই ডাকাতের নামটি খররের কাগজে পড়ে কিছুক্ষণ থতমত খেয়েছিলাম। কারণ, সেই কুখ্যাত ডাকাতটির নাম ছিল হজরত আলী। উভয়ের নাম যদিও এক, কিন্তু কাজের বেলায় দুটোর ব্যবধান কত আকাশ আর পাতাল। এভাবেই বুঝি আমরা ধোঁকা খাই এবং এ রকম ধোঁকা কতদিন যে আমাদের খেতে হবে তা জানি না। প্রতারকের ধোঁকায় পড়ে যেমন অনেকে সব কিছু হারিয়ে বসে এবং এই হারাবার যাতনায় তিলে তিলে বাধ্য হয়ে জ্বলতে হয়, সে রকমভাবে কি আমাদের তিলে তিলে জ্বলতে হবে? এবং এই তিলে তিলে জ্বলার নামও কি তকদিরের লেখা বলবো?

সাধনার তৃতীয় স্তরে হজরত বায়েজিদ আপন পীর ও মুরশেদ কেবলায়ে কাবাকে ছাড়া আর কিছুই যখন দেখতে পেলেন না, তখনই কামালিয়াত হাসিল হয়ে যাবার উপদেশটি পাওয়া গেল। পীরপূজারক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, যিনি মানুষের রচিত আর একটি কোরান *মসনভী শরীফ* রচনা করে গেছেন, তিনিও এই স্তরের সাধনাকে লক্ষ করে সাধকদের উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে, 'পীরের জাতই আল্লাহ্‌র জাত এবং এই একরূপে যারা দেখতে পায় নি তারা মুরিদ হয় নি, তারা মুরিদ হয় নি, তারা মুরিদ হয় নি।'

'পীরেরা জাতে খোদা এক না দিদ,
নাই মরিদু, নাই মুরিদু, নাই মুরিদু।'

বিখ্যাত পীরপূজারক হজরত হাফিজ সিরাজীও এই সাধনার পূর্ণ সমর্থন দিতে গিয়ে সাধকদের লক্ষ করে উপদেশ দিচ্ছেন 'মদ দিয়ে নামাজের মুসাল্লাকে রঙিন কর, যদি তোমার কামেল পীর বলেন। কেননা গন্তব্যস্থানের নিয়ম-কানুন ও রাস্তা কামেল পীরের অজানা নয়।' *"ব'মায় সাজজাদা রঙিন কুন গারাত্ পীরে মোগা গোয়েদ, না সালেক বেখবর না বুদ যে রাহ্ ওয়েস্‌মে মন্‌জিল হা।"*

যার সাধনা আল্লাহ্‌কে পাবার সাধনা এবং যে বা যারা আল্লাহ্‌কে পাবার সাধনা করতে চায় বা আগ্রহী, তাদেরকে লক্ষ করে পীরপূজারক হজরত হাফিজ সিরাজী উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, ওগো হাফিজ, যদি তুমি হুজুরি তথা কামালিয়াত হাসেল করতে চাও তবে আপন পীর হতে দূরে থেকো না। যদি তার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে যার সঙ্গে তোমার ভালবাসা, তা হলে তুমি দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা ছেড়ে দাও।

হুজুরী গার্ হামি খাহি আজু গায়েব মশো হাফেজ,
মাতা মাতালক্বা মান্ তাহ্‌ওয়া দাইদ দুনিয়া আম্ হেল্‌হো।

কামালিয়াত হাসেল করার সাধনা এবং রহস্য যারা বোঝে না বা বুঝতে চায় না, তারা তো অতি সাধারণ মানুষ এবং এই সাধারণ মানুষগুলো যেন মাঠে ময়দানে বিচারণকারী ভেড়ার পালের মত। তাই পীরপূজারক হজরত হাফিজ সিরাজী সাধকদেরকে বলছেন, 'যারা সত্যকে বোঝে না তাদের মাথা যেন তোমার মাঠের ভেড়ার মাথার মত।'

কায় সেরে হক্ নাশেনাসা গোয়ে ময়দানে শুমা।

আপন পীর ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবাকে লক্ষ করে হজরত হাফিজ সিরাজী বলছেন যে,
'যদিও আমি দেহ থেকে দূরে কিন্তু হৃদয় হতে মোটেই দূরে নই।'

গারচে দুরেম আজ বেসাতে কোরবে হামাত্ দূর নিস্ত।

রহস্যালোকে প্রবেশ করতে হলে নিজের পীর মুরশিদ ছাড়া আর কোন পথ নেই এবং উপায়ও নেই; কারণ, রহস্যালোকের জ্ঞান এই পথে অগ্রসর না হতে পারলে অর্জিত হয় না। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি পুস্তক পাঠ করলেই অর্জন করা যায় এবং এই বিদ্যাবুদ্ধি সবাই কমবেশি অর্জন করতে পারে। কিন্তু রহস্যালোকের জ্ঞান অর্জন করার ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। তাই পীরপূজারক হজরত হাফিজ সিরাজী সাধকদেরকে লক্ষ করে বলছেন যে, 'হাফিজ প্রার্থনা করছে তোমরা শোন এবং কবুল করতে বল–আমার খোরাক হোক তোমার ওই রূপ-ছড়ানো মিষ্টি লাল ঠোঁট।'

মিকুনাদ্ হাফিজ দোয়ায়ে বিশনু আমিনে বগো
রুজিয়ে মা বাদ লালে শাককার আফশানে শুমা।

হজরত বায়েজিদ বোস্তামি সাধনার তৃতীয় স্তরে যেমন আপন পীরকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি, সেই একই কথা হজরত হাফিজ সিরাজীও সাধকদেরকে লক্ষ করে বলছেন, 'আপন পীরের নূরময় সুরত দেখতে পাচ্ছি সবখানে।' *'বাহার সুরত্ জামালে ইয়ারে দিদাম।'* এই রহস্যালোকের জ্ঞান যে কত চমৎকার, সুগভীর এবং আনন্দদায়ক সেই কথা বলতে গিয়ে হজরত হাফিজ সিরাজী সাধকদেরকে বলছেন, 'যখন এক মুঠো জ্ঞান হাফিজকে দান করা হল কেবল তখনই মনে হল যে হাফিজের এতকালের অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধির আর কোনো মূল্যই নেই।'

'চু জুররা রাশিদাস্ত মায় বা হাফিজ-
হামা আক্‌লে খেরাদ বেকারে দিদাম।'

হজরত হাফিজ সিরাজীর মত এই একই উপদেশ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন স্টাইলে সাধকদেরকে দিয়ে গেছেন হজরত বু আলী শাহ কলন্দর, হজরত আমির খসরু, হজরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, হজরত নাসির উদ্দিন চেরাগে মাহ্‌মুদে দেহলিয়া, হজরত আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরী, হজরত কুতব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী, হজরত উসমান হারুনী বাক্কা, হজরত বাকি বিল্লাহ, হজরত বাবা ফরিদ এবং আরও অনেকে। তাঁদের তবলিগের দরুনই তথা ইসলামের দাওয়াত দেবার এবং কবুল করার দরুন আজ আমরা পাক-ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্ব অনুভব করি। কারণ, আমার মত মোল্লা যদি সাত রাত সাত দিনও অন্য ধর্মের এলাকায় গিয়ে ওয়াজ-নসিহত করি তাতে একজনেরও মুসলমান হওয়া তো দুরে থাক শুনবার আগ্রহটি থাকে কিনা তাতে পূর্ণ সন্দেহ আছে এবং আমার এই বক্তব্য অতি বাস্তব কথা। যারা ইসলামের আসল রূপটি দেখতে ও জানতে চায়, তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের একমাত্র সরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আকুল আবেদন করছি, এই অলীয়ে কামেলদের পীরপূজার রচনাগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে এবং সেই অনুবাদে যেন অনুবাদকের গন্ধ না থেকে একদম নিরপক্ষ অনুবাদ হয়।

পীরপূজার রহস্য এবং গভীরতা সবার মগজে প্রবেশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। স্থূল দৃষ্টির মাপকাঠিতে পীরপূজার কথাটি শুনলে শেরেক-বেদাতের গন্ধ পাবার সম্ভাবনা থাকে ষোল আনা। এজন্যই পীরপূজারকদের প্রত্যেককে একটি খাসা টাইটেল দেওয়া হয়েছে। সেই খাসা টাইটেলটির নাম হল 'কাফের'। অথচ এই পীরপূজাই যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র পুজা, এই কথা বুঝবার শক্তি অর্জন করা

তত সহজ কথা নয়। ল' অব রিলেটিভিটি এবং অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিজমের মত সাংঘাতিক কঠিন অঙ্কগুলোর (?) রহস্য কি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব? স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে দিতে গেলে কি পাগল বলবে না? অথচ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার চমক লাগিয়ে দিচ্ছে এই সাংঘাতিক কঠিন, যাহা সাধারণের মাথায় ঢুকানোর প্রশ্নটাকেই পাগলামি বলা হয়, সেই সব থিয়োরির ওপর ভিত্তি করে। এসব থিয়োরি হতেও যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া কঠিন না হয় তাহলে মহানবীর কথা তো বাদই দিলাম–কোনো নবীই সবার জন্য শিক্ষাগুরু হতে পারে না। হাতের আঙুলের ইঙ্গিতে চাঁদ দু'টুকরো হয়ে যাওয়া এবং পরে জোড়া লাগার জ্ঞান এখনো অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের কাছে কল্পনা বলে মনে হয়। সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য অতিক্রম করে মেরাজের কথাটি আজ বিজ্ঞানীদেরকে ভাবিয়ে তোলে। যিশুখ্রিস্টের সশরীরে প্রথম আকাশ অতিক্রম করে চার আসমানে যাওয়ার কথাটি আজকের বিজ্ঞানীদেরকে অবাক করে। মুসার লাঠির ইশারায় নীলনদের মাঝ দিয়ে পথ হয়ে যাওয়া একটি প্রচণ্ড বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ ইসলাম ধর্মটিকে সর্বসাধারণের ব্যবহারের প্রতীকরূপে গ্রহণ করার ফলে আসল এবং মূল বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরতে গেলেই একদম নুতন কিছু দেখার মত চমকে যায় এবং নানা রকম প্রতিবাদে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। গোঁড়ামি, 'সব কিছু বুঝে গেছি'-মার্কা তথাকথিত মোল্লাতন্ত্রকেই ইসলামের মূলমন্ত্র ভেবে অনেকই ধর্ম বিষয়টিকে পাশ কেটে চলেন। দেখেও না দেখার ভান করতে বাধ্য হন। কারণ, তারা মোল্লার দাঁড়িপাল্লায় মহানবী মোহাম্মদ (আ.)-কে মাপতে চান এবং মাপতে চান অন্যান্য নবীদেরকে একই রকম দৃষ্টির দর্শন দিয়ে। অথচ যে কথাগুলো মূল এবং আসল বিষয় সেগুলোর দাম সাধারণ সমাজে কোন দিন হয় নি এবং এখনো তাই আছে। তবে আগের চেয়ে মানুষ এখন গ্রহণ করার মানসিকতা অনেকখানি অর্জন করতে পেরেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সবাই কমবেশি আসল বিষয়টির মূল্য দিতে পারবে।

কেবলা ও কাবা সম্পর্কে আলোচনা

পীরপূজার রহস্য শয়তানের মত চালাকও বুঝতে পারে নি। তাই শয়তান ভুল করে বলেছিল যে, সে আল্লাহ্‌র পূজা করবে কিন্তু আদমকে সেজদা দিতে পারবে না। বাংলাদেশের বুকে পীরপূজার দর্শনটি যিনি চির উজ্জ্বল রত্নের মত আলো ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর নাম লালন ফকির। লালন-গীতির প্রচণ্ড প্রভাব যেদিন বাংলার মাটি হতে মুছে যাবে কেবল সেদিনই ইসলামের নামে চলবে আজব আইন। এ জন্যই বোধহয় আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন যে, 'যে বেহেস্ত বানিয়েছ ওটা মোল্লাদেরকে দিয়ে দাও, কিন্তু আমি তোমার রহস্যের মাঝে ডুবে যেতে চাই।'

আমরা অনেকেই খেয়াল করি না এবং যদি একটু খেয়াল করে দেখি তা হলে দেখতে পাই যে, মহানবী হেরা পর্বতের এক নির্জন গুহার মধ্যে সাধনায় ধ্যানমগ্ন হয়ে লাভ করলেন সিদ্ধি তথা কামিয়াব হলেন। অথচ মহানবীর বাড়ির অতি নিকটে মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরিফ থাকতেও কেন তিনি দূরের দুর্গম হেরা পর্বতের গুহায় সাধনা করতে গেলেন? আরও অবাক হবার কথা হলো, আল্লাহ্‌র ঘর বলে কথিত কাবা শরিফে হজরত জিবরিল (আ.) না এসে বরং সেই হেরা পর্বতের নির্জন গুহাতে দেখা দিলেন এবং সেখানেই সর্বপ্রথম কেন ওহি নাজেল করলেন? সমস্ত মুসলমানদের যে কেবলায়ে কাবা, যাকে আমরা আল্লাহ্‌র ঘর বলে জানি এবং মেনে আসছি সেই মহাপবিত্র আল্লাহ্‌র ঘর তথা কাবা শরিফ মহানবীর বাড়ির কাছে থাকা সত্ত্বেও মহানবী কেন দূরের হেরা পবর্তের গুহায় সাধনা করতে গেলেন? আর আল্লাহ্‌র দূত হজরত জিবরিল (আ.) বা কেন জেনে শুনে আল্লাহ্‌র ঘর কাবা শরিফ ফেলে রেখে হেরা পবর্তের গুহায় মহানবীকে কেবল দেখাই দিলেন না বরং মহাপবিত্র কোরানুল করিমের প্রথম বাণী, যাকে আমরা ওহি বলি, সেই প্রথম ওহি কেন নাজেল করলেন? এই কথাগুলোর রহস্য তথা মারেফত যিনি বা যারা বুঝতে পেরেছেন অথবা ধরতে পেরেছেন, তারা মারেফতের দিকে এগিয়ে যাবার কমবেশি আগ্রহ প্রকাশ করবেই। আর যারা এর রহস্য বুঝতে পারে না, তারা অনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এবং থাকে। পাঠকদেরকে অধম লেখকের কথাগুলো একটু বুঝবার জন্য অনুরোধ করা হল। অবশ্য যে বুঝেও বুঝতে চাইবে না তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ, সব কিছু বুঝেও যে বা যারা না বোঝার ভান করে সেটা তাদের তকদিরের লেখা। খাজাবাবা এই সমস্ত ঠেঁটা এবং ঘারমোগড়াদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেবার উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এই তকদিরের খেলা জোর করে খণ্ডাতে যাওয়াও বোকামি এবং এক ধরনের পাগলামি। মহানবী তাঁর হেরা পর্বতের গুহার সাধনা দ্বারা এই কথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্য যে কোনো স্থানেই হোক না কেন সাধনা করলে আল্লাহ্‌র এই বিশেষ নেয়ামত তথা মারেফত জ্ঞান অবশ্যই হাসেল করতে পারবেন। কেবল এই কথাটুকু বুঝবার জন্য মানব জাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সামনে কাবা ঘর থাকলে কী হবে–কাবা ঘর ছেড়েও যে কোনো স্থানে হোক না কেন–এমনকি দুর্গম পবর্তের নির্জন গুহাতে সাধন করলে মারেফতের জ্ঞান হাসেল করা যায়। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, সেই হেরা পবর্তের নির্জন গুহাটিকে প্রায় হাজিদের পক্ষে উঠে দেখার দৈহিক শক্তি না থাকাতে দেখা হয় না, অথচ সেই নির্জন হেরা পর্বতের গুহাটির গুরুত্ব কি কাবা শরিফ হতে কোনো অংশে কম বলতে চান? যে হেরা পর্বতের গুহায় হজরত জিবরিলের প্রথম দেখা পাওয়া এবং প্রথম কোরানুল করিমের আয়াতটি নাজিল হয়েছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি কাবা শরিফ হতে কম পবিত্র মনে করেন? যদি

তাই মনে করেন তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ ইহা আপনার তকদির। তকদির অদৃশ্যভাবে আপনার মনকে যে আদেশ করবে উহা মান্য করতে আপনি বাধ্য, অথচ ইহা যে তকদিরের খেলা উহা ধরতেই পারবেন না। তাই আমরা কি এ কথা বলতে পারি না যে, সাধনায় ধ্যানমগ্ন হতে যদি এই ইটের তৈরি জাহেরি মসজিদই একমাত্র অবলম্বন হতো তবে মহানবী কেন শ্রেষ্ঠতম জাহেরি মসজিদ কাবা ঘরকে একমাত্র উপযুক্ত স্থান মনে না করে দূরের দুর্গম হেরা পর্বতের নির্জন গুহাকে সাধনায় ধ্যানমগ্ন হবার উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিতে গেলেন? তাই বলতে হচ্ছে যে, ধ্যানমগ্ন সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে দিল তৈরি করা তথা হৃদয়কে আল্লাহ্‌র বসবাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থানরূপে তৈরি করা। কারণ, আল্লাহ্‌পাক নিজেই নিজের মহিমায় দিলের ওপর বিরাজ করেন। আত্মার বিজ্ঞানী পীর বাবা সহলকে তাঁর পীর বাবা বলেছিলেন যে, 'যদি কেহ কাবা তোয়াফ করতে ইচ্ছা করে তাহলে উচিত কাবা তোয়াফ করা, কিন্তু যদি কেহ নিজের আমিত্ব, অহং, খুদি, হাস্তি, ইগোকে দূর করে আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করতে চায় তাহলে কাবা ঘরের উচিত সেই রকম মানুষকে তোয়াফ করা'। দিলের মসজিদ ছাড়া সকল ইটের তৈরি মসজিদগুলোকেই বলা হয় 'বায়তুল্লাহ'। আল্লাহ্‌র ঘরকেই বলা হয় 'বায়তুল্লাহ'। আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন যে সমস্ত কোরানুল করিমের একটি স্থানেও 'বায়তুল্লাহ' কথাটি বলা হয় নি। কারণ, ঘরের নাম এবং ইহার সুনির্দিষ্ট স্থানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'হেরেম', যাকে আমরা হেরেম শরিফ বলে জেনে আসছি। 'আল্লাহর ঘর' বলে যা মনে করি আসলে উহাকে আল্লাহ্‌র বসতির ঘর বলে মনে করি-ও না এবং বলি-ও না। কারণ আল্লাহ্ কখনোই স্থান, কাল এবং সীমার মধ্যে বাস করেন না। কাজেই 'আল্লাহ্‌র ঘর' বলতে আমরা বুঝি যে উহা আল্লাহ্‌র অনুমোদিত ঘর। মহানবী কিন্তু সর্বপ্রথম কাবা ঘরকে কেবলারূপে গ্রহণ করেন নি। এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা না-ও থাকতে পারে। সর্বপ্রথম মহানবী 'মসজিদুল আকসা'-কেই আমাদের কেবলারূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই মসজিদুল আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত। আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনের জন্য কেবলার যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি মারেফতের ইবাদতের জন্যও কেবলার প্রয়োজন হয়। মারেফতের ইবাদতের জন্য যে কেবলার প্রয়োজন হয় সেই কেবলারই নাম হল আপন পীর ও মুরশিদ কেবলা। সুতরাং মারেফতপন্থীদের কাবা হল পীর ও মুরশিদ। এখন প্রশ্ন হল, কেবলা বলতে কী বুঝায়? কেবলা হল লক্ষ্য নির্ধারণ করা। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উপলক্ষ অথবা মাধ্যমের প্রয়োজন। মদিনাতে হিজরত করার পরও মসজিদুল আকসাই অনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের জন্য কেবলারূপে চালু ছিল। মসজিদুল আকসাকে এক বছর সাড়ে চার মাস পর্যন্ত মদিনাতে হিজরত করার পরও কেবলারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মসজিদুল হারামকে কেবলারূপে গ্রহণ করা হয়। এজন্যই মহানবীকে দুই কেবলার ইমাম বলা হয় এবং মহানবীর আর এক নাম হল *ইমামুল কেবলা তাইনে।* কাজেই মহানবীর উম্মত হিসাবে মসজিদুল আকসা এবং মসজিদুল হারাম এই উভয়ই আমাদের কেবলা। হাকিকতে তথা চরম সত্যের প্রশ্নে কিন্তু কেবলা মূলত এক। আল্লাহ্‌র নুর বা জ্যোতির বিকাশ এবং প্রকাশ যেখানে হয় অর্থাৎ নুরে মোহাম্মদি অথবা নুরে ইসা অথবা নুরে ইব্রাহিম অথবা যে নামেই বলা হোক না কেন, সেই নুর বা জ্যোতির প্রকাশ এবং বিকাশ যেখানে অথবা যার ওপর হয়ে থাকে উহাই হল আসল কেবলা তথা প্রকৃত কেবলা।

এই জন্যই কোরানুল করিমের সুরা বাকারার একশত সাতাত্তর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, *আন তুয়াল্লু ওয়াজুহাকুম মাশ্‌রিকি ওয়াল মাগ্‌রেবে ওয়ালা কিন্নাল্ বেররা মান্ আমানা বেল্লাহে।* অর্থাৎ 'পূর্ব অথবা পশ্চিমের কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য বা কল্যাণ হল যিনি আল্লাহ্‌তে ইমান এনেছে।' অবশ্য ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করার জন্য সমবেতভাবে সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কেবলার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক এবং মহানবীর উম্মতদের জন্য সেই সুনির্দিষ্ট কেবলাটির নাম হল 'মসজিদুল হারাম' যাকে আমরা কাবা শরিফ বলি।

কোরানুল করিমের সুরা বাকারার একশত বিয়াল্লিশ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, *সাইয়াকুলুস্ সুফাহাউ মিনান্ নাসে মা ওয়াল্ লা হুম্ আন্ কেবলাতেহিমুল্লাতি কানু আলাইহা কুলিল্লাহিল মাশ্‌রিক ওয়াল মাগরিব। ইয়াহ্‌দি মাইয়া শাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকিম।*

'জনতার মাঝে যারা বোকা তথা অজ্ঞ তথা নির্বোধ তারা বলবে যে, তাদের আগের কেবলা যাহা তারা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিল? বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন সেরাতুল মোস্তাকিমের দিকে হেদায়েত করেন।'

কেবলার ওপর যাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব আছে তারাই কেবল এ রকম বোকা কথা বলে বোকামির পরিচয় দিয়ে যায়। কী রকম বোকামির কথা? জনতার মাঝে যারা বোকা বলে পরিচিত কেবল তারাই বলতে চায় যে, এতকাল যাবৎ আমরা যে কেবলার অনুসরণ করে আসছিলাম সেই কেবলার পরিবর্তন করার কী এমন প্রয়োজন হল? এই প্রশ্নটির উত্তর আল্লাহ্ এমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন যে, ভাবতেও অবাক লাগে। আল্লাহ্ বলেছেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিম দুটোই তাঁর জন্য, অর্থাৎ সবগুলো দিকই হল আল্লাহ্‌র জন্য অর্থাৎ সহজ কথায় সব দিকেই তিনি আছেন, সুতরাং এতে বিচলিত হবার কী থাকতে পারে? মানুষের জন্য এ রকম দিক কোনো কাম্য বিষয় হতে পারে না বলেই 'পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌র জন্য' বলতে হল, অর্থাৎ সবগুলো দিকই আল্লাহ্‌র জন্য এই কথাটিই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। আর একটি বিষয় ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পাই, আল্লাহ্ তার পরের আয়াতেই হেদায়েতের কথা বলেছেন। এই হেদায়েত কথার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিমের বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা তৈরি করে কোন পুণ্য বা কল্যাণ লাভ করা যায় না। সত্যিকার লাভ হয় হেদায়েতে এবং এই হেদায়েতই হল আল্লাহ্‌র হাতে। সুতরাং হেদায়েতই হল একমাত্র কাম্য বিষয়। আল্লাহ্ যাকে খুশি তাকেই হেদায়েতের পথ দেখান, যে পথে নফস বিরাট ধৈর্যধারণ করার মত অটল ও অচঞ্চল অবস্থায় মানসিকভাবে তৈরি হয়ে থাকতে

পারে। ধ্যানমগ্ন সাধনায় আপন অস্তিত্বের ভেতরে আমিত্বের ছায়া দূর করে আপনার প্রকৃত পরিচয় লাভ করাই হল প্রকৃত কাম্য বিষয়। কিন্তু ধ্যানমগ্ন সাধনায় সাধক নিজে চেষ্টা করেও আপনার প্রকৃত পরিচয় পেতে পারেন না, যদি না আল্লাহ্‌র রহিমরূপী রহমতের সাহায্য পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া সাধকের পক্ষে রহস্যলোকে প্রবেশ অসম্ভব। তাই সাধক কেবল 'মসজিদুল হারাম'-এর একটি পরিবেশ অথবা সে রকম অবস্থা বা হাল তৈরি করে নিতে পারে মাত্র এবং সাধকের কর্তব্যও হল এই পর্যন্ত। তারপর মুক্তির প্রশ্ন তথা হেদায়েত বা পরিচালনার প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ্‌র ওপর। এই বিষয়টির বেলায় যুক্তি, তর্ক এবং আইনের ধারাগুলোর কোন মূল্যই দেওয়া হয় নি। কারণ 'আল্লাহ্ যাকে খুশি তাকেই সরল পথ দেখিয়ে থাকেন' কথাটি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কোরানুল করিমে। সুতরাং ইশ্‌ক তথা প্রেমকেই কি হেদায়েতের পাথেয় বলতে পারি? না তাও পারি না? এর সঠিক উত্তর অধম লেখকের জানা নেই।

কোরানুল করিমের সুরা ইউনুসের সাতাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, *ওয়া আও হাইনা ইলা মুসা ওয়া আখিহি আন্ তাবাউয়া লিকাউমি কুমা বেমেস্‌রা বুইউতাউ ওয়াজ আলু বুইউতাকুম্ কেবলাতাও ওয়াকিমুসসালাতা ওয়াবাশশিরিল মুমিনিনা* অর্থাৎ 'এবং আমরা মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি ওহি দিলাম, মিশরে তোমাদের কওমের জন্য ঘর তৈরি কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা কর এবং কায়েম কর সালাত এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও।'

যদিও মুলতঃ কেবলা এক এবং একেরই দর্শন প্রতিভাত হয়ে আসছে তবু কোরানের এই আয়াতে কেবলাকে একরূপে পাই না। এখানে বহু কেবলার কথাটি পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, ঘরগুলোকে কেবলা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং হজরত মুসার (আ.) অনেক উম্মতের জন্য অনেক ঘর তৈরি করতে হয়েছে। এখানে বিশেষ করে একটি বিষয় ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, একটি ঘরকে কেবলা করতে আদেশ দেওয়া হয় নি, আদেশ দেওয়া হয়েছে যতগুলো ঘর তৈরি করা হয়েছে সবগুলোকে কেবলা করতে। আমরা সহজ সরল অর্থ করলে এই কথাটি পরিষ্কার বুঝতে পারি। সুতরাং মূলত কেবলা কখনো এক, আবার কখনো দুই, আবার কখনো অগণিত। দুই কেবলার কথা আমরা জানি এবং জেনে আসছি যে, জেরুজালেমের মসজিদুল আকসাও একটি কেবলা, কারণ মহানবী এক বছর চার মাস পনের দিন মসজিদুল আকসাকেই কেবলারূপে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পরে আল্লাহ্‌র আদেশে কাবাঘরকে কেবলারূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোরানের এই আয়াতে এই দুইটি বিখ্যাত কেবলার কথা না বলে প্রত্যেকের ঘরকে কেবলা করার আদেশ দিলেন। এই আদেশের রহস্য অনুধাবন যারা করতে পেরেছেন তারা কেবলার আসল পরিচয়টিও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। কোরানের এই আয়াতের অনেক রকম গোঁজামিল দেওয়া অর্থ করা যেতে পারে, তবে সেই গোঁজামিলের অর্থ যদি নিজের প্রবৃত্তির খায়েস মেটানোর আশায় অথবা মনের ভেতর সাজানো চিন্তাগুলোর অংক মিলানোর জন্য করা হয়, তবে সেই অর্থ করা জেনে শুনে ভণ্ডামি করারই নামান্তর। আর যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে ভুল হয় তবে মার্জনীয়; তবে সেই ভুলকে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে বাদ দেবো এবং কোনো প্রকার কটাক্ষ করা অথবা অশালীন মন্তব্য করা মোটেই শোভনীয় হবে না। তবে এখানেও একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায় যে, কার ভুলটি আন্তরিক এবং কার ভুলটি ইচ্ছাকৃত? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অধম লেখকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, অধম লেখক এ বিষয়ে অন্ধজনের মত। সুতরাং অন্ধ যেমন সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না, অধম লেখকের বেলায়ও সেই কথাটি সুন্দর মানায়। সুতরাং অধম লেখকের বইটির কোনো কোনো স্থানে যে গালাগালি দেওয়া হয়েছে সেগুলো যদি ভুল প্রমাণিত হয় তবে এটুকু বলতে চাই যে, উহা ছিল আন্তরিক। কোরানের ভাবধারা এত বিশাল আর ব্যাপক যে কিছু একটা বলতে গেলে অথবা লেখতে গেলেই প্রচণ্ড ভয় লাগে। কারণ, পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনাটিকে উপেক্ষা করা যায় না। তবু লেখতে হয়, তবু যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা বোঝাতে চেষ্টা চালাই। কিন্তু তাই বলে আমার বুঝই একমাত্র বুঝ, ইহা একমাত্র ময়লা-খাওয়া পাগল ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

সালাতের আলোচনা

আমার মনে হয়, হজরত মুসার (আ.) সময়ে সকলের সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার কোনো প্রথা প্রচলন ছিল না। তার কারণ হিসেবে এই কথাই বলতে চাই যে, হাজার হাজার ঘরগুলোর প্রতিটিকেই কেবলা করার আদেশ যেখানে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কী করে সবাই একত্রে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করতে পারে? হয়তো পারে, আবার নাও পারে। হয়তো পারে বলার অর্থ হল, যখন সবাই একত্রে আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করতে সমবেত হন তখন বহু ঘরের বহু কেবলাগুলো এক কেবলাতে পরিণত হয়। কারণ, কেবলা বহু হলেও আসলে এক এবং এক হলেও আসলে বহু। এই এক আর বহুর খেলার রহস্য খুবই চমৎকার। অনেকটা মোমের আলোর মতো ধরে নেওয়া যায়। অনেক মোমবাতিতে অনেক আলো, কিন্তু আসলে এক আলো। অনেক কলসে অনেক জল, আসলে একই জল। সে রকম অনেক ঘরে অনেক কেবলা, আসলে একই কেবলা। আবার নাও হতে পারে বলছি যে। হয়তো হজরত মুসার (আ.) সময়ে সবাই মিলে একত্রে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার নিয়ম ছিল না। কারণ, মহানবীর উম্মতের যেমন জমাতবন্দি হয়ে আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার নিয়ম চালু হয়েছে, উহা এমনকি মহানবীর মক্কাতে অবস্থান কালেই চালু ছিল না। আর হজরত মুসার

(আ.) কথা তো প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা। সুতরাং মক্কাতে অবস্থান কালেই জমাতবন্দি হয়ে আনুষ্ঠানিক সালাত পালনের প্রচলন ছিল না। হিজরতের পর মদিনাতে এই আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার প্রথা এই সেদিন প্রচলন করেন আমাদের মহানবী। সুতরাং সালাত পালন করার নিয়ম-কানুন, আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এক নবী এক এক রকম নিয়ম-কানুন প্রচলন করতে পারেন এবং এই সব নিয়ম-কানুন যুগের চাহিদা অনুয়ায়ী পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মূলনীতি সালাত কায়েমের প্রশ্নটি অবশ্য-অবশ্যই অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এক এবং অখণ্ড। 'আল্লাহ্‌র আইন কখনোই বদল হয় না', কোরানের এই কথাতে মূলনীতির কথাই বলা হয়েছে, ব্যবহারিক পদ্ধতির কথা বলা হয় নি। কারণ, ব্যবহারিক পদ্ধতির পরিবর্তন একটি মানুষের জীবনে অনেক রকম দেখে যেতে পারে। 'কায়েম কর সালাত' বাক্যটি হল মূলনীতি। মূলনীতি বলেই এই বাক্যটির ব্যবহার প্রথম মানব হজরত আদম (আ.) হতে হজরত মোহাম্মদ (আ.) পর্যন্ত হুবহু একই রকম ভাষায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমস্ত নবীদেরকেই 'কায়েম কর সালাত' উপদেশটি তাদের নিজ নিজ উম্মতদের জন্য দেওয়া হয়েছে। 'কায়েম কর সালাত' কথাটির আসল অর্থ কী হতে পারে? কায়েম বলতে কী বুঝায়? চিরস্থায়ী করে রাখাকেই বলা হয় কায়েম করা। কী সেই বিষয়টি যাকে চিরস্থায়ী করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে? সালাতই হল সেই আদেশ দেবার বিষয়টি। তাহলে সালাত বলতে কী বুঝায়? যোগাযোগ করা, মিলন, সংযোগ স্থাপন করাকেই বলা হয় সালাত। সেই যোগাযোগ করাটি কার সঙ্গে করতে হবে? দুনিয়ার সঙ্গে, না আল্লাহ্‌র সঙ্গে? দুনিয়াকেই যারা একমাত্র বিষয় বলে মনে করে তাদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে শয়তান বলা হয়েছে, একবার নয় বহুবার এবং বহু রকম ভাষায় স্টাইলে। তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করার আদেশ অথবা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই যোগাযোগটি কতক্ষণের জন্য করতে হবে? সেই প্রশ্নটিরও উত্তর দেওয়া হয়েছে সহজ কথায়। চিরস্থায়ী করতে হবে সেই যোগাযোগ, তথা কায়েম করতে হবে সেই সালাত। আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে যে, 'এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও।' কিসের সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে? এবং কাকে সেই সুসংবাদ দেবার কথা বলা হয়েছে? সেই সুসংবাদটি হল, যখন কারো সালাত কায়েম হয়ে যায়, তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার যোগাযোগটি চিরস্থায়ী হয়ে যায়, তাকেই সেই সুসংবাদটি দাও। সেই সুসংবাদ পাওয়া ব্যক্তিটি কি মুসলমান, না আমানু, তথা সাধনায় রত থাকা ব্যক্তিটি, না মুমিন? সেই সুসংবাদ পাওয়া ব্যাক্তিটিকে মুসলমানও বলা হয় নি, আমানুও বলা হয় নি। বলা হয়েছে 'এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও।' কিসের সেই সুসংবাদ? সেই সুসংবাদটি হল, মুমিনদের হৃদয়গুলো তখন আরশে পরিণত হয়, তথা মুমিনের হৃদয়টি তখন আর কিছুই নয় কেবলই আল্লাহ্‌র সিংহাসন তথা মুমিনের হৃদয়েই আল্লাহ্ বাস করেন। *মান্না গুনজাম দার জামিনো আসমা লেকে গুনজাম দার কালবে মুমিনা।* মুমিনের হৃদয়েতেই যদি আল্লাহ্‌র থাকার স্থান বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি মুমিনের কলবই হল মসজিদুল হারাম। সুতরাং এই মসজিদুল হারাম মক্কাতে নেই, তথা ইহার অবস্থান মক্কাতে নয়, মুমিনের হৃদয়ে অবস্থিত। আর যে কাবাঘর উহা বহাল তবিয়তে মক্কাতেই অবস্থিত। অবশ্য সেই কাবাঘর বলতেও জাহেরি কাবাঘরকে বুঝানো হয়েছে। বাতেনি কাবাঘর নয়। সুতরাং মুমিনের হৃদয়ই যদি আল্লাহ্‌র অবস্থানের কথা ঘোষণা করা হয়ে থাকে তবে যে ঘরে আল্লাহ্ স্বয়ং অবস্থান করছেন সেই ঘরই হল আমানুদের জন্য প্রকৃত কেবলা তথা একমাত্র কেবলা। কারণ, আমানুরাই সাধনায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং আপন পীরকে যারা লাভ করতে পেরেছেন, কেবলা ও কাবা তাদের ঠিক হয়ে গেছে। একজন মুমিনই হলেন একজন কামেল মুরশিদ আর এই কামেল মুরশিদই হলেন স্বয়ং 'মসজিদুল হারাম।' সুতরাং একজন কামেল মুরশিদের মাজার শরিফই হল সবার জন্য তীর্থস্থান। কারণ, তিনি মৃত নন। তিনি আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য কতল হয়ে গেছেন। কতল হওয়া আবার দুই প্রকার : একটি ধর্মযুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে কতল হওয়া, আর একটি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ, যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ তথা জেহাদে আকবর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি কখনোই মৃত নন। না–না, তিনি কখনোই মৃত নন, তিনি চিরজীবন্ত বলে বারবার প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে এই কথা কোরানুল করিমের সুরা বাকারার একশত চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আত্মার বিজ্ঞানী পীর বাবা হজরত আওল হোসেন খেরকানি বলেছেন যে, 'মুমিনের জন্য সকল স্থানই হল মসজিদ, সকল দিনই হল শুক্রবার এবং সকল মাসই হল রমজান মাস। তার কারণ হল, মুমিন যেখানে থাকেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকেন।'

আত্মার বিজ্ঞানী পীর বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, 'অনেক দিন কঠোর সাধনা করেও মনটিকে আল্লাহ্‌র মসজিদে রাখতে পারি নি। কারণ, মন আল্লাহ্‌র মসজিদে বাস করতে চাইতো না, কান্নাকাটি শুরু করে দিত। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হয়ে মনটিকে আল্লাহ্‌র মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল, তখন মনটি আনন্দে হাসতে লাগলো।'

পীর বাবা হজরত বায়েজিদের এই কথাটির অর্থ যদি ইট অথবা মাটির তৈরি মসজিদের কথা বলা হয়েছে বলে কেউ ধরে নিতে চায়, তাহলে একজন সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও হাসবে।

কোরানের সুরা কোরাইশে আল্লাহ্ বলছেন যে, *ফাল ইয়াবুদু রাব্বা হাজাল বাইত* অর্থাৎ 'অতএব তোমার এই ঘরের রবের গোলামি কর।' যেহেতু এই কাবাঘরটিকে মানুষের মনটির প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই হেতু ঘরটির সহিত 'রব' শব্দটিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল, ঘরটির সঙ্গে রব শব্দটি ব্যবহারের কোন দামই থাকতো না যদি কাবা গৃহটিকে মানব মনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা না হত। তাহলে আল্লাহ্‌কে কোরানে এই বলে ঘোষণা করতে হত যে, 'মালেকে হাজাল বাইত।' কেন এ রকম বলতে হত? কারণ প্রাণহীন কাবাঘরের রব হতেই পারে না। বরং সেক্ষেত্রে মালেক, অধিকারী অথবা পরিচালক বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে কোরানের ঘোষণাটি হল, 'রাব্বা হাজাল বাইত' অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন এই ঘরের রব, কিন্তু ইহা রবের ঘর নহে। সত্যিকার অর্থে এই কেবলা বাইরের কোনো বিষয় নয়। সামাজিকতার প্রশ্নে বাইরে যে কেবলা প্রতিষ্ঠার দরকার হয়ে থাকে, উহা কেবল অনুষ্ঠান-ধর্ম পালনের

জন্য প্রয়োজন। মনকে তাগুতশূন্য করতে পারলে, তথা মনের মাঝে লুকানো অগণিত মূর্তিগুলোকে ভেঙে ছারখার দিতে পারলেই রব সেখানে আসন গ্রহণ করবেন এবং আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই উহা আল্লাহ্‌র আরশরূপে পরিগণিত হয়। কারণ, রব কখনো তাঁর খেয়ালখুশি মত অধিষ্ঠিত হন না এবং হবার বিধান তিনিই রাখেন নি। কারণ, তাগুত তথা অগণিত মূর্তিগুলো, যাহা মনোরাজ্যে সব সময় বহাল তবিয়তে বাস করছে, উহা সরাবার মহান দায়িত্ব সাধকের নিজের, যদিও আবার রবের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভবপর নয়। কথাগুলোর ভাবধারা যেন আত্মবিরোধের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু তা মোটেই নয়। কারণ, আমাদের মন বহুর পূজা করছে বলে নিখুঁত দেখতে পাই না। এই যে নিখুঁত দেখতে পাই না, তার কথাও কোরানের সুরা মুলকের তিন নম্বর আয়াতটিতে সুন্দর করে বলা হয়েছে। কেবলার দিকে তাকিয়ে থাকার নাম হল বন্দেগি। কেবলার দিকে মনোযোগ দেওয়ার নাম বন্দেগি। কেবলার প্রতি মহব্বত রাখাও বন্দেগি। কেবলার প্রতি যে কোনো রকম ভক্তি আর ভালবাসার আকর্ষণ সবই হল বন্দেগি। কেবলার দিকেই আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া যায় এবং কেবলার মধ্যেই আল্লাহ্‌র নূরের বিকাশ হয়ে থাকে । কেবলমাত্র এ জন্যই কেবলার বাইরের দিকটাকেও তাজিম করার আইন শরিয়তে রাখা হয়েছে। খাজা গরিবে নেওয়াজ মঈনুদ্দিন হাসান চিশতী আজমেরি তাঁর লিখিত কয়েকটি চিঠির মধ্যে একটি চিঠিতে খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, 'জানিয়া রাখ, বাবা কুতুব উদ্দিন, একজন কামেল পীরই হল আসল কাবা। সুতরাং আসল হজও হল এই কাবাকে কেন্দ্র করে, তোয়াফ করাও এখানেই, বরকত করাও এখানেই এবং খাস্‌সুল খাস রহমত লাভ করাও এখানেই।' তাই বিশ্ববিখ্যাত হজরত আমির খসরু তাঁর দিওয়ানে একটি খুবই সাংঘাতিক কথা বলেছেন, যে কথার সঙ্গে খাজা বাবার উপদেশটির একদম হুবহু মিল পাওয়া যায়। হজরত বাবা আমির খসরু তাঁর দিওয়ানে যে মারাত্মক কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন উহা দিল্লিতে গেলেই কাওয়ালদের কাওয়ালিতে শুনতে পাবেন এবং যদি ফারসি ভাষা কিছুটা জানা থাকে তবেই চমকে যাবেন। বাবা আমির খসরু বলেছেন, 'আমি প্রেমের কাফের, কিন্তু ইসলামের বান্দা নই। খসরু তো কেবলই পীরপূজা করে। পীরপূজাই আমার ইবাদত। পীরপূজাই আমার জীবন এবং পীরপূজাই আমার হৃদয়ের একমাত্র চাহিদা। কারণ, আমি আর কারো পূজা করি না এবং করার ইচ্ছাও নেই। কারণ, আমার পীর নিজাম উদ্দিনই হলেন আমার জ্যান্ত কাবা।'

অধম লেখক বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে একান্ত অনুরোধ করছি যে, *দিওয়ানে আমির খসরু, দিওয়ানে শামসেত্তব্রীজ* বাংলা ভাষায় হুবহু অনুবাদ করে দিন। তাহলে ইসলামের ওপর যারা ভ্রান্ত মতবাদ বিজ্ঞ দার্শনিক সেজে হিয়া হুয়া প্রচার করেন তাদের মৃত্যুঘণ্টা আপসে বেজে উঠবে। কিন্তু এ রকম মহান কাজটি কি ইসলামিক ফাউন্ডেশন করবেন?

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, একজন কামেল পীরই হলেন প্রকৃত কাবা। যদি তাই না হতো তাহলে ইসলামের এত বড় বড় বিখ্যাত মহাপুরুষেরা কখনোই পীরপূজার কথা বলতেন না। আসলে পীরপূজাই যে আসল কাবার পূজা করা এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে বিষয়টির আসল রহস্য সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরা খুবই কঠিন হত। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ল অফ রিলেটিভিটি আর কোয়ান্টাম মেকানিজমের রহস্য মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন দিয়ে গেছেন। অথচ পৃথিবীতে পাঁচশত কোটি লোকের মাথার মগজ হতে এই থিয়োরি বের না হয়ে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজনের মাথা হতে বের হল।

শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের আলোচনা

এইবার আমরা এমন একজন অলীর লেখা কেবলা, কাবা এবং হজের আসল রহস্যের বর্ণনার অনুবাদ করবো যাঁর কথা শুনলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই মাথা নত করে মেনে নেবেন এবং মানতে অবশ্যই বাধ্য হতে হবে। কারণ এমন অলীর কথা তারাই মানতে চাইবে না, যারা মানুষের আকৃতিতে পশুরূপে মানবসমাজে বাস করছে। অবশ্য মানুষের সুরতে যারা পশু তাদেরও প্রয়োজন আছে এবং তারা আছে বলেই তো মারেফতের গোপন কথা লেখার এত আয়োজন । সুতরাং এই লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে ভুলেও মানুষের সুরতে পশু প্রমাণ করতে যাবেন না। যদি এমন কাজ করেন ফেলেন তা হলেও আপনাকে সম্মান দেখানো হবে। সেই সম্মানটির নাম হবে 'ফার্স্ট ক্লাস জোকার।' খেলার মাঠে দু'একজন ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক মার্কা জোকার না থাকলে মাঠের মধ্যে হাসাহাসিটা তেমন জমে উঠে না। সেই বিখ্যাত অলীর লেখায় অনুবাদ করবো যাঁর নাম খাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্‌লা সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রসুল খাজা গরিবে নেওয়াজ ইয়া সৈয়দ মাওলানা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী সান্‌জারি আল হোসাইনি আল হাসানি। যার মাজার শরিফের এতই ওজন যে, একটিও নামে মুসলমান যদি না যায় তাতে কিছুই আসবে যাবে না। কারণ, কোটি কোটি হিন্দুরা কী রকম ভক্তি সহকারে মাজারে আসে তা যারা নিজের চোখে একবার দেখেছে তারাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নেবে। চোখে না দেখলে খাজার মাজারের ওজন দূর হতে করা মোটেই সম্ভব নয়। এই সেই খাজা বাবা, যাঁর উসিলাতে আজ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বুকে প্রায় ত্রিশ কোটি মুসলমানের অস্তিত্ব অবলোকন করি। এই সেই খাজা, যাঁর কাছে বড় বড় হিন্দু সাধকেরা মাথা নত করে নিজের ধর্ম ফেলে দিয়ে মুসলমান হয়েছেন। সাধক রাম সাধু, রাজীব সাধু, ত্রৈলোক্য সাধু এবং জয়পাল সাধুর মত হাজার হাজার সাধকেরা নিজেদের ধর্ম ফেলে দিয়ে

মুসলমান হয়েছেন। কথায় বলে মানুষ তার দেশত্যাগ করতে পারে হাসিমুখে, কিন্তু নিজের ধর্ম পারে না ত্যাগ করতে। তার কিছুটা নমুনা দেখার ভাগ্য কি আপনার আমার হয় নি? কত বড় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা খাজা বাবার কাছে গিয়ে মুসলমান হয়েছেন। আর আমার মত আরবি ভাষা জানা মোল্লা অথবা পণ্ডিত যদি হিন্দুপট্টিতে সাতদিন সাতরাত ওয়াজ নসিহত করি তাহলেও একটি হিন্দুর পক্ষে মুসলমান হবার প্রশ্নটি না হয় বাদই দিলাম, এমনকি সেই ওয়াজ নসিহত কেউ শুনবে কি? আপনার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন তো? 'প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একটি করে শয়তান দেওয়া হয়েছে', সুতরাং সেই শয়তানটি যদি আপনার বিবেকের সিংহাসনে বহাল তরিয়তে বসে থাকে তবে গোঁজামিলের একখানা উত্তর হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কারণ হিসাবে বলতে চাই যে, যদিও অধম লেখক রাজনীতি করা তো দুরে থাক এর ধারে কাছেও নেই তবু বলতে হচ্ছে যে, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খাজা বাবার মাজারে মাত্র দশ হাজার মার্কিন ডলার দান করেছিলেন বলে কিছুসংখ্যক মানুষের সুরতে পশুরা এর প্রতিবাদ করতে সামান্য লজ্জা বোধ করেনি। এই সামান্য টাকার প্রশ্নে নামে-মুসলমান হয়ে যদি প্রতিবাদ করতে পারে তাহলে হিন্দুস্থানের বড় বড় হিন্দু ধনীরা যে লাখ লাখ টাকা প্রতিবছর খরচ করছে সেটা একবার দেখে আসুন না। অবশ্য আপনারা দেখতে যাবেন না। কারণ, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে যে একজন শয়তান দিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহানবীর সেই বাণীর সার্থকতা তাহলে থাকে কোথায়? *মকতুবাতে খাজা* নামক বইটিতে খাজা বাবা কেবলা কাবা এবং হজের আসল রূপটি কী তা চিঠির ভাষায় বর্ণনা করছেন। কারণ তিনি তাঁর প্রধান মুরিদ বাবা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে যে কয়টি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিগুলোর একত্র সমাবেশের নামই হল *মকতুবাতে খাজা।* আগেই বলে রাখি যে, তাঁর চিঠির মান এতই উন্নত যে অধম লেখকের মাথা গুলিয়ে যায়। কারণ, তিনি যে হাদিসের কথা বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসের দলিল কোথাও পাওয়া যাবে না এবং যেতে পারে না। কারণ, তিনি নিজেই সেই কথা বলতে গিয়ে তাঁর প্রধান মুরিদ বাবা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে বলেছেন যে, তিনি চরম রহস্যময় রাজ্যের পর্দা উঠিয়ে দেখতে পেলেন যে, মহানবী হজরত উমর ফারুককে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, 'হে উমর, অবশ্যই ইহা জেনে রাখ যে, মানুষের হৃদয়ই হল খানায়ে কাবা। মানুষের হৃদয় যেমন খানায়ে কাবা তেমনি মোমিনের হৃদয় হল আল্লাহ্‌র আর্শ তথা বসবাসের স্থান, যাকে সিংহাসন বলা হয়। সুতরাং এই হৃদয় তথা দিল-কাবার হজ করা প্রয়োজন।' হজরত উমর (রা.) জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, দিল-কাবার হজ কেমন করে করতে হবে?' মহানবী বললেন, 'মানুষের অস্তিত্ব চারটি দরজার মত : আব, আতশ, খাক ও বাদ অর্থাৎ পানি, আগুন, মাটি এবং বাতাস। এই চারটি দরজা হতে সমস্ত সন্দেহ, অহঙ্কার এবং বহু ইলার পর্দাকে সরিয়ে দিতে পারলে দিলের আয়নায় তথা হৃদয়ের মুকুরে আল্লাহ্‌র খাস জালুয়া তথা নূর প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। খানায়ে কাবার আসল হজ পালন করা ইহাই। এই আসল হজটি তখনই হয়, যখন মানুষ তার নিজের আমিত্ব তথা স্বকীয়তা এমনভাবে মিটিয়ে ফেলবে যে আমিত্ব তথা স্বকীয়তার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি তার বাহির এবং ভেতর এক রকম পবিত্র হবে এবং দিল তথা হৃদয় আল্লাহ্‌র নূরে নূরময় হয়ে যাবে।'

হজরত উমর (রা.) মহানবীকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজের আমিত্ব তথা নিজের স্বকীয়তাকে কেমন করে নিস্ত তথা নাই করে দিতে হবে?' মহানবী বললেন, 'মাহ্‌বুবের তথা আল্লাহ্‌র আশেক তথা প্রেমিক হতে পারলে নিজের আমিত্বকে তথা নিজের স্বকীয়তাকে ফানা করা তথা বিলীন করা সম্ভবপর হয়। যিনি মাহ্‌বুবের প্রেমিক হয়েছেন, তিনি ফানাফিল্লা তথা নির্বান লাভ করতে পেরেছেন এবং তিনি তখন মাহবুবের খাস জাতের মোজহার তথা প্রকাশকরূপে পরিগণিত হয়েছেন।'

আবার হজরত উমর (রা.) মহানবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিলকে তথা হৃদয়কে খানায়ে খোদা তথা আল্লাহ্‌র ঘর এবং আরশে এলাহি কেন বলা হয়েছে? মহানবী বললেন, কোরানে আল্লাহ্‌ বলেছেন, "তিনি তোমাদের ভেতরই আছেন, কিন্তু তোমরা তাকে দেখছো না।" হে উমর, থাকবার জায়গাটিকেই ঘর বলা হয় এবং যেহেতু আল্লাহ্‌ দিলে তথা হৃদয়ে অবস্থান করেন সেই হেতু দিলকে খোদা তথা আল্লাহ্‌র ঘর বা আরশাল্লাহ্‌ আখ্যা দেওয়া হয়।' হজরত উমর (রা.) পুনরায় মহানবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মাটির তৈরি দেহের ভেতর কে কথা বলে? কে কান দিয়ে শুনছে? কে চোখ দিয়ে দেখছে? এবং কে সে যে সব কিছু অবগত হয়? আর সে-ই বা কে বা তার রূপই বা কেমন?' মহানবী বললেন, 'এই মাটির তৈরি দেহে আর কেহ নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌ই কথা বলেন, আল্লাহ্‌ই শ্রবণ করেন, আল্লাহ্‌ই দেখেন এবং সকল বিষয়ের উপর তিনিই জ্ঞানদানকারী তথা জ্ঞানদাতা।' হজরত উমর আবার প্রশ্ন করলেন, 'এ রকম খাস জাতের মোজহার কি স্বয়ং মহানবী নন?' মহানবী বললেন, 'আমি মিম ব্যতীত আহ্‌মদ।' মহানবীকে পুনরায় হজরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন, 'দিল কাবার হজ কে করতে পারে?' মহানবী বললেন, 'দিল কাবার হজ একমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি আল্লাহ্‌র জাতের মধ্যে ডুবে গেছেন।' অর্থাৎ যখন সাধক নিজের আমিত্বের তথা স্বকীয়তার দেয়াল সরিয়ে দিতে পারে এবং সাধক ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে আর কোনো প্রকার দেয়াল না থাকে কেবল তখনই সে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং তার দিল তথা হৃদয় আল্লাহ্‌র খাস নূরে নূরময় হয়ে যায়। সাধকের দিলে তথা হৃদয়ে আল্লাহ্‌র জাত নূরের বিকাশ ও প্রকাশ হওয়াই দিল কাবার হজ এবং ইহাই আসল হজ তথা প্রকৃত হজ। মহানবীকে হজরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন, 'যখন সব কিছুই এক পবিত্র জাতের প্রকাশ ও বিকাশ, তাহলে এই পথ বা রাস্তা দেখানো কার জন্য এবং কেন?' মহানবী বললেন, 'তিনি নিজেই পথ এবং প্রদর্শনকারীও তিনিই।'

মহানবীকে আবার হজরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন, 'তবে এই দুনিয়াতে এত নানান রকম রং ও রূপের এবং গুণ ও গরিমার প্রকাশ কেন?' মহানবী বললেন, 'পথ যিনি দেখান তাকে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ব্যবসায়ীর কাছে যিনি যে জিনিসটি কিনতে

চাইবেন ব্যবসায়ী ঠিক সেই জিনিসটিই তাকে দেবেন। গম যিনি কিনতে আসবেন তাকে ব্যবসায়ী ঠিক সেই জিনিসটিই দেবেন। এর প্রধান কারণ হল এই যে, যিনি গম কিনতে আসবেন তাকে যব এবং যিনি যব কিনতে আসবেন তাকে গম কখনোই কোনো ব্যবসায়ী দেবেন না।

'হে উমর, নবীদের তুলনা অনেকটা ডাক্তারদের মত। ডাক্তারেরা যেমন রুগী এবং রোগের পরিচয় জানবার পর ঔষধ দেবার ব্যবস্থা করেন এবং তাতেই রুগী রোগমুক্ত হয়, সে রকম নবীরা মানুষের আত্মার রোগের পরিচয় জানবার পর মারেফতি ঔষধ প্রদান করেন, যার অশেষ কৃপায় মানব আত্মার রোগগুলো হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র রহস্য হতে পারে।

'হে উমর, ধর্ম পথের যাত্রীদেরকে মোটামুটি চারটি বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়। জ্ঞান ও গুণের প্রশ্নে এই চারটি দলের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পাওয়া যায়। প্রথম দলটির নাম হল দলে ভর্তি হওয়া মুসলমান যাকে আম মুসলমান বলা হয়। এই দলে ভর্তি হওয়া নামের মুসলমানদেরকে জাহের পোরস্ত তথা প্রকাশ্য ইবাদতকারী বলা হয় এবং এরাই শরিয়তের প্রথম সিঁড়িতে অবস্থান করে। এই সিঁড়িতে অবস্থান করে যদি তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় এবং এই সিঁড়ি অতিক্রম করতে যদি চেষ্টা না করে তাহলে তারা ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হতে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয় দলটির নাম হলো আওয়ামুল খাস। এই দলটির বিশেষত্ব হল যে, এরা একদিকে যেমন সাধারণ আবার অন্যদিকে কিছুটা অসাধারণের গন্ধ পাওয়া যায়। এই দলটি রহস্যলোকের জ্ঞানের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট বটে, কিন্তু নিজেকে কেমন করে চিনতে হবে সেই জ্ঞান হতে বঞ্চিত তথা রমুজে রূহানিয়াত বিষয়টিতে অজ্ঞ। এরাই আহলে তরিকত বলে পরিচিত তথা পরিচয়ের পথে অবস্থান করে। তৃতীয় দলে যারা আছে তারা হলো খাস তথা আসল। এরা কেবল একমাত্র দ্বীনের মধ্যে বাস করে এবং এরা নিজেদের আপন পরিচয় জানতে পেরেছে। এদেরকেই বলা হয় আহ্লে হাকিকত তথা সত্যের রাজ্যে বাস করছে। চতুর্থ দলে যারা আছে তাদেরকে বলা হয় খাস্ল খাস তথা আসলেরও আসল। এরা সব সময় আল্লাহ্র রহস্যে ডুবে থাকে এবং আল্লাহ্র পবিত্র জাতের গুণাবলির বিকশিত প্রত্যক্ষ রূপ হলো এরা এবং সব সময় সব রকম অবস্থায় যা দর্শনীয় তৎসমুদয় দর্শন করে। যে কোন ধরনের কলুষতা, অহংকার এবং আমিত্বের দেয়াল এরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। দুধের ভেতর চিনি মিশালে যেমন চিনির আলাদা পরিচয় জানার আর অবকাশ থাকে না, তেমনি এরা আল্লাহ্র জাতের ভেতর ডুবে গিয়ে নিজের আমিত্বকে ফানা করে তথা নির্বাণ করে দিয়ে বাকাবিল্লাহ্তে তথা চিরস্থায়িত্বের মধ্যে অবস্থান করে। এ রকম বাকাবিল্লাহ্র লোকেরাই আহ্লে মারেফত তথা মারেফতের মধ্যে বাস করে।

'হে উমর, হেদায়েত তথা দীক্ষা দেওয়া এবং রাহ্নামায়ী তথা পথ প্রদর্শন তালেবের তথা পথসন্ধানীর যোগ্যতা বিচার করা হয়। আসরারে এলাহি তথা আল্লাহ্র গুপ্ত রহস্যের মহান নিয়ামত সাধারণ মানুষকে দান করা যায় না। সাধারণ মানুষকে এ রকম নিয়ামতে উজমা দান করলে ইহার অবমূল্যায়ন এবং অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা তাকে। কারণ, সাধারণ মানুষ এই বিরাট নিয়ামতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারবে না এবং অবশেষে রাহে গোমরাহীতে তথা ভুল পথে এগিয়ে যাবে।'

হজরত উমর (রা.) আবার মহানবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ্র জাত কী এবং আর সমস্ত বস্তুই বা কী? মহানবী বললেন, 'সমস্ত বস্তুই আল্লাহ্র মোজহাব তথা প্রকাশস্থল, যদিও প্রকাশের ধারাতে অনেক রকম কিন্তু হাকিকতে তথা আসলে সমস্ত কিছুই এক। কিন্তু মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ্ দান করেছেন। কারণ, মানুষকেই আল্লাহ্র নিজের সুরতে তথা চেহারায় তৈরি করেছেন।

'হে উমর, ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য হল মোমিনরূপে পরিগণিত হওয়া। ইহার আসল পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তোমাকে জানালাম। বর্তমান অবস্থায় তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যখন তুমি এর চেয়ে আরো বেশি অগ্রসর হবে এবং কামালিয়াতের তথা সিদ্ধির শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে তখন কেবল তোমার ভেতরই তোমার সব রকম গুণাবলি এবং গোপন রহস্যের যাবতীয় প্রকাশ ও বিকাশ তোমার ভেতরই মওজুদ দেখতে পাবে।' তারপর মহানবী এই শেষ উপদেশটি দিলেন যে, যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার রবকে চিনতে পেরেছে।

বাবা কুতুব উদ্দিন, এই সকল আদেশ-উপদেশ যা মহানবী হজরত উমর (রা.)-কে দিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত রহস্যলোকের পর্দার ভেতর ছিল তথা রাজে মখফীর পুশিদাতে ছিল। আমি রহস্যলোকের আদেশ পাবার পরই তোমাকে লিখে দিলাম। জাহেরি মোল্লা ও পণ্ডিতদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে যেও না। কারণ আল্লাহ্র বিনা হুকুমে কোনো কিছু নড়াচড়া করতে পারে না। বাদ আস্সালাম।

মহানবীর আদর্শের বাণী না বলে যদি খাজা বাবা তাঁর নিজের বাণী বলে প্রচার করতেন এবং যদি তিনিই সর্বেসর্বা এবং আর কিছু নেই বলে ঘোষণা করতেন তাহলে পাক-ভারতের ত্রিশকোটি মুসলমান খাজা বাবা ছাড়া আর কিছু কি গ্রহণ করতেন? তাহলে কি খাজা বাবার ধর্ম বলে একটি আলাদা ধর্ম পাক-ভারতে বিরাজিত থাকতো? তাহলে কি তাঁর বানানো ত্রিশকোটি মুসলমান আজ অন্য কোনো ধর্ম মানতে চাইতো? কত বড় সাংঘাতিক ওজন খাজা বাবার। ভারতেও অবাক লাগে। বিস্ময়ে হতে হয় অভিভূত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লাখো লাখো মানুষের আগমন হয় যাঁর পবিত্র রওজা মোবারকে। অবাক হতে হয় যেই কথাটা মনে করে সেই কথাটি হল, যদি একটিও মুসলমান খাজা বাবার মাজারে না যায় তাতে তাঁর রওনক ও শান একবিন্দুও কমে যাবে না। কারণ, লাখো লাখো অন্য ধর্মের মানুষেরা যেভাবে তাঁর মাজারে সমবেত হন তা একবার চোখে দেখলেই এই কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন।

বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী-লিখিত বইসমূহের আলোচনা

'কিসের নামাজ রোজা কিসের কোরান–নূরে হক বিনা তাহা সকলই বেজান। যাহার কলবে নূর হয়েছে রৌশন-কোরান জেকের জান তাহার কারণ। অতএব নূরে হকে হক দরকার–সে নূরে মানসপুরে পাইবে দিদার। নিজেকে চিনেছে যেই চিনেছে খোদায়। তুমি যথা আমি তথা কহে আর সাঁই–তোমা সঙ্গে আমি আছি তুমি দেখ নাই। নূরে হকে হক আছে হক চিন আগে–এবাদত কর যদি পার শেষভাগে। না চিনিয়া এবাদত করিবে কাহার–ভূতের বন্দেগী হবে, হবে না খোদার। নূরে হক জাগা পায় যাহার মনেতে–মন আর নামাজেতে যাবে না বনেতে। এলেম হেলেম আর পাগড়ী যুব্বায়–কেমনে পাইবে না রৈলে হিয়ায়।'

শত বছর আগে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরীর লিখিত পুথির ভাষায় *নূরে হক গঞ্জে নূর* হতে উপরের কথা কয়টি নেওয়া হয়েছে। যে দর্শনের ভাষায় নিজেকে চেনা ও জানার অপূর্ব তাগিদ দিয়ে গেছেন তা সত্যিই অনুভব করার মত বিস্ময়কর। সহজ-সরল কথার গাঁথুনি ভাষায় দিয়ে এবং তথাকথিত শরিয়তের সবজান্তার ভূমিকার পিঠে লাথি মেরে এবং কাঠমোল্লাদের ভেল্কিবাজির ডুগডুগি বাজিয়ে নোংরা দলগত সাইনবোর্ডের মাসলা-মাসায়েল প্রচারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে ইসলামের মূল বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই আজকের দিনেও এমন স্পষ্ট করে কি কেউ লিখতে পারবে যে, ইসলামের মূল বিষয় নূরে হক ছাড়া আনুষ্ঠানিক মাসলা মাসায়েলের প্রশ্ন তো অবান্তর, এমন কি নামাজ-রোজারও দাম থাকে না। এমন কি নূরে হক বাদ দিয়ে কোরানের প্রাণ বলতে কিছু থাকে না। কোরান তখন হয়ে পড়ে বেজান তথা জীবনশূন্য তথা মৃত। আবার যার হৃদয় হকের নূরে তথা আল্লাহ্‌র নূরে নূরময় হয়েছে সেটার কারণও আবার কোরানই এবং কোরান তখন জীবন্ত ও নূরময়। সুতরাং উপদেশটি সামাজিকভাবে প্রতীয়মান হলেও আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে ব্যক্তির মানদণ্ডে সমাজের স্থান ও মূল্যায়ন নির্ণয় করা হয়েছে। এই নূরে হকই দর্শন লাভ হয়। কীসের দর্শন এবং কার দর্শন লাভের কথা বলা হচ্ছে? নিজেকে চেনার দর্শন এবং এই দর্শনই হল খোদা-দর্শন এবং এই দর্শনের একমাত্র পুঁজি হল নূরে হক তথা আল্লাহ্‌র জ্যোতি। তারপর কোরানের কথাটি পুথির ভাষায় অঙ্কিত করা হয়েছে–'আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি'-কে বলা হয়েছে 'তুমি যথা আমি তথা কহে আর সাঁই'। আল্লাহ্ আমাদের অতি নিকটে সব সময় আছেন, অথচ তাকে দেখি না। তারপর বলা হয়েছে নূরে হকে যে হকটি আছে উহাকে প্রথমে চেনবার উপদেশ এবং ইবাদত-বন্দেগি করার বিষয়টিকে সর্বশেষে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি পার তাহলে ইবাদত কর এবং ইহা প্রথমে নয় বরং শেষ ভাগে। অন্ধের মত না জেনে না শুনে না বুঝে কার ইবাদত করবে? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, সেই ইবাদত খোদাকে পাবার ইবাদত হবে না, বরং উহা হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ইবাদত, তথা ভূতের বেগার খাটুনির বন্দেগি হবে। ভূত বলতে এখানে ইবলিসকে বুঝানো হয়েছে। ভূতের ইবাদত বলতে অহঙ্কারীর ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। হিব্রু ভাষায় বালাসা শব্দটির অর্থ হল অহঙ্কার আর ইবলিস বলতে বুঝায় অহঙ্কারী। সুতরাং সেই ইবাদত অহঙ্কারীর ইবাদতে পরিণত হবে যদি নূরে হককে চেনার ও জানার উদ্দেশ্যটিকে বর্জন করা হয়। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে উলঙ্গ ভাষায় গালাগালি দিয়ে গেছেন সেটাতে সত্যিই অবাক হতে হয়। জানি না এ জন্যই কাঠমোল্লার দল তাঁকে 'কাফের' ফতোয়াখানা দিয়েছিলেন কিনা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম রাখঢাক না রেখে সোজা ঘোষণা করলেন 'দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে; নাইক খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী গড়ে। লানত গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে, ধর্মধ্বজা উড়ায় দাড়ি 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে। ধর্ম কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব-পুথি।' কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সমাজকে ধমক দিয়ে লিখেছেন :

'কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে? ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুরপরী?
পরীর ভোগের শরীরই ওদের, দেখি শুনি আর হেসে মরি।
তারা যদি মরে বেহেশতে যায়, সেই বেহেশত মজার ঠাঁই,
এই সব পশু রহিবে যথা সে চিড়িয়াখানার তুলনা নাই।
আসিল বেহেশ্‌ত ইনচার্জ ছুটে, বলে পরীদের, 'করিলে কি?
ও যে বেহেশ্‌তী।' পরীদল বলে, 'ঐ জংলীটা? ছি ছি ছি।
এখনই উহারে পাঠাও আবার পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক,
তারপর যেন ফিরে আসে এই হুর-পরীদের স্বর্গলোক।'
হাসিছ বন্ধু? হাস হাস আরো, এর চেয়ে বেশী হাসি আছে,
যখন দেখিবে 'বেহেশত' বলে ওদের কোথায় আনিয়াছে।

যার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নূর স্থান লাভ করতে পেরেছে তার মন ও মানসিকতা আর বহু বিষয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করবে না বরং নামাজের সময় মনটি নামাজের মধ্যেই ডুবে থাকবে এবং বন-বাদাড়ে ছুটোছুটি করবে না। তারপর বলা হয়েছে, পাগড়ি আর পোশাকের মধ্যে কখনোই পাবে না, যদি না হৃদয়ের মধ্যে সেই নূর মওজুদ থাকে। খের্কা, জুব্বা আর পাগড়ি পরিধানেই ধর্মের বিষয়টির পরিচয় লাভ হয় না, যদি না অন্তরে আল্লাহ্‌র নূরের জ্যোতির বিকাশ লাভ করে। পুথির ভাষায় শত বছর পূর্বে এত স্পষ্ট বর্ণনা সত্যিই অবাক করে।

আবার বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর রচিত শত বছর আগের পুথি *নূরে হক গঞ্জে নূর* হতে বেশ কিছুটা অংশ এলোমেলো অবস্থায় পাঠকদের কাছে তুলে ধরবো। তুলে ধরবো মাছিমারা কেরানির মত হুবহু করে। এমন কি পুথির প্রচলিত শব্দের বানানগুলোর পরিবর্তন না করে। তবে দুই দাড়ির স্থানে একটি লম্বা ড্যাস ব্যবহারের পরিবর্তন করা হয়েছে শুধু মাত্র পাঠকদের বুঝবার সুবিধার প্রশ্নে। এই পুথির রচনা কালটি কবে তা আজও অজ্ঞাত। কারণ, ইহার প্রথম হতে পঞ্চম মুদ্রণ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারি নি। ১৯৫৪ সালের শেষ মুদ্রণের এক কপি অনেক কষ্টে উদ্ধার করি। যদি পুথিটি তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে লিখা হয়ে থাকে তাহলে ইহার রচনার কালটি হয় ১৮৪৩ কি ১৮৪২ সালের দিকে। ইহার রচনার কালটি সত্যিই ভাবিয়ে তোলার বিষয়, কারণ *বিষাদ সিন্ধু*-র লেখক মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম হয়েছিল ১৩ ই নভেম্বর ১৮৪৮ সালে। অবশ্য এই পুথি সাহিত্যের মানদণ্ডে বিবেচিত হয় নি বলে উপেক্ষা করা হয়েছে। কারণ, এই পুথিটি কেবলমাত্র ধর্মীয় আদেশ আর উপদেশের সীমায় আবদ্ধ, যদিও সাহিত্যের ললিত ঝঙ্কারের দোলা আর ভাষায় পুরোনো শৈলীর অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। অবশ্য এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এখানে একান্তই অশোভনীয়। কারণ, ইহা অনেকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত বেমানান। এই আজে বাজে কথাগুলো লিখার পর বাদ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে রাখতে হল। বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত বেশ কিছু বই আছে। আরবি, ফারসি, উর্দু এবং বাংলায় রচিত। আরবি এবং ফারসি ভাষায় রচিত দুইটি বই-এর পাণ্ডুলিপি তাঁর পুতিন শাহ নূরে বেলাল ভাইয়ার কাছে এখনো সযতনে রাখা আছে। উর্দু ভাষায় রচিত *সির্‌রে হক্ক জামে নূর, আইনাইন* এবং *লতায়েফে সাফিয়া* বইগুলোর অস্তিত্ব এখনো দুই একটি পাওয়া যায় এবং এর প্রতিটি কপি অধমের কাছে আছে। পুথির আকারে বাংলা ভাষায় রচিত কয়টি বই আজও পাওয়া যায়। যেমন *নূরে হক গঞ্জে নূর, ছফিনায়ে ছফর, কাওলুল কেরাম, সির্‌রে ছদর* এবং *মদিনা।* কিন্তু দুঃখের বিষয়, *কাওলুল কেরাম* ও *সির্‌রে ছদর* নামক দুটি পুথির সন্ধান পেলাম না। তবে চেষ্টা তদরির করলে হয়তো লাখ লাখ ভক্তের মধ্যে কারো কাছে থাকতেও পারে। *সিররে হক্ক জামে নূর*-এর প্রথম খণ্ডটি বাংলায় অনুবাদ করে ছাপানো হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটির সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

নূরে হক গঞ্জে নূর-থেকে

"নূরে হক্ক নবী হতে মোরশেদেই পায়–নূরে হক নাহি যাতে মোরশেদ কোথায়? নূরে হক দানা বীজ যথায় রুপিবে–নাপাকে ফেলিলে বীজ পাক নিকলিবে। নাপাক হইতে দেখ হয় কিনা পাক। আজরের মনি হৈতে হয় পাক নবী। কেন হৈল যদি তাতে না রহিত খুবী? মোরশেদের নূরে হক যথায় বুনিবে–সহস্র হইলে পাপ তাতে কি করিবে? যদি শিষ্য নূরে হক জাগা দিতে পারে–এক দমে শত পাপ চারি পাশে ঝরে। কি করিবে পাপ তায় কি করিবে তাপ–নূরে হক পাপ তাপ নূরে হক ছাফ। এ খেলা লীলার খেলা, খেলা মিষ্টিময়–সকল পদের মূল নূরে হক হয়। সেই সে নূরের খেলা জগৎ রৌশন-এক নূর হৈতে এক একই ঘোষণ। সকলেরই বীজ নূর ভেবে দেখ সার–কাফের মোমেন এতে নহে সুবিচার। পাক নাপাকের কোন নহে সমাগম-যথায় ফেকিবে বীজ প্রকাশে বিক্রম। মোর্শেদ নবীর পুত্র কেমনেতে হয়–ফলে কিন্তু পুত্র বটে মুখে বলা নয়। রুহানী অজুদ এক বাতেন আছয়–জাহেরা শরীরে সেই মূল পদ হয়। মোর্শেদ শরীর হৈতে মুরীদ শরীর একাযুক্ত মিষ্ট যেন পানিতে চিনির। এই যে হুজুরী বিদ্যা মিরাস নবীর-কোথায় কাগজে আছে তাহার তাছির? হাজার কাগজ যদি পড়ে যায় তল–কি হইবে গুরুজন রহিলে সকল? গুরুজন পৃথিবীতে না রহিলে আর–কি হইবে কাগজ তব রহিলে হাজার? কাগজের সাথে ভেসে যেই বিদ্যা যায়–কোথায় এহেন বিদ্যা মোর্শেদ ছিনায়। খাছ নূর ছানাওরী সেই নূরে নবী–সেই নূরে পীর নূর তাতে ফয়েজ পাবি। পরশ পাথর হেন তরিকত পীর–ছিনা তার জান যেন সাগর গভীর। হুজুরী নামেতে যেই এলেম নবীর–নূরে খোদা তারে বলে সেই নূরে পীর। হুজুরী শিখিতে হয় হাজেরি দরকার–নিজ সনে রুজু হওয়া আবশ্যক তার। শিক্ষিতের ওস্তাদ আর দীক্ষিতের পীর–ইহাই প্রকাশ ছিল আমল নবীর। ওস্তাদ শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ-মোর্শেদ কহেন বাপু চক্ষু মুদে থেক। চক্ষু বন্ধ বিদ্যা এই খুলিলে কি হবে–খোলা জন এই ভেদ কভু নাহি পাবে। পড়নিয়া মনে ভাবে পড়নেই ফল–ওরক (পৃষ্টা) উল্টানে ভাবে এতেই মঙ্গল। এক মন তনে যেই সাধন সাধিবে–নফসের থাকিতে মুক্তি কোরানে দেখিবে। কোরান দেখিলে শুধু না হবে নিস্তার-কোরানের মূল তত্ত্ব করহ বিচার। কোরানের হাকিকত আছে নিজ মনে–পীরেতে পাইবে তাহা, পাবে নহে বনে। নূরে হক যেই জন করিল সাধন–এসব অলীক পথে নাহি যাবে মন। নূরে হক বিনা হক কভু পাবি নাই–উছিলাতে নূর আছে নূরে হক পাই। পীর ধর যথা পার কহিয়াছে সাঁই–পীরের উছিলা বিনা হবে না ভালাই। শুনে কিহে দেখা ফল কখন পাইবে? শুনা কথা দুনা হয় না হয় একিন। এরূপ একিনে শেষে ঘটায় কুদিন। এমন ইমান যদি ইমান হইত–কথায় কথায় তবে কেমনে টুটিত? ইহকালে অন্ধ যেই পরকালে হবে–পরকালে খোদা দরশন কোথা পাবে? কিন্তু ভাই শেরেকের ডর রাখে যারা–শেরেকের অর্থ কিবা বুঝিয়াছে তারা। মুখেতে শরীক কৈলে শরীক না হয়–রুমের বাদশাই মোরে কেহ যদি কয়। তাহাতে বাদশাই তার হইবে কোথায়–হইল মিথ্যুক নিজে কহিল বৃথায়। তেমনি মৌখিক যারা শেরেক যে কয়–খোদার বাদশাই কেবা কেড়ে নেবে তয়। তৌহীদ ঘরেতে হয় হাকিকী ইমান–সে ঘরের আলেফ, বে খোদা একজান। হুছলী এলেম যদি পঞ্চাশ হাজার–শিখিলে একিন ঠিক হবে নাকো তার। তেমনি খোদার জাত যে নয় চিনিবে–চিনিলে কাফের সেই কেমনে হইবে? ইমান হইলে কেন হবে বেঈমান? চক্ষে না দেখিলে তারে খবরিয়া কয়–দেখিয়া বিশ্বাস করা ইনসাইয়া হয়। খবরিয়া সত্য কভু হইতে না পারে–তাহার

দলিল আছে কোরান ভিতরে। শয়তানের এলেম যেন সাগর প্রবল–পৃথিবীর আলেমগণ এক বিন্দু জল। শয়তানের বরাবরি আলেমগণ যদি–করিবেন পারিবনা কেয়ামতাবধি। কিন্তু সে কাতর আছে এস্কের বিদ্যায়–আশেক মাশুক ভেদ পাইবে কোথায়? আশেক মাশুক আছে যে যার অন্তর–কেরামান কাতেবিন তাহা রাখেনা খবর। কেমনে তাহতে দাগা দিবেক শয়তান–ফেরেস্তা বুঝিতে নারে যাহার সন্ধান। জ্যোতির্ময় পীর যারে করে জ্যোতির্ময়–কালামের সৃষ্ট মূল তার মধ্যে হয়। কোথায় কেতাব তব কোথায় কোরান–কোথা তব তছনিফাত কেমন ইমান। দলিল কাঠের পাও চলা মহা দায়–পদ বিনা কাষ্ঠ পদে কোথা চলা যায়? বেগর পীরেতে তব ইমান কোথায়–ভাণ্ড খালি, নাম অলি কি হইবে তায়। মোরশেদ হাসরে গতি খলিফা নবীর–শত নবী সাথী নহে কিন্তু নিজ পীর। তুমি যদি খোদা বলে ডাকিবে হাজার–না শুনিবে খোদা তাহা হাদিসে প্রচার। পার যদি পীর মুখে ডাক দেও তায়–ডাকে ডাকে ডাক পাবে যাবে না বৃথায়। না বল খোদার নাম না বল রসুল–এক চিতে পীর মুখে বোলাও কেবল। তব জন্য পীরে যদি করে আরাধন–তবেত সন্তোষ হবে প্রভু নিরঞ্জন। তুমি পাপী শত পাপী তাতে দোষ নাই–নিজে ফানী পীর ধনী তার স্থানে চাই। মাটিতে রুপিলে গাছ হইবে শিকড়-ডাল পালা ফল ফুল হইবে তৎপর। শিকড় না হইতে যদি লিবে উঠাইয়া–না ধরিবে ফল তাতে যাবে মরিয়া। সেইরূপ জাহেরান যত আলেমান–ফল রহে গাছ তার নাহি পায় স্থান। কেহ বলে চল হেন কেহ করে মানা–দুই পক্ষে দলাদলি বিষম যন্ত্রণা। একীন গাড়িতে তারা মাটি নাহি পায়– কৃষকে রুপিলে গাছ ছাগলে উঠায়। মোরশেদ রুপিলে গাছ হইবে প্রবল–উঠাইতে পারিবে না করে মহাবল। ওয়াজ আওয়াজ কভু শুনিবে না কানে–রহিবে তাহার নেগা একীন কোরানে। ফখরে রাজি এমামের ইমান কোথায়–আছিল ফকির দোস্ত তাতে রক্ষা পায়। এহাতে মালুম হৈল এই বাত সার–যাহার নাহিক পীর শয়তান তাহার। এক ফলে শত ফল দানায় দানায় মূল–মূলে মূলে গাছ পালা ডালে ডালে ফুল। ফুলে ফুলে শত ফল তার কোন ফল–খাইতে পারিলে ফল তারে শিষ্য বল। হাতে ধরে তওবা করে যে হয় মুরীদ–সে কভু মুরিদ নহে জানিবে মারিদ। মোর্শেদ পাইলে সেই মুরিদ নিশ্চয়। দীক্ষিত না হয় যেই পীরের সমীপে–মন তন বেন্ধে সেই রাখিবে কিরূপে। নামাজে খাড়ায়ে যদি খোদা করে মনে–পবনের আগে মন চলে যাবে বনে। শয়তান হইতে পানা ধরিবে খোদার–পাইতে খোদার পানা পীর দরকার। নতুবা শয়তান পীর হয় তা সবার–দমে দমে দাগা দেয় হেন দাগাদার। এ কারণে ইবাদতে নাহি পায় মজা–করিতে জেকের তার ঘাড়ে চড়ে বোঝা। কিছুতে না ফল পায় যত করে চাষ–খোদার জেকের যেন ঠিক বন ঘাস। যাহার ঘরেতে করে মোর্শেদ আসন–খোদা বই কোথা হয় মনেতে স্মরণ? পীর ঘরে প্রভু নাম নিরবধি জমা–জল কূপে জল যেন নাহি পায় ক্ষমা। যে ডুবিল সেই জলে পড়িলেক তল–সে জলের তলদেশে খেজের শাসন। তামাকের ঘটে যদি আতর রাখিবে–সুগন্ধি হইবে নহে খামিরা বনিবে। আতর বিনাশ করে গন্ধ মন্দ চায়–সুবাসিত তৈল আদি ফুলে জন্ম হয়। প্রভু নামগুণ যদি তব মনে রবে–নিজ গুণে গুণি তুমি কেতাবে কি হবে? মুপ্তী যদি করে মানা নাহি শুন তায়–কি হবে শুনিলে ফতওয়া না রৈলে হিয়ায়?মন ঘরে ধন রৈলে ফতওয়া কিছু নয়–কাঁচা মনে সাঁচা ফতওয়া বৃথা নিশ্চয়। কেতাবেতে লাইলী নাম আছয় লিখন–তবে কি কিতাবে লাইলী আছে কদাচন? লাইলী লাইলীতে আছে কেতাবেতে নাই–মজনূতে লাইলী আছে কহিয়া জানাই। ভূতের আছর যদি কার পরে হয়–মনুষ্য ছুরত পরে ভূতে কথা কয়। আসেক মাশুক যদি জুদা জুদা হয়–হাকিকতে এক দেহ কিন্তু জুদা নয়। পিরীতে পিরীতে আছে এক আলাপন–নর হৃদে বাস করে দেহেতে গোপন। অগ্নি যত পৃথিবীতে এক অগ্নি হয়–তেমনি মাশুক জান অভিন্ন হৃদয়। দম দম একদম দম নাহি আর–পাইবা দমের ঘরে প্রভুর দিদার। ঝাড়িলেই চকমক জ্বলিবে আগুন–পুরানে কোথায় আছে বলত আগুন। তব সনে আছে সাঁই নাহিক কোরানে–এহেন প্রভুর বাক্য নাহি শুন কানে? সাহারগ হৈতে তব নিকটেতে ঠাঁই। মাবুদ চিনিতে যদি চাহে কোন জন–সাবুদ করিয়া চিন নিজ তনু মন। অযথা পুরানে কেন করহ ভ্রমণ? পুরানে কোরানে নাহি পাবে দরশন। নিজ সনে আছে সাঁই নিজে জানে নাই–এ বড় বিষম বোকা দারুন বালাই। মন্তর সামান্য কথা মুখের পাঁচালী-পাঁচালী কোরান জান মন যার খালী। মন ভাণ্ড খালী যার খালী সংসার–সংসার অসার হবে হলে অন্ধকার। ইহকালে অন্ধকার হবে যেই জন–পরকালে কোথা পাবে খোদা দরশন? নিজের হইলে হিত অন্যে পাবে হিত–হিতাহিত না রহিলে হবে বিপরীত। নিজে শিষ্য হলে শিষ্য করিবে অন্যেরে–নিজে পীর হলে পীর হবে তত পরে। সে জন নিজের কূল পারে না করিতে–সেজন্য অন্যের ভুল পারে কি সারিতে? নিজ তত্ত্ব যেই নর রাখেনা খবর–সে জন যাইবে কিবা বেহেস্ত ভেতর?

ভক্তিতেই সিদ্ধ হবে মনের বাসনা–ভক্তিতেই পূর্ণ হবে নানা উপাসনা। ভক্তিতেই তৃণকুটা হইবে পর্বত–ভক্তিতেই দূরে যাবে মনের কল্পত। ভক্তিতেই পাপ তাপ মার্জন হইবে–ভক্তিতেই বেগতিক শরীরে না রবে। ভক্তিতেই শক্তি হবে পাষাণ প্রখণ্ড–ভক্তিতেই খণ্ড করে লিখন নির্বন্ধ। অভক্তিতে মিথ্যা হয় সত্য গুরুজন–ঘাসে ভক্তি পাবে মুক্তি রুমের কথন। পীর যদি ঘাস হয় ভক্তি কর তায়–ঘাসে ভক্তি পাবে মুক্তি যাবে না বৃথায়। সর্প মণি মুখে আর জঙ্গলেতে খনি–কণ্টকেতে পু আর কাপুরুষ ধনী। পীর যারে স্থির করে চিনিবে খোদায়–হারামে হালাল তার মদে দুধে পায়। গুরু যদি প্রদানীবে মুর্দ্দার আমায়–খাইব সে মুরদা আমি ভক্তি করে তায়। শতেক কেতাব যদি মানা করে তারে–মানিয়া পীরের বাক্য রেখে দিব ধারে। শত কেতাব ফিকে মার আগুন ভেতর–এক মনে ভক্তি কর তরফে দেলবর। আসেকান মোজহাবে কেহু কার নয়–নিজ নিজ মোজহাব তাদের নিশ্চয়। এই কথা লিখা চাই মছজেদ মন্দিরে–প্রেম পাশে সমতুল্য মমিন কাফিরে। মুসা ইছা হবে কিবা শেষ পয়গম্বর–ফেরেঙ্গি ও মগ হেথা এক বরাবর। সকল আগুন বটে একই আগুন–আগুনে আগুনে নহে গুণাগুণ। এস্কের শরাব যেই খাবে এক জাম–বেহুস হইবে ভোলে নিজ নিজ কাম। নিজ সনে চিন তারে সন্তোষ বিষয়–ত্রিভুবনে তার ভিন্ন কোন জাগা নয়। অন্ধজনে করে যদি এ ভব ভ্রমণ–আকাশের শশী কিহে দেখিবে কখন?

বায়ুতে পাগল যেই তার হবে মাফ–খোদার পাগল বটে কিন্তু কাল সাপ। আলেম বাহেছ করে কেতাব কোরানে–পাগল বাহেছ করে বধিয়া পরাণে। ধন জন রূপ রঙ্গ ত্যাগিয়া ফকির–প্রেম রায়ু সঞ্চালনে সদাই অস্থির। তাহাকে কাফের কহে আলেম বেহুঁশ–অক্ষর কীর্তনে শুধু এত বড় যোশ। নিশ্চয়ে প্রেমের বিদ্যা পেতো যদি হায়। খোজা কি প্রেমের রস পারে বুঝিবারে? আগুন কাপড়ে বেন্ধে কে রাখিতে পারে? বেগর মানসে যদি করিবে সাধন–সাধন বিফল হবে যাবত জীবন। তুমি আমি এক ভাণ্ড ভাণ্ড আর নাই–যথা তথা জল কূপ তাতে জল পাই। জল পেটে স্থল আছে স্থলে আছে জল–জলেতে কানাই করে জলুষ কেবল। নকলেতে জুদা জুদা ভিন্ন ভিন্ন তায়–আসলেতে ভিন্ন পদ পাইবে কোথায়?

আউজ পড়িতে হয় শয়তান কারণ-দাগা দিয়া নষ্ট যেন নাহি করে মন। আল্লাজি "ইউওয়াছবেছ" পড়ে সুরা নাস–পাগলেরে সাঁকো লাড়া কহিছে খান্নাস। ওরে রে মুছল্লিগণ মৌখিক নামাজি–পাগলেরে সাঁকো লাড়া মনে পড়ে আজি। ভাল কথা দাগা দিতে ভুলে ছিনু আগে–স্মরণ দিয়াছ তাহা বোলাইয়া রাগে। হেলাইব সাঁকো আজি মনের মতন–কেনরে আউজ তুই পড়িলি এখন। কেমন আউজ তব দেখিব এবার–এহেন মন্ত্রেতে এবে কি হয় আমার? তোমার মন্ত্রেতে আমি নাহি যাব দূর-করিব মন্ত্রীকে আমি আজি সাঙ্গচুর। তোমার আউজে যদি খান্নাস ডরিত–নামাজেতে ওছওয়াছ কভু না হইত। মাদ্রাসা পাস করে কেহ নবী হন নাই। করে না মাদ্রাসা পাস কোন নবীগণ–এলেমেতে নবী নাহি হল কোন জন। বিদ্যা শিখে নবী অলি নিশ্চয় হইলে-কোরানেতে প্রভু তবে কেন ইহা বলে? উম্মিদেরে পাঠাইনু উম্মি বরাবর–উম্মিপরে উম্মির ভেদ আশ্চর্য খবর। এক দীপে শত দীপ আলো পায়–এক দানায় শত দানা শত গাছ তায়। গুরু বাতি শিষ্য দীপে লাগিল–ছত্রিশ কোটি নিভা বাতি জ্বলিল। মন্দিরে পাবে না তায় পাইবে গর্ত্তরে। চক্ষু না মুদিলে কোথা হবে অন্ধকার–গর্ত্তর ব্যতীত কোথা দেখিবে আনোয়ার? আরসে পারে না যারে পাইবে ফরাসে–কোরানে না পাবে যারে পাইবে বাতাসে। বেহেস্তে পাবে না যারে পাইবে দোযখে–দুঃখেতে পাবে না যারে পাবে তাকে সুখে। এস্কের আগুন যার নরক আকার–নরকে গরত সদা তবু সুখ তার। প্রভুতে না প্রভু পাবে পাবে পীর সনে–পীরেতে পাইবে কোথা পাবে নিজ তনে। কোথায় নিজের তন এক তন তার–এক বিনা জগতেতে কোথা তন আর? তন মাঝে মন আছে মন মধ্যে ধন–সে ধনের কুঞ্জি তালা জানিবে স্মরণ। স্মরণেতে ভুল জন্ম ভুলে আছে মূল–সে মূলের স্থূলেতত্ত্বে নাহি পাবে কুল। আদি মূলে ছিল যথা রূহের বাসর–সে বাসরে নিজে ছিল খোদ পয়গম্বর। যখন কবুল তুমি কৈলে পীর ধন–তাহাতে প্রভুর জাত আর নবিতন। খাজাতেই রাজা আছে মহাসমুদয়–দেখ শুন পড় তারে জুদা হেন নয়। নবী অলি হক নামে হক জান তায়–ভেদ বাক্য প্রকাশিয়া কহিনু তোমায়। আমি নাহি আমিতে যে সে আমি কেমন? একা আমি ছিনু আমি হইনু দুইজন। দুই আমি একাযুক্ত হনু তিন তন। চতুর্থ আমির মধ্যে যখন আমি যাই–সব আমি ক্ষান্ত দিয়া হইনু কানাই। এস্কের আগুন যার বুকের ভিতর–দোজখ অনল তথা নহে কার্য্যকর। পীর বই সেই ভেদ কোথা পাবে আর–পীর বিনা গাফলাতে কোথা যাবে দূর? খোদার জেকের মন করে জাগরণ–ফাঁড়িয়া বাতেনী পর্দা দেখিছে রৌশন। সেই যে রৌশন বাতি মনপুরে জ্বলে–বুঝিবে না অন্ধগণ আহাম্মদী বলে। ইমান তকলিদী বটে অন্ধকার ঠাঁই–হবে না মোরশেদ বিনে ইমান রোশনাই। মহব্বতে যাবে খোলা মনের দুয়ার। দুয়ার খুলিলে আর দেখা নাহি দায়–আমরে রব নিজ রূপে দেখিয়ে তথায়। হে মানব যে না জানে নিজ পরিচয়–কেমনে চিনিবে সেই অন্যের হৃদয়? নিজ রূহে যেইজন পাবে পরিচয়–প্রাণের প্রাণ তবে দেখিবে নিশ্চয়। প্রাণের প্রাণ সেই অসীম আকার–অসীমের সীমা নাহি সীমা ঘর তার। দরজা খুলিতে যদি চাহে কোন জন–খোদার জেকের চাহি করিতে সাধন। খোদার কালাম যদি পড়িবে সদায়–খোদা না পড়িলে খোদা পাইবে কোথায়? কালাম পড়িয়া সবে কাল কাটাইল–জনমেতে কোন জন খোদা না পড়িল। কালাম পড়িতে আছ দেখিয়া কালাম–কেমনে দেখিবে রূপ দেখে যেবা নাম? অক্ষরেতে প্রভু ধরা যাবে না কখন–ধূমপানে পেট পূর্ণ হবে না যেমন। জুব্বা, (আবা), পাগড়ী, আর তছবি রেয়াকার–উপরেতে বানাউট ভিতরে আন্ধার। চাদরের নিচে হেন পরীরূপ রাণী-সে চাদর খুলে দেখ মার মাতা নানী। পুথি দেখে পুথি লেখে কি বুঝিবে তায়–তাতে কি পাইবে মর্ম মরি হায় হায়। বিদ্যা না জানিয়া লেখে সে লেখা হারাম–নফসান খায়েশ এই নহে মনস্কাম। ফকির ফকির চিনে মোল্লা লোকে কিবা জানে–জানে যাহা কেবল গীবত। না জানিয়া লেখে পুথি তাতে কি ফকীরের ক্ষতি, এই মানেতে রহে সালামত।"

ব্যাখ্যা : নবীর মধ্যে উদ্ভাসিত আল্লাহ্‌র জ্যোতি তিনিই লাভ করতে পারেন যিনি মোরশেদ, যিনি কামেল পীর। এবং আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে যিনি উদ্ভাসিত নন, অথবা ইহা অর্জন করার বিশেষ দয়া হতে যিনি বঞ্চিত, তিনি কেমন করে মোরশেদ তথা কামেল পীর বলে গ্রহণীয় হতে পারেন? ইহা অসম্ভব। এই সত্যনূরের এক মুঠো নূর যে কোনো রকম স্থান ও পরিবেশেই রেখে দেওয়া হোক না কেন, এমন কি যেখানে রাখার যোগ্যতার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই তবু সে রকম অযোগ্য স্থান ও পরিবেশেও আপন স্বরূপেই সত্যনূর জাগরিত হয়ে উঠবে এবং সেই নূরের দেশে কলঙ্কের দাগ পরশে নূরময় হয়ে উঠবে। অযোগ্য স্থানের মধ্যে বন্দি সত্যনূর বন্ধনমুক্ত হয়ে কী অপরূপ মাধুর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারে তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত কি মূর্তিপূজারক আজরের পুত্র হজরত ইব্রাহিম (আ.) নন? হাজার পাপ পঙ্কিল স্থানে যদি সত্য নূরের একটি দানা বপন করা হয় এবং সেই সত্যনূরের যোগ্যতা যদি সামান্যও থাকে তাহলে উহা একদিন না একদিন বিরাট রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেই। কোন বাঁধনই তখন বন্ধনের হেতু হওয়া তো দূরে থাক বরং আত্মপ্রকাশের প্রতিটি ধাপে পাপ নামক বৃক্ষের শত শত পাতা ঝরে পড়বে। পাপ-বৃক্ষের লতা-পাতার ভিড়ও সত্যনূরের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, সম্পূর্ণরূপে যখন সত্যনূরের প্রকাশ ঘটবে। আর এই রহস্যের খেলা সত্যিই রহস্যময়। কারণ এ যে লীলার খেলা। যুক্তি আর আইনের

সেতু দিয়ে পার করা যায় না; পারা যায় কেবল ভক্তি আর প্রেমের বিশাল বুকের উপর দিয়ে। বৃক্ষের ডালায় ঝুলন্ত ফলকে যদি বৃক্ষের পুত্র কেউ বলে তা হয়তো দোষণীয় হতে পারে, কিন্তু আসলেই কি তা দোষণীয়? সত্যনূরের প্রতিচ্ছবি হলেন একজন নবী, আর সেই নবীর সত্যনূর যদি মোরশেদ লাভ করতে পারেন তাহলে তাকে কী বলবো? রুহানি অস্তিত্ব বলতে যা বুঝায় উহা কি রহস্যলোকের অভ্যন্তরে একই নয়? যদিও দেহের প্রশ্নে উহা ভিন্ন। মোরশেদের শরীর হতেই মুরিদের শরীর। অর্থাৎ যে সত্যনূর মোরশেদ লাভ করেছেন উহারই আর একটি বিকাশের স্থান হল মুরিদ। মুরিদ যখন গুরুর সত্যনূর লাভ করেন তখন উভয়ের অবস্থাটি অনেকটা পানি ও চিনির মত। দুটো মিশিয়ে ফেললে একাকার হয়ে যায়। এটাকেই বলা হয় হুজুরি বিদ্যা এবং ইহা নবীর একান্ত গোপনীয় বিদ্যা এবং এই রকম নবীর গোপনীয় বিদ্যার আকর্ষণ কাগজের মধ্যে পাওয়া যায় না। লিখিত বিদ্যার হাজার হাজার কাগজ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাতে কিছুই আসবে যাবে না, যদি সত্যনূরের অধিকারী গুরুজনেরা উপস্থিত থাকেন। আর যদি সত্যনূরের অধিকারী গুরুজনের অভাব দেখা দেয়, তাহলে লিখিত বিদ্যার হাজার হাজার কাগজ কি সত্যনূর লাভ করার কোন সহায়করূপে কাজে লাগবে? কাগজের পাতায় লিখিত বিদ্যা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাতে কি কোন ক্ষতি হবে? মোরশেদের বুকের ভেতর যে সত্যনূরের রহস্যময় বিদ্যার অবস্থান উহা কি কাগজের পাতার বুকে আছে অথবা থাকতে পারে? আল্লাহ্ স্বয়ং নূর এবং সেই নূরকে সানাওরী নূর বলা হয় এবং সেই একই নূরে নূরময় হলেন নবী আর নবীর নূর হতেই পীরের নূর এবং এই পীরের নূর হতেই রহমতের ধারা প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই পীরের নূর হতেই ফয়েজ পাওয়া যায়। এই নূরের অধিকারী পীরেরা পরশপাথরের মত তথা এদের সহবতের স্পর্শে পাথরেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কারণ, এদের হৃদয়ের গভীরতার তুলনা সাগরের মত। যে হুজুরি এলেম নবীর মধ্যে বর্তমান তাকেই বলা হয় আল্লাহ্‌র নূর আর সেই নূরেই নূরময় হলেন পীর। হুজুরি বিদ্যা অর্জন করতে হলে সদাসর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে এবং উহা নিজের মধ্যেই খুঁজতে হবে। দুনিয়ার বিদ্যাশিক্ষা করতে হলে শিক্ষক নামক ওস্তাদের যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি সত্যনূর লাভ করার জন্য প্রয়োজন হয় পীরের। শিক্ষক যখন ছাত্রকে বিদ্যা শিক্ষাদান করেন তখন চোখ দুটো খোলা রাখতে শিখতে হয় এবং চোখ খুলে দেখে দেখে শিখতে হয়। কিন্তু নূর লাভের শিক্ষার প্রশ্নে পীর উপদেশ দান করেন ছাত্রকে এই বলে যে, চোখ দুটো বন্ধ রাখ। চক্ষু-বন্ধ-বিদ্যা হল রহস্যলোকের রহস্যময় জ্ঞান লাভ করার প্রচেষ্টা এবং এ রকম রহস্যময় জ্ঞানের রহস্য তারা কোনদিনই বুঝতে পারবে না যারা চোখ খুলে বিদ্যা অর্জন করেছে। কারণ, দুটোর আদেশ আর উপদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কাগজের পাতায় লিখা বিদ্যার বাহার যিনি পড়ে চলেছেন তিনি কি মনে করেন যে, এভাবেই বিদ্যা অর্জন করা যায় এবং বইয়ের কাগজের পাতা উল্টানোকেই মনে মনে মঙ্গলজনক বলে ভাবেন? অথচ আসল মঙ্গল হয় দেহ ও মনের একাগ্র ধ্যানমগ্ন সাধনের মাধ্যমে; যেখানে ষড়রিপুর বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করা হয় এবং এই মুক্তির বারতা বহন করছে স্বয়ং কোরান। আবার কেবলমাত্র কোরান দেখলেই চলবে না এবং তাতে মুক্তি পাবে না, যদি কোরানের আসল রহস্যটি অনুধাবন না করে অগ্রসর হয়। কোরানের যে মূল কথাটি উহা মনের ভেতরই আছে এবং সেটা পাবে পীরের কাছে, কিন্তু অন্য কোথাও পাবে না। সত্যনূর পাবার সাধনায় যিনি ধ্যানমগ্ন তার মন কখনোই অলীক পথে ধাবিত হবে না। সত্যনূর ছাড়া সত্য কেহ লাভ করতে পারে না। কারণ, সত্যনূর পেতে হয় কোন মাধ্যমে তথা উসিলাতে। সুতরাং সত্যনূর পাবার ইচ্ছা থাকলে পীর ধরতে হবে। এবং যদি পীর ধরতে না চাও তাহলে সত্যনূর পাবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যে জিনিস অথবা যে বিষয়টি নিজের চোখে দেখেছ সেটার সঙ্গে কি শোনা কথার দাম থাকে? কারণ, শোনা কথাটির মাঝে সব সময় সন্দেহটি থেকে যায় এবং বিশ্বাসের মাঝেও অপূর্ণতা অবস্থান করে এবং এ রকম শোনা কথার উপর ভিত্তি করা বিশ্বাসটিও ভেঙ্গে যাবার থাকে সমূহ বিপদ। আর শোনা কথার বিশ্বাসটিকে যদি ইমানই বলা হয় তাহলে সেই বিশ্বাস যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো তর্ক বিতর্কে কেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়? তাহলে এটা কোন ধরনের ইমান? এই পৃথিবীতে থেকেও যারা অন্ধ হয়ে রইলো তারা পরকালেও সেই অন্ধই থেকে যাবে। তারা তাহলে সত্যনূরের দর্শন কী করে পাবে? যারা কথায় কথায় আল্লাহ্‌র অংশিত্বকে ভয় করে, তারা কি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র অংশিত্বের কথাটির রহস্য বুঝতে পেরেছে? কেবলমাত্র মুখে বললেই শেরেক হয় না। কারণ, যদি কেউ আমাকে রুম দেশের রাজা বলে মনে করে তাই বলে কি সত্যিই রাজা হয়ে গেলাম নাকি? আসলে যে রাজা বললো সে-ই মিথ্যুকে পরিণত হল। কারণ, তার এই কথাটির কোনো মূল্য নেই। সে রকমভাবে মুখে যারা সব সময় শেরেকের কথাটি বলে বেড়ায় তারা কি খোদার বাদশাহি ছিনিয়ে নিতে পারবে বা কোনদিন পেরেছে? আসল ইমানটি তখনই হয় যখন সাধক তৌহিদের মোকামে তথা একত্বের ঘরে যেতে পারে। আর সাধক যখন তৌহিদের ঘরে প্রবেশ করে তখন দেখতে পায় যে আলিফ, বে, খোদা একের মধ্যেই লীন হয়ে আছেন। ধর্মীয় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, এজমা, কেয়াস আর মোসলা-মাসায়েলের হাজারো ধরনের বিদ্যা অর্জন করলেও, এমনকি এসব বিষয়ের উপর যদি পঞ্চাশ হাজার বইও পড়েন তাতে বিশ্বাসের অটলতা-অচঞ্চলতা কোনদিনই আসবে না এবং আসতে পারে না। ঠিক সে রকমভাবেই যদি বলতে হয় তাহলে যিনি খোদার জাতের রহস্য চিনতে পেরেছেন তিনি কী করে এবং কেমন করে কাফের হবে? চোখে না দেখতে পারলে অন্যের মাধ্যমে ঘটনাটি শুনতে হয়, কিন্তু নিজের চোখে দেখে যে বিশ্বাস হয় সেই বিশ্বাসকে বলা হয় 'ইনসাইয়া'। শোনা খবর প্রায়ই বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং কথাটির দলিল তথা সাক্ষী স্বয়ং কোরান। শয়তানের এলেম তথা বুদ্ধি সাগরের মত প্রবল এবং পৃথিবীতে যত বিদ্বানেরা আছে তাদের সকলের বিদ্যাবুদ্ধি একত্র করলেও শয়তানের বিদ্যাবুদ্ধির সামনে যেন এক বিন্দু জলের মত এবং শয়তানের বুদ্ধির সঙ্গে কেয়ামত পর্যন্ত পারা যাবে না। কিন্তু শয়তান কেবলমাত্র একটি স্থানে এবং একটি বিষয়েই দুর্বল, আর সেটা হল প্রেমের বিদ্যা যাকে ইশক বলা হয়। প্রেমিক তথা আশিক আর মাহবুব তথা মাশুকের ভেদ-রহস্যটির বিন্দুবিসর্গও শয়তান বুঝতে পারে না। এমন কি আশেক-মাশুকের অন্তরের খবরটি স্বয়ং ফেরেস্তারাও জানতে পারে না। সুতরাং প্রেমের বিষয়টির প্রশ্নে যেখানে স্বয়ং ফেরেস্তারাই সম্যক অবগত নয়, যেখানে

শয়তান কী করে ধোঁকা দিতে পারে? আল্লাহ্‌র নূরে নূরময় যে পীর, তিনি যদি তাঁর নূরে অন্যকে নূরময় করেন তা হলে সেটাই হল কোরানের মূল এবং একমাত্র শিক্ষা। কারণ, আল্লাহ্‌র কালামের যে আসল রহস্য সেই রহস্য তার মধ্যে বিকশিত হয়ে আপনা আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এই নূরময় রহস্যের মাঝে ডুব না দিতে পারলে অথবা এর মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে না দিতে পারলে কোথায় থাকে কেতাবের মূল রহস্য এবং কোরানেরই মূল্যায়নের যথার্থতা থাকে কোথায়? আর এ দুটোর রহস্য অনুধাবনের মধ্যে ডুব না দিলে ইমানই বা থাকে কোথায়? অর্থাৎ ইমানের মর্যাদার মানদণ্ড কচুপাতার উপর ভাসমান জলবিন্দুর মত হয়ে পড়ে; যে কোনো মুহূর্তে কচুপাতা হতে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া কাগজে কলমে লিখিত দলিল তথা আইনগুলোর দাম অনেকটা কাঠ দিয়ে বানানো পায়ের মত। আসল পা নয় তথা রক্ত-মাংসে তৈরি স্বাভাবিক পা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কাঠের পায়ে ভর দিয়ে চলতে যেমন কষ্ট হয়, লিখিত দলিলগুলোও সে রকম। কারণ, ভেতরে আসল মাল মওজুদ না থাকলে যে কোন সময়, কাঠের পায়ের উপর ভর করে চলতে গেলে, বিপদের সমূহ আশংকা থাকতে পারে। তাছাড়া স্বাধীনভাবে কাঠের পা-কে একমাত্র সম্বল করে চলাফেরা করা অসম্ভব, যদি না নিজের সঙ্গে আসল পা-টি থাকে। পীর না ধরে, অথবা পীরকে অস্বীকার করে সেই ইমানের আশা কেমন করে করা যায়? নামে অনেকেই পীর, কিন্তু যদি মনের ভাণ্ডটি তথা পাত্রটি খালি থাকে তাহলে সেই রকম পীর দিয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ, নামের পীর দিয়ে তো আর আসল ফলটি লাভ করা যায় না এবং যেতে পারে কি? আসল যে পীর, তথা আল্লাহ্‌র নূরে নূরময় যে পীর, তিনিই তো মরণ কালের ভরসা। কেন? কারণ, সেই কামেল পীর হলেন নবীর খলিফা তথা প্রতিনিধি এবং মরণকালে, তথা মরণটাই হলো হাসর, এবং সেই মৃত্যু-হাসরের দিনে কোনো নবীই সাথী হবেন না, সাথী হবেন মাত্র একজন এবং সেই সাথীই হলেন নিজের পীর ও মুরশেদ। আমরা যদি হাজার বারও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে ডাকি তাতে আল্লাহ্ সেই ডাক শুনবেন না। কারণ, এ রকম ডাক যে আল্লাহ্ শুনবেন না তা তিনি মহানবীর মাধ্যমে হাদিসে বলে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। তাই যদি পার তাহলে পীরের নামের মাধ্যমে ডাক। কারণ এই মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌কে সোজাসুজি পাবার বিধান তিনিই দিয়ে যান নি। শয়তানকেও এই মাধ্যমের রহস্যময় উপদেশটি দিয়েছিলেন : শয়তান মাধ্যমটিকে মেনে দিতে পারে নি। সরাসরি যোগাযোগের দর্শনটিই ছিল শয়তানের মূলমন্ত্র। শয়তান খান্নাসরূপে আমাদের ভেতর ঢোকে। সে রকম স্বভাব এবং মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশের দর্শনটি প্রায়ই অনেকের মধ্যেই দেখতে পাই এবং আমাদের মধ্যে সেই শয়তানের সরাসরি দর্শনটি পরিষ্কাররূপে ফুটে ওঠে এবং তারই দরূন বিনয়, ভদ্রতা, নম্রতা এবং আদবের প্রচুর অভাব দেখা যায়। কারণ, অহংকার হতেই শয়তানের উদ্ভব এবং এজন্যই 'বালাসা', তথা অহংকার হতে ইবলিস তথা অহংকারী। এই অহংকার কমবেশি সবার মাঝেই আছে। কিন্তু যখন শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায় তখনই হয় অহংকারের বিলোপ তথা অহংকারশূন্যতা এবং এটাকেই বলা হয় হাস্তি, খুদি, অহং বা ইগোকে মেটানো। অনেক জীবাণু যেমন চোখে দেখার প্রশ্নই ওঠে না বরং অতি শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়ে, তেমনি অহংকার বিষয়টিও সেভাবেই আল্লাহ্ পাক দেখে থাকেন। তাই বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী এই মূল্যবান কথাটি সোজা ভাষায় বলেছেন যে, পীররূপের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে ডাক, কাতর আহ্বান জানাও, সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে তথা এখলাসের সহিত নাম ধরে ডাক, তাহলেই সেই ডাকের সাড়া পাবে। বুঝতে পারবে যে, তোমার ডাক বৃথা শূন্য আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে না। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, সেই ডাকের জবাব অবশ্যই পাবে এবং ইহা কখনোই বৃথা যেতে পারে না। বিফল মনোরথ নিয়ে হা-হুতাশের যাতনায় ভুগতে হবে না একটা চাপা বোবা বেদনা নিয়ে। তাই বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী একদম খোলা ভাষায় পরিষ্কার উপদেশের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, 'না বল খোদার নাম' অর্থাৎ খোদা বলে ডাক দিও না এবং তিনি এখানেই থেমে গেলেন না বরং আরো উলঙ্গ আরো স্পষ্ট করে উপদেশ দিলেন যে, কেবল খোদার নাম নিতেই মানা করছি না বরং আরো ভাল করে জেনে রাখ যে, 'না রসুল'। কেবলমাত্র একমনে, এক ধ্যানে, এক নিরিখে পীরের নাম নাও, অর্ধাৎ মারেফতি অজিফাটি হতে হবে যার যার পীরের নামের উপর। এ রকম উলঙ্গ ভাষায় এত বড় জ্বলন্ত সত্য কথাটি বাংলা ভাষায় আমার নজরে আজও পড়ে নাই। তবে ফারসি ভাষায় অনেক আছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আগের মত এখন আর মাদ্রাসায় ফারসি ভাষার তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মাদ্রাসায় ফারসি ভাষাটা এক রকম উঠে গেছে বলে মনে হয়। অবশ্য তারও প্রধান কারণ হল শ্রদ্ধায় ওহাবি ভাইদের প্রভাবটি। অবশ্য মিথ্যার প্রভাব বেশিদিন টেকে না। তাই কিছু কিছু আহলে সুন্নাতুল জামাতের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। তাই বোঝা যাবে যে বাতেলের দৌড় কোন পর্যন্ত।

তুমি পাপ করেছ? যত শত পাপই করে থাক না কেন তাতে ভয় পেয়ো না এবং ভয় পাবার কারণ তখনই থাকবে না যখন তুমি আপন পীর ও মুরশিদের মধ্যে ফানা হয়ে যেতে পারবে তথা নির্বাণ লাভ করবে পারবে। যদি তুমি আপন পীরের মধ্যে ফানা হয়ে যেতে পার এবং আপনার মাঝে আপন পীরকে সম্পূর্ণরূপে বসিয়ে নিতে পার, তখন তোমার হাতই হবে তোমার পীরের হাত এবং এভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পীরের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে এবং এরূপ অবস্থানের পরিবেশে পূর্বের শত শত পাপগুলোকে ঢেকে দেওয়া হয়, যেমন গাছের দৃশ্যমান ফলফুলগুলোকে রাতের ঘন অন্ধকার ঢেকে দেয় সম্পূর্ণরূপে। এই পৃথিবীতে অনেক পাপই এভাবে কেবল নরকের শৃঙ্খল হতে মুক্তিই লাভ করে নি বরং বড় বড় বিখ্যাত অলী-দরবেশ, পীর-ফকিরে পরিণত হয়ে অনেক মানুষকে সত্য পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু দৃষ্টান্ত কি না দিলেই হয় না? চিশতীয়া তরিকার বিখ্যাত দুইজন অলীর মধ্যে একজন ছিলেন নামকরা ডাকাত এবং অপরজন ছিলেন বাদশা বা রাজা। ভয়াবহ ডাকাতরূপে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ফুজায়েল ইবনে আয়াজ এবং দুনিয়াদারীর বাদশা ছিলেন ইব্রাহিম আদহাম বলখি। তা ছাড়া পাকিস্তানের মাঙ্গো পীরও একজন কুখ্যাত ডাকাত ছিলেন। খাজা গরিব নেওয়াজের পীর

ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবা হজরত উসমান হারুনী বাক্কা বলেছেন, মারফতের দেশে যাবার জন্য ভাল এবং মন্দ নামক দুটো সার্টিফিকেটের এক পয়সাও দাম নেই। কথাগুলো শুনলে প্রথমে কেমন যেন গরমিলের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু একটু নীরবে চিন্তা করে দেখুন তো–আমরা কি প্রতিদিন অনেকেই কমবেশি পাপ করি না অথবা পাপ কাজের বোবা সমর্থন দিয়ে যাই না? গাছ বপন করতে হলে সর্বপ্রথমেই মাটির প্রয়োজন। কারণ, গাছের শিকড়গুলো মাটিতেই গজায় এবং মাটিই গাছটিকে ধরে রাখে এবং তারপরই গাছে ডালপালা গজায় এবং তারপর সেই ডালপালাতে গজায় ফুল আর ফল। মাটিতে শিকড় গজানোর আগেই যদি গাছটি তুলে নেওয়া হয় তাহলে ফল কী করে পাবার আশা কর? বরং ফল পাওয়া তো দূরে থাক, গাছেরই বারোটা বেজে যাবে। এভাবেই তুলনা করে আরবি ভাষা জানা প্রকাশ্য আলেমদের কথাই যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে, তাদের বিদ্যারূপ গাছের শিকড় মাটি স্পর্শ করে নি অথচ ফলের আশায় বিভোর হয়ে আছে। এ কথা কি অন্য ধর্মগুলোর প্রকাশ্য বিদ্বানদের বেলাতেও খাটে না? সব ধর্মের মাঝেই কি এ রকম সবজান্তা আর ঠেঁটার দল কমবেশি পাওয়া যায় না? অবশ্যই পাওয়া যায় এবং এ রকম আজব চিজেরাই একমাত্র সত্যধর্মটির শরীরে দলাদলি এবং নূতন নূতন মতবাদের পোশাকগুলো পরিয়ে দিয়ে সার্কাসের জোকার বানিয়ে ছাড়ে। পৃথিবীর মানুষগুলো তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং সর্বধর্মের যে মূল কথা একটিই সেটা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। নোংরামির সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে 'খুব একটা কিছু করে ফেললাম'-এর মত ভাবসাব দেখাতে লজ্জা পায় না বরং আত্মতৃপ্তিতে বার বার দলীয় সাইনবোর্ডখানার দিকে তাকিয়ে দেখে। অণুকে পরমাণুতে রূপান্তর করার চেয়েও কঠিন হয়ে পড়ে পৃথিবীতে অনেক ধর্মের অনেক সাইনবোর্ডগুলো নামিয়ে আসল এবং মূল সত্যটিকে সবার সামনে তুলে ধরা। কারণ, এই সবজান্তার দল পৃথিবীর মানুষদেরকে শিখিয়ে ফেলেছে যে, এই ধর্মটি আমার, ওই ধর্মটি তোমার, সেই ধর্মটি তার। আমার, তোমার, তাহার এইভাবে ভাগ করে দিয়েছে আর এই অভিশপ্ত ভাগের পাথর চাপা হতে কবে যে পৃথিবীর মানুষেরা পাবে মুক্তি, পাবে একমাত্র সত্য ধর্মটির সন্ধান! কালের ইতিহাসের মাঝে দাঁড়িয়ে কে চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করে যাবে যে, আমার, তোমার এবং তাহার এই ভাগ যারা করে গেছে তারা সমগ্র মানবজাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে সার্বজনীন চিন্তাধারার হাড়গুলোকে। বিষিয়ে দিয়েছে ধ্যান-ধারণার সমতল ভূমিকে, পুড়িয়ে দিয়েছে ফসল ফলার মাঠকে ইট পোড়াবার মত।

'কেহ বলে চল হেন কেহ করে মানা' এই একটি লাইনে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কী সুন্দর করেই না ওইসব সবজান্তা আলেমদের মনের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এদের মধ্যে একতার দর্শন নেই, আছে ভিন্নতা। তাই একদল বলে, এটাই ঠিক; পরক্ষণে অন্যদল বলে, এটা মোটেও ঠিক নয় এবং এভাবেই উভয় পক্ষের মাঝে শুরু হয়ে যায় দলাদলি এবং এই দলাদলির ফলটি হয় বাবা জানুর ভাষায়, 'বিষয় যন্ত্রণা'। এ রকম আলেমেরা অবশেষে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না তথা তাদের বিশ্বাসগুলোকে দাঁড় করানোর মত মাটি পায় না। যদি কোনো মহাপুরুষ নামক কৃষক মহাবাণীর গাছ রোপণ করেন তাহলে এরা ছাগলের ভূমিকা পালন করে। তাই সেই গাছটিকে কৃষক রোপণ করলে কী হবে? ওইসব ছাগলের তো আর অভাব নেই, তারা এই গাছ উঠিয়ে ফেলে।

দীক্ষা যদি পীরের নিকট না নেওয়া হয় তাহলে এই দেহ মনকে কী দিয়ে একাগ্রতার মধ্যে ধরে রাখা যাবে? পীরের নিকটে দীক্ষা না নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কথা মনে করতে গেলে মনের গতি বাতাসের আগেই ধাবিত হবে এবং আল্লাহ্‌র কথা ভুলে গিয়ে সেই মনটি চলে যাবে বনে। বন বলতে এখানে ইস্টিশন ছাড়া এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোকে বুঝানো হয়েছে। তাই শয়তানের নানা রকম ধোঁকাবাজি হতে যদি কেউ মুক্তি চায় তবে সেই মুক্তির পথের দিশারির জন্য পীরের প্রয়োজন, নতুবা শয়তান তথা নিজের প্রবৃত্তিই আজীবন পীর হয়ে থাকবে। কারণ, শয়তান তথা প্রবৃত্তি প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসের মাঝে ধোঁকা দেয় এবং শয়তান হল ধোঁকা দেবার প্রধান হোতা। শয়তানের ধোঁকা দেবার কারণে এবাদতের মধ্যে কোনো মজা পায় না। এমন কি জেকের করতে গেলে মনে হয় যেন একটা বিরাট বোঝা ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল। এ রকম এবাদতের চাষে ফল মেলে না কিছুই, বরং বনঘাসের মত আপদ মনে হয়। শয়তানের ধোঁকা অগণিত। শয়তানের ধোঁকাগুলো স্থান বিশেষে কোথাও স্থূল, আবার কোথাও সূক্ষ্ম, আবার কোথাও সূক্ষ্মের চাইতে অনেক সূক্ষ্ম। মানুষকে ধোঁকাবাজির মধ্যে ফেলে দিয়ে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবার দায় দায়িত্ব যে নিয়েছে তার নাম হল শয়তান। অবশ্য ফেরেস্তাদের ইমামরূপে যখন ছিলেন তখন তখন উনার নাম ছিল হজরত আজাজিল। *'আনা খাইরুম্ মিন্ হু'*, 'আমি তার (আদম) থেকে উত্তম', এই একটি মাত্র অহঙ্কারের দরুনই এই অধঃপতন। কেউ যদি বলে যে, হজরত আজাজিলের আগে তো কোনো শয়তানই ছিল না, তাহলে হজরত আজাজিলকে শয়তানে কে পরিণত করলো? কে তাকে এই কুমন্ত্রণা, এই ওয়াছওয়াছা দিল যে, আমি আদম হতে অনেক ভাল? আমরা হয়তো সহজেই আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করতে চাইবো, কিন্তু দোষারোপ করারও কোনো উপায় নেই। কারণ, আল্লাহ্ স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি কাউকে কুমন্ত্রণা দেন না। তাহলে প্রশ্ন আসে, এই কুমন্ত্রণা কে দিল? কারণ, তার আগে তো কোনো শয়তানই ছিল না। এই প্রশ্নটির খুবই সুন্দর করে উত্তর দিয়ে গেছেন যিনি তিনি হলেন *মসনভী-র* রচয়িতা বিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর পীর ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবা সামসেত্তাব্রীজ এবং এই প্রশ্নটির চমৎকার উত্তরটি পাবেন *দেওয়ানে সামসেত্তাব্রীজ* নামক বিখ্যাত ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে। কথা প্রসঙ্গে এ রকম আজব প্রশ্নগুলোর সমাধান দিয়ে গেছেন নিখুঁত যুক্তির গ্রহণযোগ্য উত্তরের মধ্য দিয়ে। *দিওয়ানে সামসেত্তাব্রীজ* প্রথম একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন, যে প্রশ্নটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে চমকিয়ে দিতে পারে। প্রশ্নটি হল, কোরান বলছে যে, প্রত্যেকের পাপ-পুণ্যের হিসাব তাকেই দিতে হবে, অন্যকে নয় এবং একজনের ভালমন্দ অন্যকে দেওয়া হবে না। তাহলে আদি পিতা ও মাতা আদম আর হাওয়া বেহেস্তে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছেন এবং এরই দরুন তাদেরকে দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া

হয়েছে। ভাল কথা, হুকুম অমান্য করার শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু আমরা তো বেহেস্তে গন্দম খাই নি, তাহলে আমরা কেন আদি পিতা ও মাতা আদম হাওয়ার শাস্তির বোঝা বইতে যাব? *দিওয়ানে সামসেত্তব্রীজ*-এর অনুবাদ হোক এটা সবাই চাইছে। বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী বলেছেন যে, যার মনের ঘরে পীরের অবস্থান তিনি তো খোদার স্মরণেই ডুবে আছেন। প্রভুর গুণাগুণের বিষয়গুলো অনেকটা কূপের মধ্যে যেমন জল জমা থাকে সে রকম ভাবেই পীর যে ঘরে থাকে সে ঘরেই প্রভুও থাকে। এই রকম জলের মাঝে যে ডুব দিতে পেরেছে সে তো তলিয়ে গেছে আর সেই জলের তলদেশে যার সবর্ময় ক্ষমতা তিনি তো খিজির নামক আবদুহু ছাড়া আর কেউ নন।

ধূমপান করার তামাকের পাত্রে যদি আতর রাখা হয় সেই আতর আর আতররূপে থাকতে পারে না। যদিও সুগন্ধি থাকে, কিন্তু উহা খামিরা হবে, আতর আর হবে না। কারণ, আতর তামাকের আসল গন্ধটিকে নষ্ট করে দিয়ে সুবাসিত করে তোলে, কিন্তু আতর বানাতে পারে না। কিন্তু এই সুবাসিত আতরের জন্ম হয় সুবাসিত ফুল হতে। সে রকম ভাবে প্রভুর নাম ও গুণ যদি তোমার মনে স্থান পায় তাহলে তোমার গুণেই তুমি গুণী। কাগজের কেতাব দিয়ে কি সেই মৌলিক গুণ পাওয়া যেতে পারে? প্রশ্ন করেছেন বাবা জান শরীফ। তার মানে কাগজের কেতাব সেই মৌলিক গুণগুলি দিতে অক্ষম। ফতোয়া যিনি দেন তাকে মুফতি বলা হয় এবং সে রকম মুফতি যদি তোমাকে বারণ করেন তাহলে সেই মুফতির কথা ভুলেও শুনবে না। কারণ সেই ফতোয়ার কী মূল্য থাকতে পারে যদি হৃদয়ের মাঝে প্রভু না থাকে? যদি মনের ঘরে প্রভুই বিরাজ করেন তাহলে সেই রকম ফতোয়ার কি আর দরকার মনে হয়? হয় না। কারণ, সে রকম ফতোয়ার তখন আর কোনো মূল্যই থাকে না।

কাগজের কেতাবে তো লাইলির নাম অনেকবার লিখা থাকে। তাই বলে কি লাইলিকে কাগজের কেতাবে পাওয়া যাবে? যাবে না। কারণ লাইলি লাইলিতেই আছে। কাগজের কেতাবে লাইলিকে পাওয়া যাবে না। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই যে, মজনুর মধ্যেই লাইলি থাকে এবং আছে। মজনুর মধ্যে লাইলিকে পাওয়া যাবে শুনলে হয়তো অনেকে অবাক হবেন। কিন্তু অবাক হবার তেমন কিছু নেই। কারণ, জিনের আছর যদি কারো উপর হয়, তাহলে সেই জিন সেই মানুষের সুরতেই কথা বলে। মনে হবে একটি মানুষ কথা বলছে, কিন্তু আসলে কথা বলছে সেই ভর-করা জিনটি। প্রেমিক আর প্রেমিকা যদিও আপন আপন দেহে পৃথক এবং এদেরকে বলা হয় আশেক আর মাশুক; কিন্তু দেহ উভয়ের আলাদা হলে কী হবে, আসলে এরা উভয়ে এক এবং এরা মোটেও আলাদা নয়। ছবির ক্যাসেট দুটো আলাদা হতে পারে, কিন্তু উভয় ক্যাসেটে একই ছবি। প্রেমের মাঝেও একটি ভাষা, একটি আলাপ-আলোচনা থাকে; কিন্তু সেই আলাপ আলোচনার ভাষাটি বোবা এবং এই বোবা কথাবার্তাটি মনের গভীরে বাস করে। কিন্তু উভয়ের দেহ দেখে তা বুঝবার উপায় থাকে না। কারণ, দেহই সেই আলাপনের গোপনীয়তা রক্ষা করে। পৃথিবীর যত আগুন যত দেশেই থাক না কেন, আসলে সব আগুন একই আগুন। ঠিক সে রকমভাবে পৃথিবীর সব মাশুকের তথা প্রেমিকদের হৃদয়গুলোও একই হৃদয়। পৃথিবীর সবাই একই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন, যাকে বাবা জান শরীফের ভাষায় 'দম দম এক দম, দম নাহি আর' বলেছেন এবং সেই দমের ঘরেতেই প্রচুর দর্শন লাভ হয়। যদি কেহ নিজের অহংকে তথা আমিকে ঝেড়ে ফেলতে পারে তাহলে সে দেখতে পাবে যে প্রভুর নূর চমকাচ্ছে। এবং এই প্রভুর নূর কি পুরাণে কখনো পাবার আশা কর? কখনই সেই নূর তুমি পুরাণে পাবে না এবং পাবার আশা করাটা নিতান্ত বোকামি আর ঠেঁটামির পরিচয় দেবে। কারণ, আপন অস্তিত্বের ভেতর প্রভুর নূরের দর্শন পাবে, কিন্তু কোনদিনও কাগজের কোরানে সেই নূর পাবার আশা করো না। সে রকম আশা করলে মনের তৃপ্তি কাঠের পায়ে ভর দিয়ে চলার মত পেতে পার, কিন্তু প্রভুর নূরের দর্শন পাবার কথা কাগজের কোরানে কোনদিন পাবে না এবং পেতে পার না। হজরত উসমান (রা.) যখন কাগজের মধ্যে কোরানকে একত্রিত করেছিলেন তখন মাওলা আলী (আ.) বলেছিলেন যে, এই কোরান তো কথা বলে না, কিন্তু আমি হলাম জীবন্ত কোরান। তুমি কি এ রকম কথা যা আমি বললাম তা প্রভুর মুখে শুনতে পাওনি? কোরানের পঞ্চাশ নম্বর সূরা কাফ-এর ষোল নম্বর আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, *'নাহ্নু আক্রাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ।'* অর্থাৎ 'আমরা তার শাহা তথা প্রধান রগ হতেও নিকটতম'। তাই বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী বলেছেন যে, মাবুদ তথা প্রভুকে যদি চেনবার এবং জানবার কারো ইচ্ছা হয় সে যেন সর্বপ্রথমে নিজের মন ও দেহকে চিনতে চেষ্টা করে। সে যেন অন্য কোনো আজেবাজে বিষয়ের মধ্যে মনকে না ডুবিয়ে আপন অস্তিত্বের সন্ধানে আপনার মাঝে ডুব দেয়। তা হলেই সকল রহস্যের দরজাগুলো এক এক করে খুলে যেতে থাকবে। অযথা পুরাণের মাঝে কেন প্রভুকে খুঁজতে যাও? একদম সোজা আর স্পষ্ট করে বলে দিলাম এবং আমার এই কথা কয়টি সব সময় মনে রাখতে চেষ্টা করবে যে, 'পুরাণে কোরানে নাহি পাবে দরশন।' অর্থাৎ পুরাণেও পাবে না এমনকি কাগজের কোরানেও নয়। বরং বৃথা সময় অপচয় করবে। অবশ্য আমার এই উপদেশটি অবহেলা যদি কর তাহলে মৃত্যুর সামনাসামনি যেদিন হবে সেদিন মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে যে, আমার উপদেশটি কতই না মূল্যবান ছিল। আর তখন বুঝে কিছুই লাভ হবে না। একটা বিরাট অনুশোচনা আর দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে চিরবিদায় নিতে হবে। অনেকটা 'আজ বুঝবি না, বুঝবি কাল; মাথা থাপড়িয়ে মারবি গাল'-এর মত হবে। এখন তো সুসময়, সবাই বন্ধু বনে যায়; কিন্তু মৃত্যুর সামনে হায় হায় করতে হবে; কারণ তখন সেই প্রিয় বন্ধুরা কেউ থাকবে না। মুখে মুখে কোরানের আয়াত পাঠ করাকে বাবা জান শরীফ মুখের পাঁচালী বলেছেন এবং সেই সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, 'পাঁচালী কোরান জান, মন যার খালি'। অর্থাৎ মুখে সুন্দর করে ভাজতে পারে, কিন্তু মনের গহিনে এর বিন্দু-বিসর্গও নেই। এই মন নামক ভাণ্ডটি যার খালি, তার সব কিছুই খালি। এমনকি তার অনেক দিনের বাঁধানো সংসারটিও। 'সংসার অসার হবে হলে অন্ধকার' অর্থাৎ মৃত্যুই বুঝিয়ে দেবে যে সেই সংসার কতটুকু অসার আর মূল্যহীন ছিল। আবার তিনি বলছেন যে, ইহকালে যিনি অন্ধ হয়ে বিদায় নেবে সে কী করে পরকালে প্রভুর দর্শন লাভ করবে? পরকালটি তার অনুশোচনার সমুদ্রে পরিণত হবে। কারণ, বেঁচে থাকতে প্রভুর দর্শনের বিষয়টি

তার কাছে ছিল নিতান্ত অবহেলার বিষয়। খেলো চিন্তাধারার হাসি হাসি ফুলবাবু-মার্কা দর্শন। বেঁচে থাকতে মরণকে মরণই মনে হতো না। মনে হতো এ তো অন্য দশজনের মতই স্বাভাবিকভাবে বরণ করে নিতে হবে। নিজের পরিচয় জানতে পারলেই অন্যকে সেই পরিচয়ের বিষয়টি অবগত করানো যায়, কিন্তু এ রকমটি না হলে হবে সম্পূর্ণ বিপরীত, তথা উল্টো ফল ফলবে। নিজে যদি প্রভুর প্রকৃত শিষ্য হতে পারে তবেই অন্যকে শিষ্য করতে পারে। নিজে যদি পীর হতে পার তাহলে তোমার সহবতে থেকে তোমার শিষ্যও একদিন পীর হতে পারবে। আবার তিনি বলছেন যে, যে ব্যক্তি নিজে কী করলে প্রভুকে পাবে তা জানে না, সে কী করে অন্যকে প্রভু পাবার উপদেশ দিতে পারে? যে নিজেই জানে না যে, সে কি নরকে যাবে, না বেহেস্তে যাবে।

যুক্তি, কথা আর আইনের যেখানে কবর সেখানে শুরু হয় প্রেম-ভালবাসা, যাকে ভক্তিও বলা হয়। এই ভক্তি নামক বিষয়টি কিন্তু প্রভু দর্শনের প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। এই ভক্তিকেই বলা হয় এখলাস তথা পূর্ণ আন্তরিকতা তথা টোটাল সিনসিয়ারিটি। এই ভক্তির মাধ্যমেই মনের সকল বাসনা সিদ্ধ হবে তথা প্রভুর দর্শন লাভ হবে। এই একমাত্র ভক্তির উপর নির্ভর করতে পারলেই সব রকম এবাদত-বন্দেগি সফল হতে পারে। এই ভক্তির প্রবল শক্তিতেই সামান্য তৃণকুটা পর্যন্ত পর্বতের মত উঁচু মনে হবে এবং মনের নানারূপ উদ্ভট কল্পনাগুলো দূর হয়ে যাবে। একমাত্র ভক্তিতেই পাপ আর অনুশোচনার জ্বালাগুলো আপসে দূর হয়ে যাবে এবং পাষাণ পাথরকেও বিরাট কিছু মনে হবে। এই ভক্তির শক্তি এতই প্রবল যে, তকদিরের লিখন তথা ভাগ্যের মধ্যে যা স্থির হয়ে আছে তা-ও বাতিল করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তকদিরের লিখন পর্যন্ত বদলিয়ে দেওয়া হয়। খাজা বাবা যাকে বলেছেন যে, আশেকের ভক্তির কাছে মাশুক স্থির থাকতে পারে না এবং জালালি হাল পয়দা হয় এবং আশেক যা চায় মাশুক তাই দিয়ে ফেলে। কারণ, মাশুক তখন আশেকের ভক্তির কাছে মহান দাতারূপে দণ্ডায়মান হয়। ভক্তির বিপরীত হল অভক্তি। অভক্তির চরিত্র ভক্তির ঠিক উল্টোটা। একটা আকষণ আর একটা বিকর্ষণ। দুটোর রূপ, ধরন এবং গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। ভক্তির আকর্ষণ যেমন বানানো যায় না বরং আপনা হতেই আসে, তেমনি অভক্তির বিকর্ষণও বানানো যায় না। বরং নিজের মর্জির উপর ভর করে আসে। উভয় স্থলেই যুক্তির সেতুবন্ধন তৈরি করতে অক্ষম। আফ্রিকার অধিবাসী হজরত বেলালের মহানবী মোহাম্মদ (আ.)-এর গুণাবলি কতটুকু আকর্ষণ করার শক্তি থাকতে পারলে উমাইয়ার নিষ্ঠুর চাবুকের আঘাতেও বিকর্ষণ আনতে পারে নি, বরং আকর্ষণের প্রবলতা আরো বেড়ে গেছে। অথচ মহানবী মোহাম্মদের (আ.) পরম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আবু লাহাব, আবু জাহেল এবং আরো অনেকেই সেই মহান গুণাবলি মোটেই আকর্ষণ করতে পারে নি বরং বিকর্ষণের ভয়াবহতার চিত্র ফুটে আছে ইতিহাসের পাতায়। সুতরাং আকর্ষণ আর বিকর্ষণ কোনটাই যুক্তির ধার ধারতে চায় না। বরং আপনা হতে ফুটে উঠে। অভক্তি এমনই একটি মারাত্মক বিষয় যে, নির্জলা সত্যকেও সে বলপূর্বক মিথ্যা মনে করবে। কিন্তু কেন? এর উত্তর থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তাই বাবা জান শরীফ বলেছেন, 'অভক্তিতে মিথ্যা হয় সত্য গুরুজন।' সত্যগুরুকেও অভক্তির দরুন মনে হয় মিথ্যা। অবশ্য এই অভক্তির জন্ম হয় অহংকারের পেটে। অহঙ্কারী মনের আস্ফালন পাগলা ষাঁড়ের মত শিং দিয়ে অকারণেই মাটি খুঁড়তে চায়। সময় এবং পরিবেশের ধারা বজায় রেখে স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটে। একই মন এক সময় গরম, অন্য আর একটি সময় ঠাণ্ডা। এক সময় মনটি প্রেমিক, আবার অন্য সময় হিংসুক। দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের প্রকৃতি, কিন্তু একটি মনের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে। তাই ভক্তির স্থান প্রথমে। সম্পূর্ণ আন্তরিকতার নামই ভক্তি যাকে এখলাস বলা হয়। কথায় কথায় মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন যে, ভক্তিতে যদি মন সম্পূর্ণ ডুবে থাকে তাহলে ঘাসকে ভক্তি করলেও মুক্তি পাবে। কথায় কথায় বাবা জান শরীফ বলেছেন যে, পীর যদি ঘাসের মত মামুলিও হয়, তবু ভক্তির শক্তিতে মুক্তি পাবে এবং সেই ভক্তি কখনো বৃথা যেতে পারে না। বিষধর সাপ, যাকে সবাই ভয় করে, কারণ এর দংশন ডেকে আসে মৃত্যু, তবু সেই সাপের মাথায় মণি শোভা পায়। আর বিরাট মাটির তলায় কেন খনির অবস্থান, আর কাঁটাবনে কেন ফুলের শোভা, আর ভীরুর মাঝেই বা কেন আসল ধনটি পাওয়া যায়? পীর যার উপর তার অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কেবল সে-ই আল্লাহ্র রহস্য বুঝতে পারে। তখন সেই বিশেষ মুরিদের অবস্থাটি দুই দিক দিয়ে সমান হয় না। দুনিয়ার মোহ-মায়া তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই রকম অবস্থাটিকে বাবা জান শরীফ তাঁর পুথির ভাষায় বর্ণনা করছেন এভাবে, 'হারামে হালাল তারে মদে দুধে পায়।' আপন পীরের প্রতি কতটুকু ভক্তি আর এখলাস থাকলে ভক্ত বলতে পারে যে, পীর যদি মৃত জীব ভক্ষণ করার আদেশ দেন তাহলে উহা ভক্তির সহিত খাবেন এবং যদি এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তিজনক ফতোয়া দেওয়া হয়, সেই ফতোয়া পরোয়া করার প্রশ্ন তো দূরে থাক বরং শত শত ফতোয়ার কেতাবগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পীরের বাক্যকে মেনে নেওয়া হবে। প্রত্যেক প্রেমিকের প্রেমের আইন-কানুন তার একান্ত নিজের। সুতরাং সমস্ত প্রেমিকের প্রেমের আইন কানুনগুলো কখনোই এক রকম হতে পারে না। যার যার প্রেম করার স্টাইল তার তার মনের মত হবে। স্টাইল এক রকম হয় না। সুতরাং আশেকান তথা প্রেমিকের মোজহাবে কেহ কারো নয়। তারপর বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন এই বলে যে, 'এই কথা লিখা চাই মছজেদ মন্দিরে-প্রেমপাশে সমতুল্য মোমিনে কাফিরে।' প্রেমিকের প্রেমদৃষ্টির মধ্যে খণ্ডতার প্রকাশ ঘটে না বরং অখণ্ড এক মহান দৃষ্টির দর্শনে সবাইকে করে নেয় এক। দুই এবং বহুর দৃষ্টি তখন নেয় চিরবিদায়। হোক সে ভাল অথবা মন্দ সেটা তলিয়ে দেখার মানসিকতা আপনিই যায় হারিয়ে। মহান এক বিরাট এককের মহাসমুদ্রে সব কিছু তখন লীন হয়ে যায়। প্রেমের বিশাল গাছটির সব ডালায় তখন কোকিল ডাকে, শ্রান্ত পথিক ছায়াতলে নেয় একটু বিশ্রাম, আর গাছের গর্তে আশ্রয় নেয় বিষধর সর্প। তারপরের কথাটি আরো সাংঘাতিক এবং একদম উলঙ্গ। যেন সমস্ত দেহ জুড়ে এক খণ্ড বসন থাকা তো দূরের কথা একটি সুতোও না রেখে সোজাসুজি বলছেন বাংলার বিখ্যাত পীরে কামেল বাবা জান শরীফ শাহ

সুরেশ্বরী, 'মুসা ইছা হবে কিবা শেষ পয়গম্বর–ফেরেঙ্গি ও মগ হেথা এক বরাবর।' যিনি সত্যিকার প্রেমিক এবং প্রেমই যার একমাত্র মূলমন্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার বন্ধনগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছেন, কেবল তাঁরই কাছে সবাই সমানভাবে গ্রহণীয়। তাঁর কাছে হজরত মুসা (আ.), হজরত ইসা (আ.) এবং হজরত মুহাম্মদ (আ.) এ রকম ভাবে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার রসুলেরা সবাই এক, একক এবং অখণ্ড। তাদের মাঝে তিনি ভাগ করে দেখতে পারেন না। ভাগ করে দেখার খণ্ডিত দৃষ্টির মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। তাই তিনি সবাইকে এমনভাবে দেখেছেন যেমন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আগুনগুলো আলাদাভাবে প্রতীয়মান হলেও আসলে এবং মূলতঃ একই আগুন। আগুনকে ভাগ করা যায়, কিন্তু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে আগুন এক, একক এবং অখণ্ড। তাই প্রেমের শরাব যিনি পান করতে পেরেছেন তিনি তো আপন স্বকীয়তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ এই প্রেম-শরাবের প্রচণ্ডতা কতখানি হতে পারলে নিজের আমিকে, আমিত্বকে, ইগোকে, খুদিকে এবং হাস্তিকে হারিয়ে ফেলে মহা-আমির মহাসাগরে একাকার হয়ে যায়। তাই ফারসি ভাষার রচিত কোরান *মসনভী*-তে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন, *'জুমলা মাশুক আস্ত আশেক পরদাহি–জিন্দা মাশুক আস্ত আশেক মুরদাহি'*। অর্থাৎ 'সবই প্রেমিক, প্রেমিকা হল একটি আবরণ মাত্র আর জীবিত প্রেমিকা তো মৃতের মত।'

তারপর বাবা জান শরীফ বলেছেন, 'নিজ সনে চিন তারে' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে চিনতে হলে, জানতে হলে কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নিজেকেই চিনতে হবে। অন্য কোথাও নয়। এমনকি এক ভুবন তো দূরে থাক বরং আরো দুটো ভুবনও যদি সঙ্গে যোগ করে নাও তবু আল্লাহ্‌র দর্শন পাবে না। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রকৃত ও আসল পরিচয়ের স্থানটি যে কেবল তোমারই মাঝে বিরাজ করছে। মাওলা আলী তাই বলেছেন, *হাজাল্ কুরানু সামিতুন্ ওয়া আনাল্ কুরানু নাতিকুম* অর্থাৎ 'এই কোরান তো কথা বলে না, আর আমি হলাম জীবন্ত কোরান'। কাগজের পাতায় লিখিত কোরান তো সত্যিই কথা বলতে পারে না, কেবল কথা বলতে পারে এক একটি জীবন্ত কোরান। তাই তো কোরান নিজেই বলছে যে, 'পবিত্র না হয়ে কেহ কোরানকে ছুঁইতেই পারে না।' সেই জীবন্ত কোরানের আর এক নাম মাওলা আলী। তোমার মাঝেই লুকিয়ে আছে আল্লাহ্‌র পরিচয়। সেই পরিচয়ের পরিচিতির মিলন কেমন করে পাবে? বাবা বু 'আলী শাহ্ কলন্দর সেই পরিচয়ের কথাটি বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন–তা-*তুই ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু–চু' নাবাশি ইয়ারে বাশাদ ইয়ারে তু।* অর্থাৎ 'যে পর্যন্ত তোমার তুমিটি থাকবে সে পর্যন্ত তুমি মাশুক (প্রেমিক)-কে পাবে না। যখন তোমার তুমিটি আর থাকবে না কেবল তখনই তুমি আল্লাহ্‌কে পাবে।'

তাই মহানবী বলছেন, *আল্ ইনসানু সির্‌রি ওয়া আনা সির্‌রুহু* অর্থাৎ 'মানুষ আমার রহস্য এবং আমি মানুষের রহস্য'। তাই তুমিই যে তাঁর একমাত্র রহস্য সে কথা স্পষ্ট করে অনেকবার ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি চোখে দেখতে পান না তথা অন্ধ, তিনি যদি পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করেন তাতে কি আকাশের চাঁদ দেখতে পাবেন? দেখবেন না। কারণ, তিনি অন্ধ। অন্ধজনের পক্ষে আকাশের চাঁদ দেখা যেমন অসম্ভব, তেমনি নিজের অস্তিত্বের ভেতর ছাড়া আর কোথাও পই পই করে ঘুরলেও আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাবে না। তাই কোরান বলছে, *ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন।* অর্থাৎ 'আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, সুতরাং তোমরা কি দেখছ না?' মহানবী বলছেন, *আল্ ফাকরু ফাখ্‌রি ওয়াল ফাকারু মিন্‌হি।* অর্থাৎ 'আমি সন্ধানীর ভেতর এবং সন্ধানী আমার ভেতর' কোরানের সুরা হাদিদে আল্লাহ্ বলছেন, *ওয়াহুয়া মাআকুম্ আইনামা কুন্‌তুম।* অর্থাৎ 'তুমি যেখানে তিনিও (আল্লাহ্) সেখানেই আছেন।' মহানবী বলছেন, *লা ইয়াক্‌বালুল্লাহু তায়ালা ইবাদাতিল্ আব্‌দি বি গায়রি মারিফাতিল্লাহি তায়ালা ইন কানা আল্ ফাসানা।* অর্থাৎ 'মারেফতের জ্ঞান ছাড়া যদি কেউ হাজার বছর ইবাদত করে তবু তার সে ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হবে না।'

বাবা জান শরীফ বলেছেন যে, 'বায়ুর পাগল যে, অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার দরুন যে পাগল বলে সমাজে পরিচিত, তাকে কোনো কিছুর জবাবদিহিতা করতে হবে না বরং এমনিতে সে ক্ষমা পাবে। কিন্তু যিনি খোদার প্রেমে পাগল, তিনি কিন্তু ভয়ঙ্কর কালসাপের মত। কালসাপ যেমন দংশন করলে আর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগল যদি কোনো কিছু একবার বলে তাহলে সেই বলাটি আশীর্বাদই হোক আর অভিশাপই হোক না কেন, তার থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না। তাই মহানবী বলেছেন, *লা ইউফ্‌তা আলাল আশেকিন।* অর্থাৎ 'আশিকের উপর তথা আল্লাহ্‌র প্রেমিকের উপর কোনো ফতোয়াই নাই।' কোন প্রকার ফতোয়াই আল্লাহ্‌র পাগলদের উপর দেওয়া চলে না অর্থাৎ চলবে না। তবুও তো এত বড় মহান আদেশ থাকা সত্ত্বেও যুগে যুগে সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কত আল্লাহ্‌র পাগলদের উপর শরিয়তের কঠিন আইনের তলোয়ার চালিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সার মাস্তের মত বিখ্যাত আল্লাহ্‌র পাগলের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে ফতোয়ার দোহাই দিয়ে, যার মাজার শরিফের গেলাফ হতে শুধু করে সব কিছুই লাল রঙ দিয়ে সাজানো হয়েছে, অর্থাৎ রক্তবর্ণই তাঁর পরিচয়ের করুণ অথচ বোবা দিকদর্শনরূপে ফুটন্ত ফুলের মত ফুটে আছে। ফতোয়াদাতারা সে সময় হয়তো এত হাদিসের ভিড়ে *লা ইউফতা আলাল আশেকিন'* অর্থাৎ 'নাই ফতোয়া উপরে প্রেমিকের' হুবহু শাব্দিক অর্থ দিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে গেলেও নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নটির সম্মুখে মহানবীর এই মহাবানীটি আর মুখ্যরূপে দাঁড়াতে দেয় নাই, গৌণ নামক কাল অবগুণ্ঠনের ভেতর লুকিয়ে রাখাই সমীচীন মনে করেছে যুগে যুগে ফতোয়াবাজেরা। আর তারই পারিণতিতে আজকের মুসলিম নামধারীরা পতনের কোন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি তা কি সবাই কমবেশি বুঝেও বুঝতে পারছি না? ফতোয়াবাজেরা এই ধরনের হাদিসগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যে কত ডিজাইনের কসরত দেখাতে পারলেন তার ইতিহাস খুবই চমৎকার। হাদিসের বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি ফস করে আবিষ্কার করে ফেলেন। আর কী! ফরমান জারি করা হয়, এটা দুর্বল হাদিস। এ রকমভাবে কত

হাজার হাজার হাদিসকে যে দুর্বলতার কলঙ্কের মালা গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সত্যিই দুঃখজনক। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে এবং সাম্যের সমর্থনের হাদিসগুলোর উপর দুর্বলতার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কাঠ মোল্লাদের মস্তিষ্কের ফসল দিয়ে মহানবী মোহাম্মদ (আ.)-কে মাপতে গিয়ে কত ভুল বুঝাবার জঘন্য পথ তৈরি করে রাখা হয়েছে! সার মাস্তের মত আল্লাহ্‌র পাগলকে হত্যা করার পর হতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শুরু হয়েছে বললে হয়তো ঐতিহাসিকেরা হাসবে। তা হাসুন, কিন্তু এই হাসির পেছনে একটি গভীর বেদনার ছাপ কি চোখে ধরা পড়ে না? হয়তো পড়ে, আবার হয়তো পড়ে না। কারণ, পতনের ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতার পেছনে সার মাস্তের অবিচারটি আল্লাহ্‌র দরবারে হয়তো ফরিয়াদ চেয়েছে। আল্লাহ্‌র পাগলদের অবস্থা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণে মাপতে গেলে দেখতে পাই একটি করুণ ছবি। ছোট্ট একটি সংসারের সব রকম মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, সব কিছু ফেলে মাশুকের প্রেমের স্মরণে প্রতিটি নিঃশ্বাস ফেলে সান্নিধ্যের অদম্য আশার আকাঙ্ক্ষায়। মাশুকের প্রেমে কতই না অস্থির, অথচ উপর হতে বুঝবার উপায় নেই। স্থূল চোখের চাহনি কি অন্তরের কথা বুঝতে পারে? পারে না। তাই বেহুঁশ আলেম শরিয়তের তীর নিক্ষেপ করে বলে এই পাগলেরা কাফের। হায় রে অক্ষর-পরিচয়-পাওয়া আলেমের দল! অক্ষর শিখেই এত বড় জোশ আসে, অথচ এরা যদি প্রেমের বিদ্যার কিছুটাও পেত! কিন্তু প্রেমের বিদ্যা বুঝবার শক্তি এদের নেই। খোজার পক্ষে রমণীর প্রেমলীলা যেমন বোঝা খুবই মুস্কিলের বিষয়, সে রকম এরাও মাশুকের প্রেম কাকে বলে বুঝতে পারে না। মানস তথা নিয়ত ছাড়া যদি সাধন করা হয় তবে সেই সাধন বিফলে যাবে। আমরা উভয়ে একই পাত্র, একই ভাণ্ড। তুমি এবং আমি উভয়ে একই মাটির ভাণ্ড এবং সব ভাণ্ডতে একই জল মেলে। আবার সেই জলের পেটেই আছে স্থূল এবং স্থূলের পেটে আছে জল। আর সেই জলের মধ্যে আছে মাশুক তাঁর সমস্ত গুণাবলি নিয়ে, যেমন একটি শস্যদানার মধ্যে শস্যের সব রকম গুণাবলি মওজুদ থাকে। মানস ছাড়া সারা জীবনের সাধন বিফলে যাবে। তাই খাজা বাবা বলেছেন, *খাওয়াহিকে রাখম বানিদার্ বেহারা মান বানগরমান আয়না ওয়েম ও সিত্ খোদা আজ মান।* অর্থাৎ 'যদি তুমি খোদার মুখ দেখতে চাও তা হলে আমার চেহারার দিকে তাকাও। আমি তার আয়না, সে আমা হতে আলাদা নয়।'

বাব জান শরীফ বলছেন, 'নকলেতে জুদা জুদা ভিন্ন ভিন্ন তায়-আসলেতে ভিন্ন পদ হইবে কোথায়?' যেটা প্রকৃতই আসল উহা মূলত এক এবং অভিন্ন। কিন্তু যেটা নকল সেটা কী করে এক ও অভিন্ন হতে পারে? পারে না। কারণ, নকল সব সময় আলাদা হয়ে থাকে এবং ভিন্ন তথা পৃথক হওয়াটাই নকলের চিত্র। তাই বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন, আল্লাহ্ আল্লাহ্ গোফতে আল্লাহ্ মিশাওয়াদ–ইশখুনকায় বাত্তর মরদম শাওয়াদ। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতে আল্লাহ্‌তে মিশে একাকার হয়ে যায়–সাধারণ মানুষ কি এ কথাতে বিশ্বাস করতে পারে?'

বিনা মানসে সাধনা যে বিফলে যাবে তার ইংগিত পাই মহানবীর বাণীতে, *মাল্লা শায়খু লাহু ফি শায়খিশ শয়তান* অর্থাৎ 'যার পীর নাই তার পীর শয়তান।' বাবা জান শরীফ *নূরে হক গঞ্জে নূর* নামক পুথিতে বলেছেন যে, 'আউজ পড়িতে হয় শয়তান কারণ-দাগা দিয়া নষ্ট যেন নাহি করে মন।' অর্থাৎ 'আমি আশ্রয় নিচ্ছি অথবা আশ্রয় সন্ধান করি কিন্তু একা নই বরং আল্লাহ্‌র সহিত।' কিন্তু কার থেকে এই আশ্রয় চাওয়া? শয়তান হতে। সেই শয়তান কেমন? পাথরের আঘাত খাওয়া তথা প্রস্তরাহত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র সহিত আশ্রয় চাইছি। এই শয়তানই হল সব রকম দুঃখ-যাতনা ভোগের একমাত্র কারণ, আর এই শয়তানই নানা রকম ধোঁকা দিয়ে মনের একাগ্রতাকে নষ্ট করে দেয়। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র বাধার দেয়ালই হল এই শয়তান। এখন শয়তান কী? শয়তান বলতে কী বুঝায়? মানুষের আমিত্বটাই হল শয়তান। 'আমি এবং আমার' এটাই হল শয়তানের চরিত্রগত মূলকথা। 'আমি এবং আমার' এই ভাবধারার দেশে বাস করার নামই হল জাহান্নাম। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকার নাম জান্নাত। 'আমি এবং আমার' যে যত বেশি এই ভাবটি প্রকাশ করবে সে তত বেশি জাহান্নামের গভীরে বাস করে। মুখে মুখে শয়তানের ধোঁকা হতে আশ্রয় চাইলেই আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভ করা যায় না। 'আমি ও আমার'-কে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে কুরবানি দিতে হয় এবং এরূপ কুরবানির নামই হল ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এই কুরবানি হতে সরে থাকলে বা থাকতে চাইলে উহা হয় 'আমার'-ধর্ম। আল্লাহ্‌র ধর্ম নয়। সমস্ত কোরানের সমস্ত আদেশ নিষেধগুলো 'তা আউজ'-এর জীবন দর্শনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মাত্র। শয়তানকে পাথরের আঘাত খাওয়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণিত বলা হল কেন? এই পাথর বা মাটি হল বস্তুজগতের চিহ্ন। 'আমি ও আমার' সব সময় বিষয়-সম্পত্তির চিন্তার আঘাত খেতে থাকে এবং একদিন মৃত্যুই এর ইতি টেনে আনে। আল্লাহ্‌র মহান আশ্রয় খুঁজে নেবার খেয়ালটুকু ভুলিয়ে দেয় এই শয়তান। এই শয়তান বাইরের কোন প্রাণী বা জীব নয়। ইনসানে কামেল তথা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের আপন নফস তথা চিত্তবৃত্তিগুলো কম না হয় বেশি শয়তান। সহজে প্রকৃতির মধ্যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেই সহজ প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে হবে এবং তারপরই এক বিরাট মহান অস্তিত্বের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। যে মহান অস্তিত্বের সত্তাটি নিজের মধ্যেই বীজরূপে লুকিয়ে থাকে। বীজ যেমন একটি পরিপূর্ণ বৃক্ষের সব রকম গুণাবলি নিয়ে অতি ক্ষুদ্রাকারে বিরাজিত, তেমনি আপন অস্তিত্বের মধ্যেও সেই আকাঙ্ক্ষিত বিরাট মহান সত্তাটি লুকিয়ে থাকে। এই বিরাট মহান সত্তাটিকে বাইরে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। উহাকে খুঁজতে হবে নিজের মধ্যে নিজেকেই। মানুষ আপন স্বভাবের মাঝেই পরিপূর্ণ, তাই সে তার নিজের পরিচয় কী তা জানে না। 'মানুষ' হওয়া বলতে কোনো একটি নির্ধারিত পরিণতিকে বুঝানো হয়নি। কারণ মানব শিশুর জন্য সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠা তত সহজ কথা নয়। কিন্তু পশু-প্রাণীকে কোন প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি, যে রকম স্বাধীনতা ভোগ করে একটি মানুষ। তাই সিংহ বা হাতির বাচ্চা প্রকৃতির নিয়মেই সিংহ বা হাতি হয়ে উঠবে এবং এ জন্য এদের কোনো প্রকার সাধনা করতে হয় না। প্রকৃতির সব কিছু হতেই মানুষ যে আলাদা এবং আলাদা একটি সত্তা আছে এটা সে সহজেই বুঝতে পারে। সদ্যোজাত মানব শিশুটি অবশ্য একটি প্রাণীর মত এবং

বাইরের জগতের সঙ্গে তার যে একটি ব্যবধান আছে সেটা সে তখন বুঝতে পারে না। বাইরের জগতের সঙ্গে যখন আঘাত আসে তখনই সে একটি খুব হাল্কা ধারণা বুঝতে পারে। সেই আঘাত হতেই এবং শরীরের বেদনার অনুভবের মধ্য হতেই ধীরে ধীরে বুঝতে পারে 'আমার-তোমার' বিষয়টি এবং এ রকমভাবেই পূর্ণতার মধ্যে এসে মানুষ বুঝতে পারে তার আলাদা সত্তা এবং এই পৃথক সত্তাই জন্ম দেয় আমিত্ব, অহংকার বোধ, 'আমার, আমার', ইগো, খুদি, হাস্তি। এই 'আমার, আমার' নিজের মনের ভাবটিকে জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়ে দেয় এবং এটাকেই বলে আত্মপ্রীতি যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় 'নার্সিসিজম'। বাবা জান শরীফ তাই বলেছেন যে, আউজু নামক মন্ত্র বলে শয়তান নামক প্রতিকূল শক্তিকে নিজের অনুকূলে বা নিজের বশে আনা যায় না। সংশয় জেগেছে তাঁর মনে, তাই তিনি অকপটে বলে দিলেন সবার মনের লুকানো সত্য কথাটি। যে নিজের মধ্যে নিজেকে চিনতে চেষ্টা না করে পৃথক শক্তিকে পৃথকভাবে চিনতে চায় এবং পৃথকভাবে চেনার জন্য ইবাদত করে, সে ধর্মের কিছুই জানে না এবং বুঝেও না। এবং এরাই হল জ্ঞানী নামধারী কলঙ্কজনক অজ্ঞ এবং জ্ঞান প্রচারকের নামে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানী, এবং এই প্রকারের অজ্ঞানীদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি এই জন্যই বলছি যে, অধিকাংশ মানুষ এই রকম অজ্ঞানীদের দ্বারা প্রচারিত ইসলামকে ধরতে গিয়ে দড়িকে সাপ মনে করে বার বার বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে এবং হবে। ইসলাম ধর্মটি যে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (আ.) হতে শুরু হয়নি, বরং প্রথম মানব হজরত আদম (আ.) হতে ইসলাম ধর্মের শুরু হয়েছে তার একটি দুটি নয় বরং ভুরি ভুরি প্রমাণ কোরান হতে পরে দেওয়া হবে। অবশ্য সবচেয়ে ভাল হত সমগ্র কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে বইয়ের আকারে প্রকাশ করলে। এ জন্য অনেকের অনুরোধ এবং পরিশেষে বকুনি খেতে হয়েছে আমাকে। তাই হয়তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকলে শুরু করবো। যাক, বাজে কথা বাদ দিয়ে এখন বিষয়টিতে আসা যাক। আউজুর পুরো বাক্যটি বার বার পড়ার পরও যখন দেখা গেল যে, শয়তান তো যাওয়া দূরে থাক বরং বহাল তরিয়তেই বিরাজ করছে, তখনই কিছু বুদ্ধিমান মানুষের মনে লেগেছে প্রচণ্ড সংশয় এবং তাদের অহং-বোধের মাঝে একটা সংকট এসেছে দুর্ভিক্ষের মত। কোরানের এই বাক্যগুলো বার বার পড়ার মাঝে তারা আত্মরক্ষার একটি বর্ম খুঁজতো। কিন্তু এই বর্মটি কাজে লাগছে না, খসে যেতে লাগলো এবং এরই ফলে নিজেদেরকে অসহায় মনে করতে লাগল দারুনভাবে। কইতেও পারছে না, অথচ ভেতরে ভেতরে এর অসারতা ভালভাবে বুঝতে পেরে তুষের আগুনের মত জ্বলছে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হয় একাকী। কেউ ধার ধারতে চায় না। আউজু বাক্যটি পড়লে তো শয়তান দূর হচ্ছে না বরং পাগলের সাঁকো নাড়া দেবার মত আরো প্রবল বেগে তেড়ে আসে। শয়তান বলে ওঠে, কেমন তোমার আউজু এবার দেখবো। কারণ এরকম মন্ত্রে শয়তান দূর হয় না বলে শয়তান নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া তোমাদের আউজুতে যদি শয়তান ভয় পেত তাহলে নামাজ পড়ার সময় শয়তানের ধোঁকায় পড়তে হতো না এবং শয়তানের ধোঁকায় মনটাকে নামাজের মধ্যে না রেখে এদিক সেদিক করে কত বিষয় হতে বিষয়ন্তরে ঘুরানো হত না। সত্যিই তো! শয়তানকে যে তাড়ানো যাচ্ছে না। তাহলে কী করলে শয়তান পালাবে? প্রশ্ন জাগে। তাই মানুষ যখন তার যথার্থ স্বরূপকে জানতে পারে, নিজেকে চিনতে পারে, আপনার ভেতর আপনাকে বুঝতে পারে, তখনই মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ, যে তার নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে চিনতে পেরেছে। মানুষকে তার সত্য স্বরূপকে চেনবার এবং জানবার জন্য নিজের নফসের ভেতর অনুসন্ধানের তাগিদ দিয়ে গেছেন কোরান ও হাদিসের সমগ্র বাণীগুলোর বিভিন্ন বাচনভঙ্গির বিভিন্ন ধাপে ধাপে আর বিভিন্ন শৈলী এবং স্টাইলে। নফসের ভিতর যে বীজরূপে রূহ-এর অবস্থান উহার পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় বিকশিত রূপকে বলা হয় রব তথা প্রতিপালক তথা বিধাতা তথা এক কথায় আল্লাহ্। তাই বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন, *আগর গরদি তুদর তৌহিদে ফানি–বাহাক্‌কে ইয়ারী বাক্‌কী জেন্দেগানী।* অর্থাৎ 'তৌহিদ সাগরে যদি আপনাকে নির্বাণ (ফানা) করে ডুব দিতে পার–তাহলে জীবনভর মাশুক আল্লাহ্‌তে অবস্থান করবে।'

বাবা জান শরীফ পুথির একদম সাদামাঠা ভাষার গাঁথুনি দিয়ে তুলে ধরেছেন একটি অতি অপ্রিয় উলঙ্গ সত্য কথা আর সেই কথাটি হল, 'মাদ্রাসা পাস করে কেহ নবী হন নাই।' অবশ্য কোরানুল করিমও বলছেন যে, উম্মীদের থেকেই নবী বানানো হয়েছে। বিদ্যাশিক্ষা করা নবী এবং অলীর জন্য একমাত্র মানদণ্ড নয়। এই বিদ্যাশিক্ষার মানদণ্ডের পাল্লায় ফেলে কিছুসংখ্যক বিদ্বান অলী হবার সংজ্ঞা দিতেও সামান্য লজ্জা ও বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলেনি। বরং এ রকম একখানা খাসা সংজ্ঞা দিয়েছেন যে সহজ সরল মানুষেরা সহজেই ধোঁকায় পড়বে। অলী হবার সেই সংজ্ঞাটি হল : কোরানের তফসির এবং কিছু মাসলা-মাসায়েলের হাদিস জানতে হবে। অলী হবার যোগ্যতা যেন কমপক্ষে কোরানের অনুবাদ ও অর্থ করার এবং ব্যাখ্যা দেবার এবং বিশেষ করে ফেকাহের ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। কোরানের বিশেষ করে কোন তফসিরটি পড়তে হবে তারও নসিহত করা হয়েছে। কোরানের সেই নসিহত মার্কা তফসিরটির নাম হল *তফসিরে জালালাইন।* বাহ্‌বা, কী সুন্দর উপদেশ! একটা বস্তাপচা পুরনো তফসির, যার মধ্যে শত শত মনগড়া কথার বস্তা পাওয়া যায়, সেই তফসির না পড়লে অলী হওয়া যাবে না এবং অলীর সংজ্ঞা দেওয়াটা এখানেই থামিয়ে দেওয়া হয় নি বরং মসলা-মাসায়েল জানবার জন্য *সরহে বেকায়া* নামক মসলার বইখানাও পড়তে হবে এবং হাদিসগুলোর মধ্যে কমপক্ষে *মেশকাত শরীফ* পড়া একজন অলীর জন্য অবশ্য কতর্ব্য তথা ফরজ। কী বাক্কা উপদেশ! *না রাহে গা দুধ না জমে গা দধি*, দুধও থাকবে না আর দইও জমবে না। বাহ্ কেয়া বাত! এই সব মহাপণ্ডিতেরা অলী হবার অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়ে সমাজের বহু উপকার করেছেন এবং করছেন। তাদের এই উপকারের নমুনা যেন সত্য নামক মাছ ধরার জন্য জিজ্ঞাসার জাল বিদ্যার পুকুরে ফেলে সত্য নামক মাছটি জিজ্ঞাসার জালে না উঠে কেবল উঠে আসছে এইসব মহাপণ্ডিতদের কতগুলো

মাথার বিকৃত খুলি। এইসব সংজ্ঞা দেওয়া অলীর কাছে ইলমে মারেফতের 'ম'-ও পাওয়া যায় না। এ রকম মার্কা অলী দিয়ে আসল অলীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যুগে যুগে কম অপমান করা হয় নি, যেমন অপমান করে চলছি যুগে যুগে কিছু সংখ্যক কাঠমোল্লা দিয়ে মহানবীকে বিচার করে। অপমান করে চলছি যুগে যুগে যাজক দিয়ে যিশু খ্রিস্টকে বিচার করে। অপমান করে চলছি যুগে যুগে পাণ্ডা পুরোহিত দিয়ে বিচার করে কৃষ্ণ আর মহাদেবকে। অপমান করে চলছি যুগে যুগে কিছু ভিক্ষু দিয়ে বিচার করে গৌতম বুদ্ধকে। অপমান করে চলছি খাদেম দিয়ে যুগে যুগে খাজা বাবাকে। আর? এই রকম সংজ্ঞা দেওয়া অলী দিয়ে আসল অলীকে। কিন্তু যারা প্রকৃতই আসল অলী তাদের এ রকম বিদ্যা শিক্ষা করার উপদেশ দেওয়া যেমন হাস্যকর তেমনি উদ্ভট। কেবল এই আসল কথাটুকু বাবা জান শরীফ জানিয়ে দিতে বাধ্য হলেন, কারণ বিভ্রান্তিমূলক কথার আবর্জনার স্তূপ কাগজ আর কালিতে কম ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই সোজা ভাষায় বলেছিলেন, কোন নবীই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে নবী হননি। যাতে আসল সত্যটি বুঝতে পারি এবং আসল অলীকে চিনে নিতে পারি তারই জন্য ফাইন আর্টের কয়টি তুলির আঁচড় দিয়ে একটি বোবা সত্যকে বুঝিয়ে দেবার মত বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। অথচ আশ্চর্য! এদের তথাকথিত মধুর এবং তিক্ত উপদেশের হলাহল নিতে হয়েছে। সমাজের জন্য এদের অশ্রুবিন্দু একটি দুরূহ ব্যাধি–একোয়ার্ড ইমমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এই অশ্রুবিন্দু তাদেরই মনের দুরারোগ্য পীড়া। এরা রচনা করে ধর্মের নামে অখাদ্য কথার মালা এবং অযথা বিলাপ করে মরে অলীর নামে নকল অলীর বর্ণনায়। সবচেয়ে ছোট যে জ্ঞান তার নাম হল সততা, আর এই সততার প্রতি এদের ভয়ানক রকম বিরাগ আর ঘৃণা থাকে। এদের চোখের চাহনি থাকে পিছনের দিকে। এক আদিম ঘন অন্ধকারের দিকে। এবং এদের উপর কেউ সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এরা মহাপাপ বলে চিৎকার করে উঠে। এদের একমাত্র ইচ্ছটাই হল যে মানুষেরা এদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে মেনে নিক এবং যারা এদেরকে সন্দেহ করে তাদের সেই সন্দেহটিকে অভিযুক্ত করা হোক একটি মহাপাপের অপরাধে এবং দণ্ডটির নাম হোক 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' তথা ধরণী হতে চিরবিদায়। আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের জন্য তৈরি করছেন ভক্তি, ঘৃণা, সুখ আর দুঃখ। মহান আল্লাহ্ তাঁর মহান ইচ্ছাকে কাজে লাগাবার জন্যই তৈরি করেছেন মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী চেতনা। আর এরা হল এই মহামূল্যবান চেতনাটির বিদ্বেষী। এরা বুঝতে চায় না যে জীবন চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়? মৃত্যুকে প্রতিদিন খুঁজে কাছে চলে আসছে আমাদের দেহে বাস করা সত্তাটি এবং একদিন আত্মবিলুপ্তির কালো ঘোমটায় আপন সত্তাটি হারিয়ে যাবে। বিলুপ্তি চায় না কোনো সত্তা। আকাঙ্ক্ষা আর কামনা বিচিত্র দেয়াল দাঁড় করায়। তবু সত্তা একদিন প্রচণ্ড আঘাত হেনে যায় পালিয়ে। আমার এতগুলো বাজে কথার উপদেশ জানি এদের টলাতে পারবে না বরং বাঁকা চোখে তাকাবে এবং একটি হিংসার হুঙ্কার বোমার মাঝে ভয়ঙ্কর শব্দের চরিত্র নিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। তবু এটুকু বলতে চাই যে, আপনারা আসল অলীর কাছে আসবার সেতুতে কোনদিন পা রাখতে চাইবেন না, বরং সেতুটি উড়িয়ে দেবার নব ডিনামাইট আবিষ্কারেই থাকবেন ব্যস্ত। ধর্মীয় প্রচণ্ডতা আর প্রতিহিংসায় ভালবাসার স্তনে দুধ জমাট বেঁধে যায় একটি কাঁপা অজানা ভয়ের শিহরণে। এই বোবা স্তব্ধতায় মিলে থাকা দুটো ঠোঁট খুলতে দাও। কম্পিত ওষ্ঠে সাহস দাও কিছু উচ্চারণ করতে। আর যদি সেই উচ্চারণে থেকে যায় ভীত আড়ষ্টতা, মোলায়েম লজ্জা, তাহলে স্নেহের পরশে একটু মাথায় হাতে বুলিয়ে দাও।

কোরানে খুব বেশি হলে দুই কি তিনবার বারণ করেছে খেতে। সেটা কী? মদ, মরা পশু এবং শূকর। তাও আবার একটি 'কিন্তু' লাগিয়ে দিয়ে বারণ করা হয়েছে। সেই 'কিন্তু' আবার কী? যদি জীবন-মরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হও তাহলে খাওয়া যাবে। কিন্তু শত শত বার বারণ করে দেওয়া হয়েছে শোষণ করতে, জুলুম অত্যাচার করতে এবং পরের হককে অস্বীকার করতে এবং এই হক অস্বীকারের প্রশ্নে কোন প্রকার কিন্তু-টিন্তুর নাম-গন্ধটির ও চিহ্ন নেই। এই মহান গুণটির প্রতি আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ আর এই প্রতিহিংসা একটি ভয়ানক বিষয়। কোরানের এই শত শত বার বর্ণিত গুণটি যুগে যুগে ধ্বংস হয়ে যায় প্রতিহিংসার জ্বলন্ত আগুনে। কত পরিশ্রমে গড়ে ওঠা কত সভ্যতা যুগে যুগে হারিয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর অনলে। হিংসার এই সর্বনাশা আগুন যাদের মনের গর্তে চোরের মত লুকিয়ে থাকে তারাই ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে ওঠে বিরাট বিষধর সর্পে আর এদের বিষাক্ত ফণার ছোবল বিষাক্ত দাঁত বসিয়ে দেয় মানবতার হৃদপিণ্ডে। গোরস্তানের সারি সারি উঁচু করা মাটির কবরের মত এই পৃথিবীর কত সুন্দর সভ্যতা হারিয়ে গেছে, যার চিহ্ন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করে কত রকম গবেষণায় থাকি মশগুল। তবু শিক্ষা নেই না। মানি না কোন মহৎ উপদেশ।

আমিরুল মুমিনিন খলিফা উমর ফারুক, যিনি পৃথিবীর একটি বিরাট ভূভাগের ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি কেমন করে দেড় হাজার বছর আগে চাকরকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে রশি ধরে টেনে নিয়ে গেছেন? আজকের দিনে আমরা কি সেটা মুসলমান হয়েও কল্পনা করতে পারি? পারি না। মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরায়। একটু চিন্তা করে দেখলাম যে, একটা সরকারি বড় পদে চাকরি করছি, আচ্ছা আমি কি আমার পিয়নকে উটের উপর বসিয়ে রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারবো? সত্যিই কল্পনা করতেও শিহরণ জাগে এই চাকুরিজীবীর দেহমনে। আমার 'আমি' একটি অহংকার। অতিক্রম করতে হবে এই অহংকারী 'আমি'-কে। যে মুহূর্তে আমি আমার অহংকারী 'আমি'-কে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবো সেই মুহূর্তটিই হবে আমার পরম এবং চরম মুহূর্ত। আমি কি নিজেকে এ রকম করে ভাবতে পারবো না যে, আমি বন্যার স্রোতে ভাসমান একখণ্ড কাঠ। যারা ধরতে পারে তারা আমাকে ধরে নিক। ঘৃণ্য আরাম আয়েশের কাঠ হয়ে আর থাকতে চাই না। আরাম আর বিলাসিতার বুকে লাথি মেরে, একশত তিন তালির জামা পরে, উটের রশি ধরে, চাকরকে উটের পিঠে বসিয়ে যেদিন জেরুজালেম গিয়েছিলেন সেদিনের সেই অভাবনীয় দৃশ্য অবলোকন করে শত শত মানুষ মুগ্ধচিত্তে ইসলামকে করেছিল উষ্ণ

আলিঙ্গন। আর আজ আমরা মুসলমানরা? সামান্য কিছু সাহাবা নিয়ে মহানবীর জয়যাত্রা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আর আজকের শত কোটি মুসলমান? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকেই খুঁজে বার করতে হবে। আজও জানি না এই প্রশ্নটির কী উত্তর হবে। মনে হয় খুব সোজা। কিন্তু যাহা খুব সোজা উহাই সবচেয়ে বেশি কঠিন। সেই কঠিন প্রশ্নটির উত্তর কবে পাব জানি না। তবে যে বাতাসকে আমরা দেখতে পাই না সেই বাতাসের প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখে অনেক সময় চমকে যাই। কারণ, বড় বড় দালান কোঠাও উপড়িয়ে ফেলে দিতে দেখেছি। বোবা বাতাসের বুকে লুকিয়ে থাকে এত প্রচণ্ড শক্তি যার প্রতিফলন দেখে হতবাক হতে হয়, যখন ঝড়-ঝঞ্ঝার দানবীয় শক্তির ছোবলে বিষাক্ত চিহ্ন রেখে যায়। উম্মী মহানবীর নিরক্ষরতার বিশাল পর্বতের ভেতর যে জ্ঞানের উ[illegible]গীরণ সেটা পর্বতের মাথা ফেটে অগ্নুৎপাতের বিস্ময়কেও হার মানায়। সেই জ্ঞানের আলোর ভাষা না থাকলেও ভাষার শব্দগুলো আপনিই তৈরি হয়ে যায়। ব্যাকরণের দুয়ারে 'বলাকা' শব্দটি না থাকলেও তৈরি হয় আপন নিয়মে। উম্মীর রহস্য খুলতে হয় বাঁধাধরা কথা দিয়ে নয়, বরং আপনার ভেতর আপনাকে খোঁজার সাধনার একটি নির্মল শুদ্ধ সাধনার আন্তরিকতায়। কমপিউটার আবিষ্কারের সাধনায় হিসাব মেলাবার অনেক নতুন আগাম তথ্য পেতে পারেন এবং এভাবে বিজ্ঞানের প্রতিটি ধাপে নতুন নতুন তথ্য আশা করতে পারেন, কিন্তু এগুলো দিয়ে আপনার মাঝে আপনাকে চেনা যায় না–এটা শুনতে ভাল না লাগলেও নীরব মুহূর্তের অপ্রিয় কথা। কারণ, যা কিছু পৃথিবীকে দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে নীরবতার নিঝুম পরিবেশের লেবরেটরি হতে। এমনকি আমাদের আগমনের প্রথম সূচনাটিও।

হতে পারি নানা বিষয়ের বড় বড় বিদ্বান, কিন্তু অধিকাংশই আমরা বিবেকের জ্ঞানের প্রশ্নে বন্য মহিষ। বন্য মহিষ লালসার অসভ্য দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকে জলাভূমির গজিয়ে উঠা সবুজ ঘাসের প্রতি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ থাকে জলাভূমির কাদা মেশানো জলের মাঝে সমস্ত দেহটা ডুবিয়ে দিয়ে নাক দুটো উচু করে হুস্ হুস্ শব্দ করে সভ্যতার জয়গানে কৃত্রিম সমর্থন দেওয়ায়। মহানবীর নিরক্ষরতার ঢাকনি খুলে অসীম রহস্যে নির্বাণ (ফানা) করে দাও আপনার 'আমি' নামক একটি রহস্যের বিন্দু। মিশে একাকার হয়ে যেতে দাও বিন্দুটিকে মহাসিন্ধুতে। যার জন্ম ঐ রহস্যের মহাসিন্ধু হতে তাকে পুনরায় সেখানেই যেতে দাও। এবং বুঝতে দাও যে, সে আদিতেই নারায়ণ নামক নূর হতে আগমন করে এখন নর-নারায়ণ, তথা ওয়াজ্‌হুল্লাহ, তথা আল্লাহ্‌র চেহারা, তথা বান্দানেওয়াজ। মুসা কালিমুল্লার মত চিৎকার দিয়ে বলতে দাও : *'আনা আউয়ালুল্ মুমিনিন'* তথা 'আদিতেই আমি মুমিন ছিলাম'। তারপর হতচেতন হয়ে না হয় পড়ে থাক এই ধরনীতলে। 'খারবা মুসা সুজ্‌জাদা'-এর মত। বাবা জান শরীফ এই সুন্দরতম দর্শনটি বুঝবার আহ্বান জানিয়েছেন পুথির পুরনো ভাষায়। আবার বলছেন তিনি 'এক দীপে শত দীপ আলো পায়–এক দানায় শত দানা গাছ তায়।' অর্থাৎ একটি প্রদীপ হতে অনেক প্রদীপে একই আলোর শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রদীপ অনেক রকম হতে পারে, আকারে প্রকারে এবং গুণের বিভিন্নতায়। কিন্তু সবাই ধারণ করে আলো, একই আলোর শিখা। অনেকের মধ্যে এক, আবার একের মধ্যে অনেক এবং চরম সত্যের প্রশ্নে একেরই প্রকাশ এবং একেরই বিকাশ। বিভ্রান্তির ঢেউগুলো আছড়িয়ে পড়ে একটি স্মৃতির একটি আঙ্গিনায়। স্মৃতির এককতায় শৃঙ্খলার আইন আপনিই ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি খাওয়া ভেঙে পড়া দালান-কোঠার মত। জটিলতার জন্ম হয়। একের সন্ধানে স্মৃতি হাত বাড়ায়, কিন্তু না পেয়ে বহুর মধ্যে ডুবে যেতে হয় মনের একান্ত অনিচ্ছায়। তখন বুঝতে পারি না অথবা বুঝতে চাই না যে সবগুলো প্রদীপে একই আলোর শিখা জ্বলছে।

নোংরামির স্থূলতার জমটুপি বিবেকের চোখ দুটো ঢেকে দেয় বলেই তো একই মানুষের একই মনে রং ধরে দুই বিপরীতধর্মী গুণ । একটি গুণ শিক্ষা দেয় ত্যাগের, আর অপরটি শিক্ষা দেয় ভোগের। ত্যাগী ত্যাগ করেই পায় অনাবিল আনন্দ, আর ভোগী ভোগ করেই পায় তৃপ্তি। ফুল চিরদিন মধু বিলিয়ে দিয়েই পায় আনন্দ, আর ভ্রমর ফুলের মধু পান করেই পায় তৃপ্তি। ত্যাগী ত্যাগের কোলেই নেয় যেমন জন্ম, তেমনি আবার একদিন ঘুমিয়ে পড়ে চিরদিনের তরে ঐ ত্যাগেরই কোলে। ভোগী ভোগের কোলেই নেয় যেমন জন্ম, তেমনি আবার একদিন ঘুমিয়ে পড়ে চিরদিনের তরে ঐ ভোগের কোলে। কী বিচিত্র রং-মাখা খেলার নিপুণ শৈলী। কেউ হাসছে আবার কেউ হাসির পাশেই দাঁড়িয়ে কাঁদছে। যেমন, বিলাস-প্রাসাদের পাশেই পর্ণকুটীর। যেমন, মোটর গাড়ির থাকার ঘরের পাশেই ঘর খুঁজে না পাওয়া মানুষের নিশিযাপনের দংশিত বিবেকের ছবি। এখানে একটি প্রদীপ। আলো দিতে শিখায় নি মানবতার মাস্টার সাহেব। নিভা কোটি কোটি প্রদীপ আলোর আশায় ছুটছে আর সেই দৃশ্য উপভোগ করছে বন্য তৃপ্তির পৈশাচিক আনন্দের শিখা-ছড়ানো কিছু স্বার্থপর প্রদীপ। দুই কৃতদাসের মৃত্যুলড়াই দেখছে ফোম-আঁটা সোফায় বসে প্রাচীন গ্রিক রাজাদের প্রেস্‌টিজ রক্ষার অপূর্ব স্টাইলে। একটি প্রদীপ হতে শত প্রদীপকে আলো দাও। একটি শস্যদানায় শত শস্যদানা গজিয়ে উঠতে দাও–একটি উদাত্ত উদারতার সার্বজনীন ডাক দিচ্ছেন বাবা জান শরীফ। আপনার মাঝে যিনি আপনার রবের পরিচয় জানতে পেরেছেন সেই পীরে কামেল গুরুর নির্বাণ প্রদীপ হতে যখন শিষ্যের প্রদীপে আলোর শিখা জ্বলতে থাকে তখন? তখন কোটি কোটি নিভা দীপ আলোর শিখায় বিশাল চমক ছড়ায়। কিন্তু সাবধান! সেই আলোর আশায় মন্দিরে যেও না। মন্দিরে সেই আলো পাবে না। তবে কোথায় পাবে? পাবে গুরু নামক এই মাটির গর্তে।

দেহ নামক এই মাটির গর্তেই আলো জ্বলছে। সুতরাং সমাধান এখানেই পাবে। অন্য কোথাও নয়। চোখ দুটো বন্ধ করে দেখ, তুমি আঁধারের স্পর্শ পাবে। তেমনি এই মাটির দেহের ভেতরই দেখতে পাবে আল্লাহর নূরের জ্যোতি। কাগজের কোরানে খুঁজে যার দেখা তুমি পাবে না, তাকেই পাবে বাতাসে তথা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যন্তরে। সুখস্বর্গে যাকে পাবে বলে মনে করছ, অবাক হয়ে দেখবে তাকে নরকে। আবার উল্টোও হতে পারে। যেমন দুঃখের দহনেই যাকে সব সময় পাওয়া যায় বলে মনে করে আসছ, তাকে পাচ্ছ সুখের মাঝে।

সেই সুখটির চরিত্র কিন্তু সাধারণ সুখের মত নয়। প্রেমের আগুন যার ভেতর নরকের অনলের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে, সেই নরকজ্বালার মাঝেও সে পায় চিরসুখ। তাই তো বলছি, প্রভুর মাঝে প্রভুকে পাবে না, কিন্তু সেই প্রভুকে পাবে আপন পীর ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবার কাছে। আবার আর একটু না হয় খুলেই বলছি, আপন পীর ও মুরশিদের কাছেও পাবে না। তাহলে পাব কোথায়? অবাক হয়ে প্রশ্ন করাটা এখানে খুবই স্বাভাবিক।

সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রভুকে আর কোথাও পাবে না, পাবে একমাত্র নিজের মধ্যে। কী অপূর্ব শৈলীতে রহস্যটি তুলে ধরেছেন বাবা জান শরীফ! কোথায় তোমার নিজের দেহটি দেখছ? এটা কি তোমার দেহ? আপন পীরের ধ্যান-সাধনায় যে দেহের ভেতর দেখতে পাচ্ছ সেই দেহটি আর পীরের দেহের মাঝে কি আর কোন দুই থাকতে পারে? খোলা চোখে যদিও দেখতে দুইটি দেহ, কিন্তু আসলে একের মধ্যে লীন হয়ে একাকার হয়ে গেছে। দুটো পাত্রের ভিন্ন জল এক পাত্রে রাখলে যেমন একাকার হয়ে যায়। একেরই খেলা চলছে এই জগতময়। তাই তো আবার একদম খুলেই বলতে হচ্ছে যে, এই দেহেরই মাঝে বাস করছে মন এবং সে রকমভাবে মনের মাঝে বাস করছে একটি ধন এবং ধনের সন্ধান পাবার একমাত্র চাবিটির নাম হল স্মরণ তথা জিকির তথা নামজপ। নিজেকে ভুলে যাবার জন্যই তো স্মরণ এবং সেই ভুলে যাবার মধ্যেই নিহিত আছে রহস্যের মূল বিষয়টি, আর সেই মূলের প্রথম রহস্যের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। আর অনেক দূরে অগ্রসর হলে তো *'আনাল হক', 'আনা সুবহানি মা আজমুশানি'*, 'লাইসা *ফি জুববাতি সেওয়া আল্লাহ্‌তায়ালা'* বলে ফেলার মত হবে।

বাবা আবু বকর অয়াসতী বলেন, 'যখন নিজের সহিত বিয়োগ তখন রবের সঙ্গে যোগ হয় এবং তখন আর নামজপ থাকে না বরং দর্শন হয়।'

মহানবী বলেন, *'মান্ রানি ফাকাদ্ রাআল্ হাক্কা'* অর্থাৎ 'যে আমাকে দেখলো সে অবশ্য সত্যকেই দেখলো।'

মহানবী বলেন, *'আল্ মুমিনিনা* (আমানু বলা হয়নি) *মিরাতুল মুমিনিন'* অর্থাৎ 'এক মুমিন অপর মুমিনের আয়না।' এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ করার বিষয়টি হল এই যে, এক আমানুকে অপর আমানুর আয়না বলা হয়নি। অথচ প্রায় অখাদ্য মার্কা কোরানের ব্যাখ্যায় আমানুকে অনুবাদে মুমিন বানিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মনে বিভ্রান্তির অতি সূক্ষ্ম ধোঁকা দিয়ে চলছে আজও। এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানময় বুকের উপর দাঁড়িয়ে কে চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে? কে বিদ্রোহের কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করবে যে, কোরানের এত মিথ্যা, বানোয়াট আর মুনাফেকি ব্যাখ্যাগুলোকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হোক? এই আবর্জনার স্তূপে আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছি। একে অপরকে ফতোয়া দিয়ে খুন করা কর্তব্য বলছি। যে ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, যেই ধর্মের দর্শনকে দাঁড় করানো হয়েছে : *'লা ইক্‌রাহা ফি দ্বীন'* 'নেই বল প্রয়োগ ধর্মের মধ্যে'-কে 'ইন্না ইক্‌রাহা ফি দ্বীন' 'অবশ্যই বল প্রয়োগ আছে ধর্মের মধ্যে'-তে। ওহাবি মতবাদের গুরুঠাকুর, নজদের ফেৎনা, আবদুল অহাব নজদির লিখিত বইগুলো পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ইসলামের কত বড় মারাত্মক শত্রুতা করে গেছে সে। এই সেই আবদুল অহাব নজদি, যে তওহিদের বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে না পেরে যা মনে লেগেছে বদ্ধ পাগলের মত তাই লিখে গেছে, আর তারই ভয়াবহ পরিণতি সবাই কমবেশি দেখতে পাচ্ছি।

মহানবী বলেন, *'কুলবুল মুমিনিনা আরশুল্লাহ্'* অর্থাৎ 'মুমিনের (আমানুর নহে) কাল্‌ব (তথা হৃদয়) আল্লাহ্‌র সিংহাসন।'

বাবা হাকিম তিরমিজি বলেন 'যে ব্যক্তি দাসত্বের বিষয়ে মুর্খ সেই ব্যক্তি প্রভুত্বের বিষয়ে অধিকতর মুর্খ।'

বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেন, 'আমি রবকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার দিকে পথ কীরূপ?" তিনি বললেন, "আপনার আমিত্ব ভাব ছেড়ে দাও, আমার নিকট আসতে পারবে।"'

আত্মার দেহ নেই, তাই আত্মার আকারও নেই। কিন্তু বিনাশশীল সকল দেহতেই তিনিই আছেন। তাই যিনি আমাদের এই অন্তরে আছেন, তিনিই সর্বস্থানেও আছেন। সুতরাং উভয়ই এক। তাই তিনি বহুবচন। আমরা-র মধ্যে আমি, আবার আমি-র মধ্যে আমরা। নামের মধ্যে আছে এক বোঝা কথা, আর কথার মালা গেঁথে তৈরি হয় এক একটি বাক্য আর এগুলো তো আসে মন হতে। সমুদয় আদেশ-উপদেশের বিধান হচ্ছে কতগুলো শব্দের ঝুড়ি। তাই নাম বা মন্ত্রের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। একমাত্র আল্লাহ্‌ই সর্বশক্তির মূল। সুতরাং এই মূল নামক আল্লাহ্‌কে যিনি পেয়েছেন তিনি মৃত্যু এবং সর্বপ্রকার যাতনা হতে মুক্ত, তাই মহানবী বলেন, 'আলা *ইন্‌না আওলিয়াল্লাহে লাইয়ামুতু* অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অলীর মৃত্যু নেই'। সুতরাং মানুষের মনে যতদিন আত্মাভিমান থাকবে ততদিন দুঃখ-যাতনা হতে তার মুক্তি নেই। নিজেকে সব কিছু হতে ভাল জানবার যে মনটি, সেই মনটিতে থাকে আত্মাভিমান এবং আত্মাভিমানের জন্ম হয় অবিদ্যা থেকে। আর এই অবিদ্যাই হল মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞান হতে আসে অনেক প্রকার শোক, দুঃখ আর যাতনা। এই রকম অবিদ্যাই হল পাঁচ ইন্দ্রিয়জালে আটকে পড়া মায়া। এই মায়ার দেয়াল ভাঙতে না পারলে রব রূপের দর্শন হয় না। এই দেয়ালের অস্তিত্ব সবচাইতে হাল্কা এবং ধারালো, যাকে রূপক ভাষায় পুলসিরাতের পুল বা সেতু বলা হয়। সুতরাং মায়ার দেয়াল ভাঙার সাধন করার নামই হল নিজেকে জানবার জ্ঞান। আর বাহিরের জগতকে জানবার যে পথ সেটাকে বলে বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানের যে পথ উহার শেষ হল বহির্বিষয়ক জ্ঞান। মানুষ তার আত্মকেন্দ্রিকতা হতে মুক্ত হতে চায়, প্রকৃতির নিয়মের রহস্যগুলো আবিষ্কার করে। সুতরাং দুটো জ্ঞানকে পাশাপাশি দাঁড় করালে দুটোই চায় মুক্তি, যদিও দুটো দুদিকে ধাবিত। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বিজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের ধর্মটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই বলেছেন এবং একে অপরের পরিপূরক বলে বিশ্বাস করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যক্তির আত্মপ্রীতিতার (নার্সিসিজম) গোড়ায় বিবর্তনবাদের জনক ডারউইন যে ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছেন তাতে অনেকে যেমন বিস্মিত হয়েছে, তেমনি ক্ষোভ প্রকাশ কম করা হয়নি। অবশ্য একদম নূতন কিছু গ্রহণ করতে প্রত্যেক যুগের মানুষ হিমশিম খায়। এটা মানুষের এত কালের ইতিহাসের একটি দুঃখজনক

ঘোষণা। ভাষা শিক্ষা করাটাকে একদিন বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ডেকে আনার অজুহাত তুলে বিবি তালাকের ফতোয়া শুনতে হত, কিন্তু নাকি কান্নার সেই ফতোয়ার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। লাউড স্পিকারে কোরান পড়া এবং আজান দেয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেবার স্মৃতি আজও মন হতে মুছে যায়নি। তারপর গা-সহা হয়ে যায় কিছুদিন পর। ফটো তোলা, গানবাদ্য করার উপর এখনো ফতোয়ার তরবারিটি ঝুলে আছে যদিও দুই এক পুরুষ গত হবার পর যারা আসবে এই মর্ত্যে তারা হাসবে দাদুদের এই প্রকার ফতোয়া দেবার কথা শুনে। যেমন আজ আমরা ইংরেজি পড়ার উপর ফতোয়ার কথাটি শুনে হাসি।

বাবা জান শরীফ বলতে চাইছেন যে, প্রকৃতপক্ষে খোদা-দর্শন হল আপনার মাঝে আপনার দর্শন লাভ করা। নিজের ভেতরেই সবকিছুর মূল রহস্য নিহিত আছে। তিনি অন্যস্থানে তাই এই কথার সমর্থনে বলেছেন যে, যদি কেউ আমাকে নরকেও ফেলে দিতে ইচ্ছা করে তাতে আমার ভেতর যে বেহেস্ত তৈরি হয়ে আছে তা নষ্ট করে দিতে পারবে না। যে কোনো রকম পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যেই ফেলে দেওয়া হোক না কেন, আমার বেহেস্ত আমার সঙ্গেই আছে এবং থাকবে। আমার দেহতে আঘাত হানতে পারবে, কিন্তু আমার ভেতর যে রূহানি শক্তি সেই শক্তিকে মারতে পারবে না। তাই যারা আপনার ভেতর আপনার সত্যসুন্দর রূপটি আছে বলে বিশ্বাস করে না, তারাই বিশ্বাস করে টাকাপয়সা আর ধনদৌলতকে এবং বিশ্বাস করে কতগুলো উদ্ভট চিন্তাধারার স্রোতকে, যা কেবল পাকের মধ্যে ফেলে দিয়ে দিশেহারা করে তুলে। এবং এরাই হয় আরাম বিলাসী পাঠক এবং তুখোড় বক্তা।

নবী ও রসুল সম্পর্কে আলোচনা

বিশ্বজগতের আসল বিষয়গুলো জানবার ইচ্ছাটি আধুনিক নয় বরং প্রাচীন। প্রাচীনকালের একদল গ্রিক দার্শনিক হতে এর শুরু বলে জানতে পারি এবং এই প্রচেষ্টা কেবল গ্রিসের দার্শনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং অন্যান্য স্থানেও একই চিন্তাধারার দার্শনিক মতবাদ প্রাচীন কালে কমবেশি গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এ রকম চিন্তাধারাকে 'ডিডাকটিভ ওয়ে অফ থিংকিং' বলা হয়। বাংলাভাষায় এর অনুবাদ করতে গেলে বলতে হয় যে, এই চিন্তাধারাটি একশত হতে নিচের দিকে গুণে গুণে নেমে যাবার নিয়ম। বহির্বিষয়ক বিজ্ঞানের ভাবধারাটি এ রকম হলেও গবেষণার টেবিলে বসলে এই ডিডাকটিভ থিংকিং-এর তথা শত হতে গুণে গুণে একে নেমে যাবার নিয়মকে প্রায়ই বর্জন করতে হয় একান্ত বাধ্য হয়ে। তখন তারা গবেষণা চালায় 'ইনডাকটিভ ওয়ে অফ থিংকিং'-এর মাধ্যমে, তথা এক হতে গুণে গুণে শতকে পৌঁছবার চেষ্টায় এবং এই চেষ্টাকেই বলা হয় ইনডাকটিভ থিংকিং। আবার প্রাচীনকাল হতেই অনেক দার্শনিক বিশ্বজগতের আসল বিষয়গুলো জানবার চেয়ে বরং নিজের মধ্যে নিজেকে চেনার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। নিজের মধ্যে নিজেকে চেনার অর্থই হল স্রষ্টাকে চেনা। যদিও ইতিহাস বলে যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসই এই দর্শনের জনক; আসলে ইহা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ নিজেকে চেনার অর্থই স্রষ্টাকে চেনা-র দর্শনটি হল ইসলাম ধর্মের একমাত্র মূল দর্শন। যেহেতু ইসলাম ধর্মের শুরু হয় হজরত আদম হতে সেই হেতু গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস তো এই সেদিনের দার্শনিক, অর্থাৎ মাত্র আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের দার্শনিক। ইসলাম ধর্ম মহানবী হজরত মুহাম্মদ (আ.) হতে শুরু হয়েছে যারা বলতে চান তারা কিন্তু কোরানের দর্শনকেই পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে একটা গণ্ডিতে বেঁধে ফেলার সংকীর্ণ তৃপ্তির উল্লাস প্রকাশ করেন। ইসলামকে গণ্ডির জালে বাঁধা যায় না। কারণ, ইসলাম সার্বজনীন। সূর্যের আলো বিতরণ করার মাঝে কমবেশি থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামের আলো এতই উজ্জ্বল এবং বিতরণের প্রশ্নে সাংঘাতিকভাবে সাম্য দর্শনকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই তো কোরানুল হাকিমের চৌদ্দ নম্বর সুরা ইব্রাহিমের চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *'অমা আরসালনা মিররাসুলিন ইললা বিলিসানি কাওমিহি লেউ বাইয়িনা লাহুম।'* অর্থাৎ, 'এবং আমরা পাঠাই নি এমন একজন রসুলকেও তাঁর নিজের জাতির ভাষায়, যেন তিনি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দেন তাদের কাছে।'

কোরানুল মজিদের এই ঘোষণাটি সমস্ত পৃথিবীর মানুষগুলোকে চমকিয়ে দিয়েছে। এত বড় সত্য ভাষণ কেবলমাত্র স্রষ্টারই বাণী হতে পারে। কারণ পৃথিবীতে যতগুলো ধর্মগ্রন্থ আছে, কোরানের এই রকম স্পষ্ট ঘোষণাটির মত একটিও পাওয়া যাবে কি? হয়তো পাওয়া যেতে পারে, তবে অধম লেখকের জানা নেই। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা কিছুটা বিস্তারিত হওয়া উচিত মনে করি এবং ব্যাখ্যার সঙ্গে থাকতে হবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দর্শন।

কোরানুল আজিমের এই বাণীটিতে প্রথমেই একটি বিষয় লক্ষ করে দেখতে হবে, আর সেটি হল, কম করে হলেও একটি জাতির জন্য একজন রসুল পাঠানো হয়েছে এবং হয় এবং হচ্ছে। কারণ, বর্তমান সময়টি এতই সামান্য যে সব কিছুই আসবে এবং এসে গেছে এবং গিয়েছিলর মধ্যে ধরতে হবে। এখানে আরো লক্ষ করুন যে, নবী পাঠানোর কথা বলা হয়নি। কারণ নবুয়ত মহানবীর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বলা হয়েছে রসুল পাঠানোর কথা। রসুল হতেই রেসালতের কথা আসে। আর সেই রেসালত বন্ধ হয় না বরং সব সময় জারি রাখা হয়েছে। এখানেই রেসালত এবং নবুয়তের মধ্যে ব্যবধান। কিন্তু অধিংকাশ লোকেরা এখানে এসে সব গুলিয়ে একদম তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তৈরি হয় ভুলের পাহাড় এবং সত্যের উপর চাপা দিতে চায় শক্তিপ্রয়োগ করে। যেমন আপনি দেখতে পাবেন নফস এবং রূহ

উভয়কে আত্মা অনুবাদ করে তালগোল পাকানো হয়েছে। তৈরি হয়েছে ভুল এবং এই ভুলের মাশুল দিতে হয় পাঠক সমাজকে । এসব চিন্তার অখাদ্য খেয়ে খেয়ে বিবেকের মধ্যে আপনিই তৈরি হয় ছোট নজর। ছোট নজর হতে আপনিই গজিয়ে উঠে রং বেরং-এর অনেক ধরনের আজব আজব সাইনবোর্ড আর সেই সব সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হয় সবাইকে কম বেশি। রহস্য জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁর অবস্থান তিনি হলেন নবী। আর রহস্য জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে কেমন করে আপনাকে ফানা দিতে হয় এবং কেন্দ্রবিন্দুর কাছে সম্পূর্ণরূপে ফানা হতে হয়, সেই নিয়মগুলো জানবার পর কেন্দ্রবিন্দুর কাছে ফানা হতে পারেন যারা, তাদেরকেই বলা হয় রসুল। প্রতিনিধিকেই বলা হয় রসুল। খবর যিনি দান করেন তিনি হলেন নবী। আরবি ভাষায় খবরকে বলা হয় নাবা এবং এই নাবা শব্দটি হতেই নবী। সুতরাং নবীর মর্যাদার প্রশ্ন রসুল হতে অনেক উপরে। তাই প্রত্যেক নবী অবশ্যই একজন রসুল, কিন্তু প্রত্যেক রসুল একজন নবী নন। অতি উঁচু পর্যায়ের প্রতিটি অলীয়ে কামেল একজন রসুল অবশ্যই, কিন্তু নবী নহেন। কোন রসুলকেই আজ পর্যন্ত কোন সহিফা দেওয়া হয়নি এবং হয় না। কারণ ইহা স্রষ্টার আইনে নেই। *কোরান*, *ইনজিল*, *তৌরাত* এবং *জব্বুর* নামক সহিফাগুলো নবীর মাধ্যমে তথা উসিলাতে পাঠানো হয়েছে এবং এই নবীরা প্রত্যেকে আবার একজন রসুল। নবীর উসিলা ছাড়া আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান নামক উপাধি ধারণ করেও সোজাসুজি আকাশ হতে বইয়ের আকারে পাঠিয়ে দেননি, যদিও এই কাজটি আল্লাহ্‌র জন্য কিছুই নয়। তবু তিনি সব কিছু জেনে শুনে এবং সব রকম শক্তির একমাত্র মালিক হয়েও কেন যে উসিলার মাধ্যমে সহিফাগুলো পাঠালেন ইহাও একটি চিন্তার বিষয়। মারাত্মক চিন্তার বিষয়। গবেষণা করার খোরাক এবং অনেক কিছুর ইঙ্গিত রয়ে গেছে। মানুষ কোনো রসুলকে উসিলা করতে গেলেই ওহাবিরা শেরেক-বেদাতের খসবু পান, কিন্তু আল্লাহ্ কেন উসিলা গ্রহণ করলেন বলে প্রশ্ন করলেই কতগুলো গাঁজাখুরি তালগোল পাকানো লাবড়া-মার্কা বচন শুনিয়ে দেন। আর কতকাল দলীয় সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন? কোরান বলছে, 'রসুলান *নাবীয়া সিদ্দিকান নাবীয়া।'* অর্থাৎ রসুল নবী, সিদ্দিক নবী। প্রথমে রসুল তারপর নবী এবং প্রথমে সিদ্দিক তারপর নবী। আর একটি কথা হল, একমাত্র মহানবী ছাড়া অন্যান্য নবীগণ সবাই কিন্তু প্রথমে রসুল ছিলেন এবং পরেই নবী হয়েছেন। এখানেই মহানবীর একটি বিশেষ মর্যাদা বা শান, যা আর কাউকে দেওয়া হয় নি।

এই কথাগুলো এতই সূক্ষ্ম এবং জটিল যে এর ব্যবধান সবার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। স্বচ্ছ কাঁচের সামনে দাঁড়ালে নিজের ছবিটি হুবহু মনে হয় কিন্তু দুটোর মাঝে সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে যা ধরা সহজ নয়।

পৃথিবীতে যতগুলো জাতি আছে, তা সংখ্যায় যতই হোক না কেন, প্রত্যেক জাতির জন্য কম করে হলেও অন্তত একজন রসুল পাঠানো হয়েছে বলে কোরান ঘোষণা করেছে। এই রসুল পাঠানোর বেলায় আল্লাহ্ এক বচন ব্যবহার করেন নি। যতবার এই রসুল পাঠানোর ঘোষণা কোরানে আছে ততবারই তিনি 'আমরা'-রূপে পাঠিয়েছেন। এবং এই 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার আর একটি লক্ষণীয় বিষয়। তারপর বলা হয়েছে, যে জাতি যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় রসুল পাঠানো হয়েছে এবং হয়। কেন সেই জাতির ভাষায় পাঠানো হয়? এ জন্যই যে, সেই জাতি যেন আল্লাহ্‌র গুণাবলির রহস্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। তাই সেই জাতির ভাষায় সেই রসুল সব কিছু পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে যেন বুঝিয়ে দিতে পারেন। এখন প্রশ্ন এক জাতি পানিকে 'আব' নামক শব্দ দ্বারা বুঝতে পারে। আবার অন্য আর এক জাতি পানিকে 'ওয়াটার' নামক শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। এরকমভাবে যে জাতির যে ভাষায় পানিকে বুঝানো হয়েছে সেই ভাষায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাঙালি জাতির ভাষায় নাম যা-ই দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু জাতি হিসাবে সেই ভাষাটিতে একজন রসুল পাঠানো হয়েছে। বাঙালিরা যদি পানিকে জল নামক শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই রসুলকে জল অথবা এই জাতীয় একটি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। না হলে অন্য শব্দ ব্যবহার করলে বুঝতে কষ্ট হতে পারে ভেবেই কোরানের ঘোষণা দিতে হয়েছে। তাহলে প্যানিকে জল বললে বিজাতীয় বলে গালমন্দ করাটা কি নিছক পাগলামি নয়? তাহলে ফেরেস্তা, জিন, শয়তান, বেহেস্ত দোজখ ইত্যাদি শব্দগুলো প্রত্যেক জাতির আপন ভাষায় পাঠানো রসুলেরা নিশ্চয়ই প্রচার করে গেছেন। তাদের প্রচার করা শব্দগুলোকে কি বিজাতীয় দর্শন বলে গালমন্দ করাটা ঠিক হবে?

পৃথিবীতে ধর্মের নামে এই ভাষাকে কেন্দ্র করে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে এবং এখনো এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়নি। এই নোংরামিটাকেই সার্বজনীতার পোশাকে পৃথিবীর সবাই কমবেশি চালাবার কী পরিণতি হতে পারে তা বুঝতে পারি। একজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে অন্য জাতির মেলে না এবং না মেলারই কথা। এটা জেনে শুনেও এইসব *ঠুনকো* অনুষ্ঠানের রকমারি নিয়ে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। আরব জাতির লম্বা পোশাক আর বাঙালির ধুতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মের মূল নিয়ে ব্যবধানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, রসুল পাঠানো হয়েছে। তাই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোনো প্রকার উল্লেখ কোরানের কোথাও নেই। এর প্রধান কারণটি হচ্ছে যে, আচার-অনুষ্ঠানগুলো রচিত হতে হবে ধর্মের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। যেহেতু ধর্মের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আচার অনুষ্ঠানগুলো রচিত হতে হবে সেই হেতু এক এক জাতির এক এক রকম দেশীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো রচিত হতে বাধ্য। আবু লাহাব এবং আবু জাহেল কাফের হলেও লম্বা আরবি পোশাকই পরিধান করতো। তারা বাঙালিদের ধুতি কোনদিন পরিধান করেনি এবং করার প্রশ্নও উঠে না। সুতরাং ধুতি পরিধান করলেই ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল, আর লম্বা আরবি পোশাক পরলেই ধর্ম রক্ষা করা হয় বলে যারা মনে করে আসছে তাদেরকে কিছু বলার ভাষা জানা নেই। কারণ, তারা অনুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করে মনের শান্তি পায় এবং তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু যখন এই অনুষ্ঠানগুলো ভয়াবহ

খুনাখুনির রূপধারণ করে তখন এর প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের প্রশ্নটি আসতে বাধ্য। মানবজাতির বহু অকল্যাণ বয়ে এসেছে এই অনুষ্ঠানগুলোর পথ দিয়ে। অথচ সমগ্র কোরানের কোথাও কোনরূপ অনুষ্ঠানের উল্লেখ নেই। বাংলার মরমি সাধক বাবা লালন ফকির এই বর্ণিত কথাগুলো তাঁর গানের প্রতিটি লাইনে তুলে ধরেছেন এমনভাবে যে, অনুষ্ঠানিকতার মাথা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপরের প্রশ্নটি হল, এত জাতির এত রসুলের আগমন হয়েছে, অথচ তাদের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেবার এতগুলো প্রমাণ সবই হারিয়ে গেল? কত সাধারণ অথবা নামকরা লেখকদের লিখনি আজও হারিয়ে যায়নি, অথচ আল্লাহ্‌র পাঠানো এত জাতির এত রসুলদের সবকিছুই হারিয়ে গেল? আল্লাহ্‌র রসুলেরা হারিয়ে যান না, কারণ তাঁরা মরার আগেই মরে গেছেন বলে মৃত্যু তাদের স্পর্শও করতে পারে না। কেবল আমাদের স্থূল চোখগুলোকে মরে যাবার দৃশ্য দেখতে হয়, যেমন নাটক সিনেমাতে মরে যাবার দৃশ্য দেখে সত্যিই মরে গেছে বলে ভুল ধারণা পোষণ করতে হয়। নাটক সিনেমার মৃত্যুদৃশ্যগুলো একদম সত্যি বলে মনে হলেও উহা যেমন মোটেই সত্য নয়, তেমনি রসুলদের মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন করার মধ্যেও তারা মোটেই মারা যান না। তাহলে আল্লাহ্‌র পাঠানো এত রসুলদের এতো বাণীগুলো কেমন করে হারিয়ে যেতে পারে? অসম্ভব! তাদের বাণী হারাতে পারে না এবং কখনোই হারিয়ে যায় না। এমন একদিন আসবে যেদিন বস্তুর বিজ্ঞান প্রমাণ করবে যে তাদের প্রতিটি বাণী আজও ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ রকম আবিষ্কারে হবে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগে আগমন। কারণ বস্তুর বিজ্ঞানই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পেরেছে কিছু কুসংস্কার আর অন্ধ অযৌক্তিক অনুষ্ঠান।

এবার একটু মনোযোগ দিয়ে কোরানের কিছু বাণীর উপর গবেষণা করে দেখুন। দেখুন তো একটু লক্ষ করে যে, সমগ্র কোরানের মধ্যে একটিবারও কি বলা হয়েছে 'খাতামার রসুলান'? না বলা হয় নি। একবারের জন্যও আপনি পাবেন না । তা হলে কী বলা হয়েছে কোরানে? বলা হয়েছে 'খাতামান নাবী' অর্থাৎ নবুয়ত খতম। রসুল খতম কেন বলা হল না? কেন বলা হল নবী খতম? কারণ, নবুয়ত মহানবীর মধ্যে এসে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু রসুলের আগমন শেষ হয়ে যাবার কথা কোরানে একবারও বলা হয় নি। যদি বলা হতো তাহলে কিছুই বলার থাকতো না। যেহেতু রসুলের আগমনের বেলায় খতম শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি সেই হেতু রসুলের আগমন হয়েছিল, হয়েছে, হয় এবং হবে। কেয়ামত পর্যন্ত রেসালত জারি থাকবে। কিন্তু নবুয়ত মহানবীর মধ্যে শেষ বলে স্পষ্ট ঘোষণা করার কথাটি আছে। যদি আমার এই বক্তব্য ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার ভুল আমি শুধরিয়ে নেব এবং উপকৃত হব। আর যদি আপনার ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনি শুধরিয়ে নিন। আসুন আমরা একে অন্যের ভুলগুলো মহব্বতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শুধরিয়ে নেই। এতে কারো হার-জিত নেই। বরং আমরা সবাই লাভবান হব। তবে যদি ধর্মের সাইনবোর্ড কাঁধে রাখতে চান তাহলেও বলার কিছু নেই। কারণ এই সাইনবোর্ড ঝুলানোটাও একটি তকদির। আপনার তকদিরে যদি সাইনবোর্ড ঝুলানো থাকে তাহলে কেউ তা শত বুঝিয়ে নামাতে পারবে না। অন্তত এটুকু হলফ করে বলতে চাই।

তাহলে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস তো মাত্র আড়াই হাজার বছর আগের কথা। কারণ, যেখানে কোরানুল মবিন স্পষ্ট ঘোষণা করে দিল যে, এমন কোন জাতি নেই, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে, যে জাতির উপর রসুল অর্থাৎ পথ প্রদর্শনকারী পাঠানো হয়নি এবং এখানেই শেষ করে না দিয়ে বরং কোন প্রকার হেয়াঁলীর ধোঁকা যাতে মনের মাঝে বাসা বাঁধতে না পারে তার জন্য আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সেই জাতির নিজস্ব ভাষায় পাঠানো হয়েছে। কোরানের কথা অনুসারে প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে ভারতবর্ষে যে কয়টি ভাষা আছে সেই ভাষাগুলোর রসুলেরা কোথায়? যদি বলেন ভারতবর্ষে কোন রসুল পাঠানো হয়নি তাহলে কোরানের বেশ কয়টি স্থানে বার বার ঘোষণা করা কথাটি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। সেটা যে কারণেই হোক না কেন : নিজেদের সাইনবোর্ড রক্ষার তরেই হোক, অথবা সংকীর্ণ চিন্তাধারার প্রতিফলনেই হোক, অথবা মোনাফেকির তথা বর্ণচোরার লক্ষণই হোক। প্রত্যেক জাতিতে সত্যপথের দাওয়াত দেবার জন্য যে অবশ্যই রসুল পাঠানো হয়েছে, এ কথাটি কোরানের দশ নম্বর সুরা ইউনুসের সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালেকুল্লি *উম্মাতির রাসূল ফাইজা জা-আ রাসূলহুম কুদিয়া বাইনাহুম বিলকিস্‌তে ওয়াহুম লা ইউজ্‌লামুন।'*

অর্থাৎ 'এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসুল। যখন তাদের রসুল আসে তাদের মধ্যে বিষয়টি বিচার করা হয় ন্যায়পরায়ণতার সহিত এবং তাদের করা হয় না অবিচার।'

তারপর কোরানের ষোল নম্বর সূরা নহলের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *'ওয়ালাকাদ্ বা আছনা ফিকুল্লি উম্মাতির রাসূলান্ আনিবু দুল্ লা হা ওয়াজ্‌তানিবুত্ তাগুতা।'*

অর্থাৎ 'এবং সত্যসত্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রসুল পাঠাই, যাতে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং তাগুতবর্জন করে।

এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, এই 'তাগুত' শব্দটির অর্থ নিয়ে অনেক ঘাপলা হয়েছে। তাই এই 'তাগুত' শব্দটির শাব্দিক অর্থ এবং এর সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

তারপর কোরানের পঁয়ত্রিশ নম্বর সূরা ফাতিরের চব্বিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইন্না *আরসাল্‌নাকা বিল্ হাক্কি বাশীরাউ ওয়ানাজিরা ওয়াইম্‌মিন্ উম্‌মাতিন ইল্‌লা খালা ফিহা নাজির।'*

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা এবং সতর্ক কারীরূপে পাঠিয়েছি, এবং (এমন) একটি জাতিও নেই যাদের মধ্যে সতর্ক কারী পাঠানো হয় নি।'

তারপর কোরানের চৌত্রিশ নম্বর সূরা সা'বার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *'ওয়ামা আরসাল্না ফি কারইয়াতিম্ মিন্নাজিরিন ইল্লা কালা মুর্তাফুহা ইন্না বিমা উরসিলতুম্ বিহি কাফিরুন।'*

অর্থাৎ 'এবং আমরা লোকালয়ের মধ্যে এমন কোন সতর্ককারী পাঠাইনি কিন্তু সম্পদশালীরা বলত, "তোমরা যা কিছু সহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা অবিশ্বাস করি।"'

এই আয়াতের একটি শব্দের প্রতি খুব ভাল করে লক্ষ করে দেখুন। সেই শব্দটিতে একটি মারাত্মক ইঙ্গিত পরিষ্কার চোখে দেখুন। শব্দটি হল 'সম্পদশালীরা' অর্থাৎ সম্পদ যারা জমা করে তাদেরকেই লক্ষ করে কত বড় উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। সম্পদশালী হবার প্রতি কত বড় ঘৃণা নিক্ষেপ করা হয়েছে। কারণ, এই সমস্ত সম্পদশালীরা মানব সমাজের বুকে সব সময় মানবিক আহ্বানগুলো কেবল প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং দৃঢ়তার সাথে বাধা প্রদান করার যত রকম কলাকৌশল অবলম্বন করা যায় তা ব্যবহার করতে মোটেই লজ্জিত হয় না। তা হলে কোরানের দর্শনে সম্পদশালীদের স্থান কোথায়? নরকের জঘন্য কুটিরেই যে এদের অবস্থান হবে সেই কথা কি পরিষ্কার ভাবে বুঝায় না? তাহলে ব্যক্তিমালিকানায় সম্পদ জমা করার জঘন্য কথাটি কোরানের নামে কারা অপপ্রচার চালায়? তারা কি মুসলমান? তারা কি মুসলমানের মুখোশে মানবতার শরীরের রক্তশোষক? সমস্ত কোরান হতে মাত্র একটি আয়াত দিয়ে যদি সম্পদশালীদের পক্ষে সমর্থনের দলিলরূপে পেশ করে অধম লেখককে দেখাতে পারেন তাহলে বই লিখে পাঠকদের সামনে আর জীবনেও পরিচয় দেব না।

আর যদি একান্ত বাধ্য হয়ে আপনাকে বলতেই হয় যে, হ্যাঁ, ভারতবর্ষে রসুল পাঠানো হয়েছে এবং যতগুলো ভাষা ভারতবর্ষে আছে ততগুলো ভাষাতেই পাঠানো হয়েছে; তাহলে একটি ভাষার জন্য যদি কমপক্ষে একজন রসুলও পাঠানো হয় তবে কতজন রসুল পাঠানো হয়েছে? বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসে যারা পণ্ডিত তাদের কাছে থেকেই উত্তরটি আশা করতে চাই। তাহলে এতগুলো রসুল পাঠানো হল অথচ তাদের নাম জানতে চাইবো না, এটা কী রকম কথা? অবশ্য সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে উদার ও নিরপেক্ষ মনে জানতে চাইলে তেমন কষ্টের কারণ থাকতে পারে না।

এই আত্মদর্শনই যে খোদাদর্শন এ কথাটি আজকের নয়, এবং আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসেরও নয়; বরং প্রথম মানব হজরত আদম (আ.) হতে শুরু করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (আ.) হয়ে অনাগত কালের প্রতিটি মুমিন পর্যন্ত জারি থাকবে।

এই আত্মদর্শনের উপরই যার সমস্ত দর্শনের বইগুলোতে চাপা কান্নার বেদনাদায়ক আকর্ষণ এবং অভিমানের বিভিন্ন স্টাইলের মধ্যে প্রেমের পরশ মাখা, যা কেবল ভ্রমর দৃষ্টিই ধরতে পারে ফুলের পাতায় মধু ছড়িয়ে থাকাকে, সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক নিটশেকে নাস্তিক্যবাদের অপবাদে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। অথচ আল্লামা ইকবাল এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছেন যে, দার্শনিক নিটশের মত আস্তিক দার্শনিক এ ধরার বুকে খুব অল্পই জন্মেছে।

কোরান বলছে, 'তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য' রসুলকে পাঠানো হয়। তারা কারা? তারা হল সেই বিশেষ রসুলের স্বজাতি যাদের কাছে রসুল পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে যান পথ প্রদর্শনের জন্য। তাহলে এই রসুলেরা কি একটিমাত্র ধর্মেরই প্রচার করে যান নি? অবশ্যই একটিমাত্র ধর্মের কথাই প্রচার করে গেছেন। কী সেই ধর্মটির নাম? ইসলামই সেই ধর্মটির নাম এবং ইসলামই সকল রসুলদের প্রচারিত একমাত্র ধর্ম। প্রয়োগে অবশ্যই বিভিন্নতা আসবে। কারণ, এক জাতির চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রশ্নে অপর জাতির সঙ্গে বেশ কিছুটা অমিল থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। যত গণ্ডগোল বেঁধেছে এবং আজও বেঁধে চলছে একেক জাতির একেক রকম নিজস্ব প্রয়োগ-পদ্ধতিগত ব্যবধানের দরুণ। মূলনীতি অভিন্ন এবং ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা থাকবে এটা যারা মানতে চায় না তারাই এই পৃথিবীর মানব সমাজে সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে সংকীর্ণতার বিষবায়ু ছড়িয়ে দিয়ে কোন্দল, দলাদলি, হানাহানি এবং নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ে চলেছে এবং এরই ফলে 'মানবতা' হাসপাতালের শয্যায় বহু জটিল রোগে পীড়িত হয়ে ধুঁকে মরছে। পৃথিবীর মানবজাতি বুকভরা আশা নিয়ে এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ সেবন করে রোগমুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু মুক্তির বদলে বরং রোগের যন্ত্রণাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মের প্রয়োগ-ব্যবস্থার বিভিন্নতার ইতিহাস এ কথাই এ পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত রসুলের আগমন হয়েছে তাদের জ্ঞানের প্রবল প্রভাবগুলো মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ পূজনীয় হতে পারেনি, আর পারেনি বলেই দুর্ভাগ্যের অন্ধকার হতে মানবজাতি আজও পুরোপুরি মুক্তিলাভ করতে পারেনি। আর এরই ফলে মানবজাতির ললাটে সব সুন্দর আদর্শগুলো হয়েছে লাঞ্ছিত এবং মিথ্যা পঙ্গু আর বীভৎসতার চালবাজিতে ঢেকে যায় এবং মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলেই প্রচণ্ড আঘাত খেতে হয়। পৃথিবীতে যত ভাষায় যত রসুল পাঠানো হয়েছে তাঁরা একটিই ধর্ম প্রচার করে গেছেন। এক এক দেশের প্রচারের রূপ আলাদা হতে পারে এবং তা হতে বাধ্য, কিন্তু মূলনীতির প্রশ্নে গবেষণা করে দেখলে দেখতে পাবেন, সবার মাঝে একই মূলনীতির সুর। কয়েক হাজার বছর আগের প্রয়োগ-পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপত্র এবং মধ্যযুগের ব্যবস্থাপত্র আর আধুনিককালের ব্যবস্থাপত্র কখনোই এক এবং অভিন্ন হতেই পারে না। এই গরমিলটাকেই ধর্মের আসল বিষয় ভেবে গ্রহণ করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জটিলতা আর একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি। এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও ধর্মের নামে কম হয়নি। তারা যদি লক্ষ করে দেখতে চেষ্টা চালাতো তাহলে এতটুকু অবনতির দিকে ধাবিত হত না। তারা যদি বুঝতে পারতো যে, সব রসুলেরাই আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং এক আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিভিন্ন দেশ ও জাতির রসুলেরা একই মূলনীতি প্রচার করে গেছেন, তাহলে মানুষের ভাগ্যে এত অমঙ্গল নেমে আসতো না। বরং তা না করে সেই যুগের সেই পরিবেশকে অস্বীকার করে রসুলের সত্যতার উপর প্রশ্ন তুলতে এদের মন মানসিকতার বিকারগ্রস্ততার জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। এরা কোন

কিছুই বুঝতে চায় না। এমনকি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে চাইলেও এরা বুঝতে চায় না। এরা জেগে থেকে ঘুমের ভান করে, তাই শত ডাকেও সাড়া পাওয়া যায় না। অন্যকে কেমন করে ছোট করা যায়, কেমন করে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় সেই নোংরা গবেষণার উল্লাস প্রকাশ করে। অথচ অবাক হবেন, সেই উল্লাসটি প্রকাশ করে সার্বজনীনতার বিরাট সাইনবোর্ডখানা সামনে রেখে। অনেকটা খাসির মাথা সামনে রেখে ভেড়ার মাংস বিক্রি করার মত। আহা, কত বড় সার্বজনীন তারা! একবার এদের ভেতর ঢুকে দেখলেই বুঝতে পারবেন এদের নকশা নমুনাগুলো কেমন বাক্‌কা। কয়েক হাজার বছর পূর্বের রসুলদের সময় আপন ভাইয়ের সঙ্গে আপন বোনের বিবাহ দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ের কোন রসুল যদি মামির সঙ্গে প্রেম করে থাকেন তাহলে এ যুগের প্রথায় বিচার করে হেয় প্রতিপন্ন করা কি ঠিক হবে? এই কিছুদিন আগের পণ্যের বাজারদরের কথা নাতিদের কাছে বয়ান করতে গেলে দাদুদের কথা শুনে হি হি করে হাসতে থাকে। কারণ, এ যুগের সঙ্গে আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখেই তারা হাসে। তারা মনে করে দাদুরা গাঁজাখুরি গপ্পো ছাড়ছে। সত্যিই, এক যুগের সত্য ঘটনাগুলো আর এক যুগের মানুষের কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। কারণ, যুগের হিসাবে মিলাতে গিয়ে পায় বিরাট গরমিল। নীতি, আদর্শ আর ত্যাগের রূপ যুগের পরশে বদলাতে পারে, কিন্তু মুলনীতি কখনো বদলায় না। বিশ্বাসঘাতকতার রূপটি যুগের পরশে অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মূলনীতি চিরদিন বেঁচে আছে এবং থাকতেও পারে। নমরূদ, ফেরাউন, সাদ্দাত হতে নেমে এসে আবু জাহেল, আবু লাহাব হয়ে মীর জাফর পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি, থেমে যেতে পারে না। আজও এই আধুনিক যুগে কত রূপের বিশ্বাসঘাতক পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যেতে পারে, এই অপ্রিয় সত্য কথাটি কি অস্বীকার করা যায়? যায়নি, যায় না এবং যাবে কিনা আগামী দিনের ইতিহাসই সে কথা বলে দেবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রেরিত বহু জাতি বহু রসুলদের কথা জানতে হলে সেই যুগের সেই দেশের সেই পরিবেশের এবং সেই ভাষার মানদণ্ড সামনে রেখে গবেষণা চালাতে হবে এবং সেই গবেষণার সময়টিতে পক্ষপাতিত্বের দোষগুলোকে বর্জন করে হতে হবে একদম নিরপেক্ষ। মনের অজান্তে পক্ষপাতিত্বের সাইনবোর্ড কাঁধের উপর ঝুলতে দিলেই উহা আর সার্বজনীনতার রূপ না নিয়ে সীমিত চিন্তাধারার রূপ নিতে বাধ্য। অবশ্য এ রকম বিরাট মনের অধিকারী হওয়াও একটি বিরাট কথা। বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী এই আদর্শের কথা প্রচার করতে গিয়ে বলছেন, 'নবী অলি হক নামে হক জান তায়।' সমস্ত ভেদ বাক্য খুলেই তিনি এ কথা বলছেন। তিনি আরো বলছেন যে, আমার মাঝে যে আমিটি আছে সেটার রূপ কেমন? এই দুটি আমি মিলে হলাম দুজন। গুরুর আমি এবং আমার দুইটি রূপের আমি মিলিয়ে হলাম তিনজন। কিন্তু যখন চতুর্থ আমির মধ্যে আমার আগমন হয় তখন আর কোন আমিই থাকে না, তখন সবগুলো আমির অবসান হয় এবং তখনই কানাই হলাম অর্থাৎ সত্যের দেশে অবস্থান করতে সক্ষম হলাম। বোম্বের বিখ্যাত পীর বাবা হাজি মেলান্দ শাহ্ বিসমিলও এই একই কথা বলে গেছেন। তবে তাঁর ভাষার রূপ ও শৈলী অন্য রকম। তিনি বলেছেন যে, 'যখন চরম সত্যের দেশে এলাম তখন আল্লাহ্ এবং বান্দাকে দেখতে পেলাম না এবং এমনকি তোমাকে ও তাহাকেও দেখলাম না। যা দেখলাম তা কেবলমাত্র আমাকেই আমি দেখলাম।' বাবা জান শরীফ এবং বাবা হাজি মেলান্দ শাহ্ বিসমিল যে চরম রহস্যের কথাটি বলেছেন সেটা মহানবীরই কথা। মহানবী বলেন, '*ইন্‌লাল্লাহা খালাকা আদামা আলা সুরাতিহি।*' অর্থাৎ 'অবশ্যই আল্লাহ্ আদমকে আপন সুরতে তৈরি করেছেন।' আল্লাহ্‌র নিজের সুরতে যে মানুষটি, সেই মানুষটি কিন্তু সাধারণ মানুষ নন। এই রূপ অর্জন করাই সার্থক অর্জন। এই মানুষটি সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-বর্জিত মানব। আমিত্ব থাকলে সেই মানুষ আল্লাহ্‌র আকৃতি নয়। আমিত্বের কলুষিত পর্দাটি ফেলে দিতে পারলে কেবল তখনই হতে পারে আল্লাহ্‌র সদৃশ আকৃতির এবং এ রূপের মাঝে আল্লাহ্‌র রূপ ফুটে উঠে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যেক মহাপুরুষকে রসুল বলা হয়। নবী এবং রসুলদের মাঝেই আল্লাহ্‌র রহস্যময় নূরের বিকাশ এবং প্রকাশ পায়। কিন্তু একটা কথা এখানে ভাল করে মনে রাখতে হবে এবং সেই কথাটি হল যে, একজন নবী একজন রসুল, কিন্তু একজন রসুল একজন নবী নন। কারণ, নবুয়ত খতম। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেন, 'মরদানে *খোদাঘর খোদানা বাশদ–ওয়া লেকেন আজ খোদা জুদা না বাশদ।*' অর্থাৎ 'মানুষকে খোদা বল–মানুষ খোদা নয়, কিন্তু মানুষ খোদা হতে আলাদাও নয়।'

খাজা বাবা গরিব নেওয়াজ বলেন, 'সিফাত *ও জাত চু' আজ হাম খোদা নামি বেনাম–বাহার চেমি নাগরম্ জাজ খোদা নামি বেনাম।*' অর্থাৎ 'স্বয়ং (জাত) এবং গুণাবলি (সিফাত)-কে আলাদাভাবে আমি যখন রেখেছিলাম, তখন আমি যা-ই দেখি, খোদা ছাড়া আর কিছুই দেখি না।'

প্রেম, আত্মা ও প্রাণের বিষয়ে আলোচনা

বাবা জান শরীফ বলেন, 'এস্কের আগুন যার বুকের ভেতর–দোজখ তথা নহে কার্যকর।' কথাটি সহজ, কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলেই এর রহস্য খুবই সুন্দর। প্রেমের আগুন যার বুকের ভেতর জ্বলছে, অর্থাৎ এই আগুন কোনদিনও বাহিরে জ্বলে না। কারণ, বাহিরের আগুন চোখে দেখা যায়, কিন্তু ভেতরের আগুন অনুভব করা যায় এবং সেই অনুভবের বিষয়টিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠি দিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রেমের দহনকে বুঝা যায় না। যে প্রেমের আগুনে জ্বলছে সে-ই কেবল এর মর্ম বুঝতে পারে। অপরের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়। রোগযাতনা অথবা সর্পদংশনের যাতনা ভুক্তভোগীই বুঝতে পারে–এটা যেমন অতি সহজ কথা তেমনি প্রেমের প্রশ্নেও একই কথা। দোজখের আগুনও যেমন মানুষের মনটিকে জ্বালায় এবং মানুষ ও জিন জাতির মন ছাড়া দোজখের আগুন আর অন্য কিছুই জ্বালায় না। মনের ভেতর দোজখের আগুন বোবার মত প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জ্বলতে থাকলে মানুষ নিজেকে আত্মহত্যার সামনে ঠেলে দিতেও

কুণ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং প্রতিদিনের পৃথিবীতে কত শত মানুষ এই অন্তরের বোবা দহন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে তার কিছুটা নমুনা আমরা খবরের কাগজের মধ্যে পাই। কত বড় নিঠুর জ্বালা অন্তরের ভেতর জ্বলছে অথচ বাহির হতে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝবার উপায় থাকে না। কী অপূর্ব বিজ্ঞানময় কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত রেখে দিলেন আল্লাহ্। দেখতে পাই না, বলতেও পারি না, অথচ একজনের বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। বিশ্বাস করতে চায় না এই বিচিত্র মনটি, অথচ জোর করে বিশ্বাস করিয়ে দেয়। সুতরাং প্রেমের আগুনে যে জ্বলছে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দোজখের আগুনের কার্যকারিতা থাকতে পারে না। কারণ, প্রেম এবং দোজখ দুটোর আগুনই ভেতরের বিষয়। বাহিরের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র নেই। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ করার মত, আর সেটা হল উভয় দহনই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে ব্যক্তিই একাধারে যেমন মুখ্য তেমনি অন্যদিক দিয়ে বক্তিই গৌণ। অর্থাৎ ব্যক্তি তথা মানুষ ছাড়া এই উভয় প্রকার দহনের কার্যকারিতা নেই। কাঠখড় জ্বলার আগুন সবাই দেখতে পায়, কিন্তু মনের ভেতর এই যে আগুন জ্বলে সেটা দেখতে পায় সে-ই যে জ্বলছে। সুতরাং আসল রহস্যটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং জ্বলার দহনের প্রমাণ দেবার প্রশ্নটিও একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দোজখের আগুনের দহন যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক তেমনি বেহেস্তের সুখভোগও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দোজখের আগুনের দহন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাহিরে খোঁজা যেমন নিছক পাগলামি এবং বোকার স্বর্গে বাস করার মত, তেমনি বেহেস্তের সুখ সম্ভোগের আনন্দও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাহিরে খোঁজা নিছক পাগলামি এবং বোকার স্বর্গে বাস করার মত। সুতরাং স্বর্গ ও নরক বাহিরে নেই, বরং উহা মানুষের অন্তরেই বাস করে। সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়ে বাহিরে যারা আল্লাহ্কে পেতে চায় তারা পাগল অথবা বিকারগ্রস্ততার জটিল রোগে ভুগছে, অথবা শয়তানের চালবাজির গুটিতে পরিণত হয়ে ধোঁকা দেবার বিদ্যা প্রচার করে সাধারণ মানুষগুলোকে ধরছে। এই ধোঁকার ফাঁদটাকেই আসল এবং একদম খাঁটি মনে হয়। কারণ, ব্যক্তির আমিত্বটাই তথা 'আমি-আমি' এবং 'আমার-আমার' অহঙ্কারটি এই ধোঁকার ফাঁদে নিয়ে যায়। হিব্রু ভাষায় অহঙ্কারকে বলা হয় বালাসা, আর অহঙ্কার যে করে তাকে বলা হয় ইবলিস। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের সাথে যে একজন ইবলিসকে দেওয়া হয়েছে, মহানবীর এই মূল্যবান কথাটি এখন পরিষ্কার বুঝা যায়। স্বর্গ এবং নরক যেমন বাহিরের বিষয় নয় বরং একান্ত ভেতরের বিষয়, এই অপূর্ব অভ্যন্তরীণ রহস্য না বুঝে যারা বাহিরে পাবার আশা করেন তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। কারণ, এরা অনেকটা সেই রকম গাধার মত, যে গাধা জীবনভর চিনির বোঝা বয়ে বেড়ালো, অথচ চিনি খেয়ে দেখার ভাগ্য হল না। অবশ্য ইহা গাধার দোষ নয়। কারণ ইহাই ছিল গাধার তকদিরের লিখন। অহঙ্কারীরা কোনদিন ভেতরে খুঁজতে পারে না। কারণ, অহঙ্কারের ধর্মই হল বাহিরে খোঁজা। এবং এই বাহিরের খোঁজাকেই বলা হয় একশত হতে নিচের দিকে গুণে গুণে একের ভেতর আসবার প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টাকেই বলা হয় ডিডাকটিভ্ ওয়ে অফ থিংকিং। এই অহংকার পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রসুলদের মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা সবাই এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করার উপদেশটিকে মেনে নিয়েছি, কিন্তু এখলাসের সহিত তথা একদম আন্ত রিকভাবে কয়জন মানতে পেরেছি? মুখে মুখে মেনে নেবার পরিণতি কী হতে পারে তা কমবেশি সবাই বুঝি। সুতার মধ্যে হাজার রকমের প্যাঁচ লেগে গেলে যেমন জটিলতার সৃষ্টি হয়, সে রকম জটিলতার মুখের সামনে কি এই বিংশশতাব্দীর মানব সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে? একই ধাতব পদার্থে তৈরি অথচ একটির সাহায্যে পেট কেটে গ্যাসট্রিক আলসারের ঘা সারিয়ে তোলে, অপরটি দিয়ে মানুষের গলা কীভাবে কাটা যায় তা আবিষ্কারের ফন্দি ফিকির চলে। তাহলে কি মানুষের নিয়তের উপরই ভাল-মন্দ নির্ভর করে? মানুষের নিয়তই কি সব কিছুর একমাত্র মানদণ্ড? যদি তাই হয়, তাহলে আজকের সভ্যতার মানদণ্ডে এই উত্থান আর পতনের প্রবল ঢেউয়ের ঝাপটায় কোটি কোটি মানুষ কেন অর্ধমৃতের মত? বহির্জগতের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকেই বলা হয় বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং এই বহির্বিষয়ক জ্ঞানের পথই বিজ্ঞানের পথ, আর সেই পথ ধরে মানুষ চায় আশীর্বাদের দেশে পৌঁছাতে। অনেকখানি আশীর্বাদ যেমন মানবজাতি পেয়েছে এই বিজ্ঞানের বদৌলতে তেমনি অভিশাপও কি পায়নি? অনেক আদিম প্রথা আর আচরণের গালে বিজ্ঞান যেমন প্রচণ্ড চড় মেরে মানবিকতার আদর্শ এনে দিয়েছে, তেমনি অভিশাপের বড় বড় ঝুড়িগুলো মানবজাতির মাথায় ঝুলছে এবং যে কোন মুহূর্তে মানব সভ্যতার গণকবর রচনা করতে পারে। এ জন্যই হয়তো বিজ্ঞানীদের গুরুঠাকুর আইনস্টাইনকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কেমন হবে বলে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে না পারলেও চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধটির কথা অতি সহজেই বলতে পারবেন। তার মানে, যদি কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে ভাগ্যের জোরে বেঁচেই থাকে তাহলে তারা যুদ্ধ করবে গাছের ডাল, বাঁশের লাঠি আর পাথরের টুকরো দিয়ে। একটি মানুষের মনের মধ্যে যেমন ফেরেস্তা আর ইবলিস পাশাপাশি বাস করে এবং মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক উঠানামাটিও নির্ভর করে তার নিজের উপর, তেমনি বিজ্ঞানের ভাল-মন্দ দুটোই পাশাপাশি বাস করছে। এবং গঠন ও ধ্বংসটিও নির্ভর করছে দুই বিপরীতমুখী আদর্শে বিশ্বাসী মহাশক্তিধরদের উপর। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে কিছুই হবার নয় এবং হতেই পারে না। যদি বিজ্ঞানের দ্বারা মানব সভ্যতা চরম পাদপীঠে উন্নীত হয় তাহলে এটা সমগ্র মানবজাতির তকদিরের লিখন এবং এই তকদিরের লিখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ খণ্ডাতে পারবে না। যদি বিজ্ঞানের দ্বারা মানব সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তাহলে এটা সমগ্র মানবজাতির তকদিরের লিখন এবং এই তকদিরের লিখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ খণ্ডাতে পারবে না। সুতরাং গঠন এবং ধ্বংসের চিন্তার সূত্রপাত বাহির হতে আসবে না, বরং কিছু মানুষের মন হতে তথা মানুষের ভেতর হতেই এর আগমন ঘটবে। যেমন বেহেস্ত ও দোজখ বিষয়টি বাহিরের নয় বরং একান্ত মনোগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই বাবা জান শরীফ বলছেন যে, প্রেম নামক অগ্নি যার বক্ষে জ্বলছে সেই একই বক্ষে নরকের অগ্নি জ্বলতে পারে না এবং জ্বলার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, প্রেমের আগুন এমনই এক আজব আগুন যার সামনে বিধাতার ইচ্ছাশক্তিটিও থরথর করে কেঁপে উঠে। কারণ, বিধাতার অনেক নামের মধ্যে সবচাইতে যে প্রিয় নামটি সেই নামটি হল প্রেম। সুতরাং বিধাতার অপর নাম প্রেম

আর প্রেমের অপর নাম হল বিধাতা। সুতরাং যে বুকে বিধাতা স্বয়ং প্রেমের রূপধারণ করে জ্বলছেন সেখানে নরকের আগুন তো একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার। তাই আমরা পবিত্র বাইবেলে যিশুখ্রিস্টের পবিত্র কণ্ঠে শুনতে পাই, 'বিধাতাই প্রেম এবং প্রেমই বিধাতা।'

বাবা জান শরীফ বলছেন, সেই বিধাতার প্রেমরহস্য তুমি কার কাছে জানতে পারবে? কামেল পীর ছাড়া এই প্রেমরহস্য বুঝা অসম্ভব। আপন মনের ভেতর লুকানো ভুলভ্রান্তিগুলোর অবসান হতে পারে একমাত্র কামেল পীরের সোহবতের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা জেকের সব সময় আপন মনের মাঝে প্রহরীর মত সজাগ রাখতে হবে। তবেই মনের মাঝে লুক্কায়িত রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে এবং তখনই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হবে আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ময় নূর। মনের গহিন তলে এই যে নূরের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে সেটা কি সেই ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে, যার মন অন্ধকারে ডুবে আছে? কখনোই নয়–এটা জান শরীফ বলছেন। আমানুরা এবং মুমিনেরা কখনোই এক নয়। কারণ, মুমিন দর্শন পেয়েছেন, আর আমানুরা অনুমানের ইমানে তথা বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সুতরাং এ রকম ইমান তথা বিশ্বাস যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে, আর তাই এরা, বলতে গেলে, অন্ধকারে বাস করে। কিন্তু ইমানের পরিপূর্ণতা তথা মুমিন রূপে পরিগণিত হতে চাইলে কামেল পীরের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়। আবার সেই একই কথা বার বার বলছি যে, মনের দুয়ারটি যদি খুলতে চাও তাহলে সেটা প্রেম তথা মহব্বত দিয়েই খুলতে হবে। আর যদি একবার মনের দুয়ারটি খুলতেই পার তাহলে অতি সহজেই দেখতে পাবে। কী দেখতে পাবে? দেখতে পাবে 'আমরে রব' তথা রবের আদেশ। আর সেই রবের আদেশটি কীরূপে দেখতে পাবে? দেখতে পাবে এমন এক রূপে যা তুমি ভাবতে পার নি। সেটা কীরূপ? সেই রূপটি আর কারোরই রূপ নয়, কেবলমাত্র নিজের রূপ এবং নিজের রূপেই আপনাকে আপনার মাঝে দেখতে পাবে। তাই সবাইকে বলছি যে, যে তার নিজের আসল পরিচয়টুকু জানতে পারলো না, সে কী করে অন্যের পরিচয় জানতে পারবে, তথা সে কী করে অন্যকে চিনতে পারবে?

তাই বাবা জান শরীফ একদম সোজাসুজি বলছেন, 'নিজ রূহু যেইজন পাবে পরিচয়–প্রাণের প্রাণ তবে দেখিবে নিশ্চয়।' এই বাক্যটি সাংঘাতিক ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যা মোটা চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। এমন কি বড় বড় জাঁদরেল কোরানের ব্যাখ্যাকারীরা এইখানে এসে এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলে যে, নিজেরা তো এর বিন্দু-বিসর্গ বুঝতেই পারে নি, এবং এই না বুঝার দরুন পাঠক সমাজকে বুঝতে পারলাম না বলতে লজ্জা পাবার দরুন বড় বড় ঘোড়ার ডিম উপহার দিয়ে গেছেন। আপনি কোরানের প্রায় অধিকাংশ তফসির খুলে দেখুন, দেখতে পাবেন অনুমানে ঢিল ছোঁড়ার কত রকম বাহারের নমুনা। সবচাইতে দুঃখ হয় কেবলমাত্র একটি কথা মনে করে, আর সেটা হল, এরা সবজান্তার মত সমস্ত কোরানের ব্যাখ্যা লিখার উদ্ধত সাহসের পরিচয় দেয়। এটা যে মানব সমাজের মধ্যে কতখানি ভেদাভেদের মারাত্মক রোগজীবাণু ছড়িয়ে দিতে পারে তা আজকের দিনের মুসলিম নামধারী সমাজ জীবনের দিকে একটু নজর দিলেই ধরা পড়ে। কোরান বলছে, *'কুল্লু নাফ্সুন জায়েকাতুল মওউত'* অর্থাৎ 'প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' একটু ভালভাবে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চেষ্টা করুন। কোরান প্রত্যেক নফসের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে। কিন্তু বিরাট একটি প্রশ্ন হল যে, আপনি কি সমস্ত কোরানের ভেতর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটিবার এই কথাটির ঘোষণা পাবেন? কী সেই কথাটি? 'কুল্লু রূহুন জায়েকাতুল মওউত' অর্থাৎ 'প্রত্যেক রূহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' এমন একটি বাক্য তো দুরের কথা, একটি শব্দও কোরানে উচ্চারিত হয়নি। কেন উচ্চারিত হয়নি? কারণ, রূহ হল আত্মা আর আত্মা কোনদিনও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না। যাহা মৃত্যুর অধীন নয় তাকে কী বলা হয়? তাকে বলা হয় অমর। সুতরাং আত্মা হল অমর এবং নিত্য। যাহার শুরু আছে উহার শেষও আছে এবং এই দুইটির অধীনে যা কিছু আছে সবই মৃত্যুর অধীন তথা ধ্বংস ও লয়ের অধীন। কিন্তু আত্মার শুরু নেই, সুতরাং শেষ হবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই আত্মা অমর এবং নিত্য, এবং এ জন্যই কোরানের কোথাও আত্মার মৃত্যু হবে অথবা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এই জাতীয় একটি কথাও নেই। বরং আত্মাকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আদেশ ও তাঁরই কর্ম। আদেশটি আর কারো নয়, স্বয়ং স্রষ্টার। সুতরাং এই আদেশ শব্দটির গভীর রহস্য সম্বন্ধে সমস্ত কোরানে মাত্র সতেরবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আদেশটির রূপ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, নফস এবং রূহ এক জিনিস নয় বরং সম্পূর্ণ আলাদা। নফসেরই মৃত্যু হয়। নফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। রূহ তো আত্মা বলে সবাই কমবেশি জানি এবং বুঝি। কিন্তু নফস বলতে কী বুঝায়? মানবীয় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকেই বলা হয় নফস। তা যত কমবেশি ভাগেই ভাগ করা হোক না কেন। মানবীয় ইন্দ্রিয়গুলো বলতে কী বুঝায়? মনের যতগুলো বৃত্তি আছে তথা ডালপালা আছে, সেই বৃত্তিগুলোর কাজকর্মকেই বলা হয় নফস। এক কথায়, মানবীয় চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক প্রকাশটিকেই বলা হয় নফস। দেখা, শোনা, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলোর গুণাগুণ এক একটি নফসের অভিব্যক্তি। এই নফস নিয়েই মানুষের যত কাজ কারবার এবং এই নফসকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হয়। সেই মৃত্যুটি স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, আবার অনিচ্ছায়ও হতে পারে। তাই মহানবী বলছেন, *'মুতু কাবলা আন্তা মুতু'* অর্থাৎ 'মরার আগে মরে যাও' এবং এই মৃত্যু সাধক সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করার পরই হয় এবং এ রকম মৃত্যুর স্বাদ যারা বেঁচে থেকেই গ্রহণ করতে পেরেছেন তাদেরকেই কোরান 'কখনই মরে না' বলে ঘোষণা করেছে। কারণ, এই মৃত্যুকে গ্রহণ করতে হয় জেহাদের মধ্য দিয়ে। জেহাদ না করে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং জেহাদ আবার দুই প্রকার : ধর্মযুদ্ধে জেহাদ করে মৃত্যুবরণ করাকে বলা হয় 'জেহাদে সগীর' অর্থাৎ ছোট জেহাদ, আর নিজের প্রবৃত্তির ইন্দ্রিয়গুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকেই বলা হয়েছে 'জেহাদে আকবর' তথা সবচাইতে বড় জেহাদ। সুতরাং সাধক সবচাইতে বড় যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। কারণ, নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই সমগ্র কোরান আদেশ দিচ্ছে এবং সেই আদেশ সংগ্রামরত নফসের অধিকারীদেরকে উদ্দেশ করেই তথা আমানুদেরকেই

দেওয়া হয়েছে। আরো মজার কথা হল এই যে, একটি আদেশও সমগ্র কোরানে মুমিনদেরকে লক্ষ করে দেওয়া হয় নি। কারণ, মুমিন বিজয়ী এবং বিজয়ীর জন্য আদেশ নি□য়োজন। বরং ধমক দিয়ে কোরান আমানুদেরকে লক্ষ করে সাবধান করে দিয়ে বলছে, *'মান্ কুতিলা মুমিনান্ মোতাআম্ মাদান্ ফাকাদ কাফারা'* অর্থাৎ 'যে যুদ্ধ করে মুমিনের সঙ্গে জেনে শুনেও সুতরাং নিশ্চয়ই সে কাফের'। সুতরাং আমানু এবং মুমিন দুইজন সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থানে দণ্ডায়মান। কিন্তু আমাদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হল এই যে, প্রায় অধিকাংশ কোরানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমানু এবং মুমিনের মধ্যে এমনভাবে লাবড়া পাকিয়ে ফেলা হয়েছে যে, পাঠকদের পক্ষে এই ব্যবধানটুকু ধরার আর কোনো সুযোগই রাখা হয় নি। এ রকম ভাবে কোরানের শত শত স্থানে বিকৃত, জঘন্য এবং বানোয়াট ব্যাখ্যা দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। যদিও পৃথিবীর মানুষেরা এই অপব্যাখ্যা করার কৈফিয়ৎ চান নি অথবা চাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি এবং তারই পরিণাম যে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তা সবাই কিছু না কিছু বুঝতে পারি।

নফস এবং রূহের বেলাতেও এই একই লাবড়া পাকানো হয়েছে। নফসকে অনুবাদে আত্মা করা হয়েছে এবং আত্মার মৃত্যু ঘোষণার ফরমান জারি করা যে কত বড় জঘন্য কোরান-বিরোধী কথা সেটা বুঝবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করা হয় নি। অথচ এসব অখাদ্য কোরানের নামে পরিবেশন করা হয়েছে।

তাহলে এখন আমরা রূহ তথা আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলবো। আত্মা প্রত্যেক মানুষের ভেতরই বীজরূপে অবস্থান করে। একটি বীজ যেমন একটি পরিপূর্ণ বিরাট গাছের সমস্ত গুণাবলি নিয়ে অবস্থান করে, তেমনি একটি বীজরূপী রূহ তথা আত্মাও পরমসত্তার সমস্ত গুণাবলি নিয়ে অবস্থান করে। বীজটির জাগ্রত রূপটি যেমন একটি বৃক্ষ, তেমনি বীজরূপের রূহ তথা আত্মাটির জাগ্রত রূপটি হল আপনার মধ্যে পরমসত্তার বিকাশ, প্রকাশ এবং অবতরণ। কামেল পুরুষের পরিতৃপ্ত নফসের উপর যখন রূহের তথা আত্মার বিকাশ অথবা অবতরণ হয় তখনই তাঁকে অলী, দরবেশ, পীর, ফকির ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ আত্মা সৃষ্টির মধ্যে গণ্য করা হয়নি বরং আত্মা হল সৃজনী শক্তির অধিকারী। সুতরাং আত্মা হল সম্পূর্ণ রহস্যময় এবং এর পরিচয় মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আত্মার জাগরণের মাধ্যমেই নিজের পরিচয়ের জ্ঞান হয়। ফানা তথা নির্বাণ হতে হয় নফসের, আত্মার নহে। কারণ, আত্মা নির্বাণের আওতার বাহিরে। কারণ, আত্মা অমর, এবং যেহেতু আত্মা অমর সেই হেতু ইহার শুরুও নেই শেষও নেই। নফসের শুরু এবং শেষ আছে সুতরাং ফানা তথা নির্বাণ হবার সাধনার প্রশ্নটিও আছে। রবরূপী আল্লাহ্‌র ইমেইজ তথা ভাবমূর্তি সাধকের পরিতৃপ্ত নফসের উপর অধিষ্ঠানকে আত্মার অবতরণ বলেও কোরান ঘোষণা করেছে। মানব জীবনের সত্যিকার পরিপূর্ণ সার্থকতা এখানেই। এই সার্থকতার রহমত যারা পায়নি তাদের নফস তথা ইন্দ্রিয়গুলো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। এই চক্রাকারে ঘূর্ণায়মানতাই নফসের স্তরভেদের গভীরতা অনুযায়ী জাহান্নামের তথা নরকের অবধারিত শাস্তি ভোগ করা। সুতরাং নফস নানা রকম পরিবর্তনশীল অবস্থা ও পরিবেশের অধীন। নফসের চেতনা ও অভিব্যক্তি সকল জীবের মধ্যেই কমবেশি আছে। কিন্তু আমাদের জানা মতে মানুষ ও জিন জাতির নফসই আত্মাকে ধারণ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা রাখে। আত্মার পরিচয় লাভ করার ক্ষমতা সকল মানুষকেই সমভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আত্মার পরিচয় জানবার বিষয়টিকে মানুষের ইচ্ছার উপর ফেলে রাখা হয়েছে বলে এই কষ্টের পথে এগিয়ে যেতে খুব কম লোকই রাজি হয়। কারণ দুনিয়ার এই প্রলোভনের চাকচিক্যময় বিলাসী জীবনের সুখ ত্যাগ করতে চায় না। যত সুখ আর দুঃখ সবই অনুভব করে মানুষের এই নফস। কেবল এটাই নয়, বরং পুরস্কার এবং শাস্তিও নফসেরই প্রাপ্য। আর আত্মা? এসবের কোনোটাই আত্মার ভোগ করতে হয় না। কারণ, জাগ্রত আত্মা সৃষ্টির যেদিকেই তাকায় না কেন, সেই সৃষ্টি নতজানু হয়ে সেই আত্মার হুকুম পালন করতে তৈরি হয়ে থাকে। আত্মার কথা যেখানে মাত্র সতেরবার বলা হয়েছে, সেখানে নফসের কথা কোরান-হাদিসে বহুবার বহু রকমে বলা হয়েছে। কারণ, আমাদের সকল কাজ কারবার এই নফসকে নিয়েই। এই নফসের আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে। সেই নামটি হল প্রাণ। অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলোর সমষ্টিগতভাবে চলৎশক্তিগুলোর যে একটি নামের প্রয়োজন সেই একটি নামই হল প্রাণ। আর এই প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এই মৃত্যুর স্বাদের প্রশ্নেও একটি মূল্যবান কথা থেকে যায়। সেই মূল্যবান কথাটি হল প্রাণকে মাত্র একটি বারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। দুইবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথা কোরানের কোথাও ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং মৃত্যুর স্বাদ যারা মৃত্যুর আগেই গ্রহণ করতে পেরেছে তাদের আর দ্বিতীয়বার মরার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ আমাদের চর্ম চোখে যারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন তাদেরকেও পুনরায় মারা যাবার দৃশ্য দেখতে হয়। এই চর্ম চোখে পুনরায় মারা যাবার দৃশ্যটি একটি ডাহা মিথ্যা দর্শন বলে কোরানকে ঘোষণা করতে হয়েছে এবং সেই ঘোষণাটির সঙ্গে ধমক আর অজ্ঞতার প্রশ্নটিকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, চোখের দেখা মৃত্যুর দৃশ্যটিকে আমাদের জাগ্রত মন ও বিবেক কিছুতেই মেনে নিতে চাইবে না বলেই এ রকম ভাষায় কোরানকে ঘোষণা করতে হয়েছে। কোরানের সুরা বাকারার একশত চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় তাদেরকে মৃত বলো না। কখনোই নয়, তারা জীবিত আছে, কেবল তোমরা বুঝতে পার না।'

সাদা চোখের দেখা যে সব সময় ঠিক হয় না এই কথাটি বহির্জগতের অনেক বিষয়ের বেলাতেও একদম সত্য কথা। এর একবোঝা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এই সত্যটুকু সবাইকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই মাত্র সেদিন পৃথিবীর মানুষগুলোকে আর একটি আজব চমক দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। এমনকি জাঁদরেল বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত চমকে গিয়েছেন। ভারতের বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় পরমহংস তেওয়ারী শূন্য হতে বিদ্যুৎ কেমন করে উৎপাদন করা যায় সেটা আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিলেন যে,

আমরা যা শূন্য বলে এতকাল মনে করে এসেছি সেটা মোটেই শূন্য নয়, বরং অনেক কিছু লুকিয়ে আছে স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে। কিন্তু কোরান দেড় হাজার বছর আগেই ঘোষণা করেছে যে, যারা জেহাদে আকবরের মধ্য দিয়ে মারা যাবার আগেই মৃত্যুবরণ করতে পেরেছে তারা আর মারা যাবে না। চোখে দেখছি মারা গেছে, অথচ মারা যায় না ঘোষণা করাটি যে কত সাংঘাতিক ধরনের রহস্যময় কথা! এবং এই রহস্যময় কোরানের ঘোষণাটিকে আমাদের দুর্বল মনের গতি যেন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না এবং এই মেনে নেওয়াটি যে একটি অস্বাভাবিকতাকেই মেনে নিতে হচ্ছে তা কোরানের অনেক তফসিরকারেরা মেনে নিতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই শুরু করা হয়েছে গোঁজামিলের পাহাড় দিয়ে সাজানো নানা রং বেরং-এর কথা। কত রকম যে ধানাইপানাই দেখানো হয়েছে, যা পড়লে অনেকটা তাদের মতবাদকে বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়ার মত।

আমরা জেনে এসেছি যে, অনেক অলীয়ে কামেলের এমনকি দেহগুলোর বিনাশ হয় নি। আবার অনেকের দেহ উধাও হয়ে গেছে। আবার অনেকের দেহ কবরে দেবার কিছুক্ষণ পর কবর খুলে দেহ গায়েব হয়ে গিয়েছে। আবার অনেকের দেহ দাহ করা হবে, না কবর দেওয়া হবে–এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবার পর দেখা গেছে, কাপড়ে ঢাকা দেহটি না থেকে কিছু ফুল অথবা অন্য কিছু পাওয়া গেছে। আবার অনেকের একই দেহ অনেক স্থানে অনেক দেহধারণ করে কবর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আত্মার প্রশ্নটি তো দূরে থাক বরং অলীয়ে কামেলের যে সাধারণ দেহ সেটিরও বিনাশ হয় না বরং যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে। যদি ধরে নেই যে, দেহটি তো আর অলী নয় বরং অলীর একটি সবচাইতে নিকটতম আচ্ছাদন, অথচ সেই আচ্ছাদনটির মর্যাদা দেখে চমকে যেতে হয়। মহানবী বলেন, *'ইন্নাল্লাহা হার্‌মা আলাল্‌ আরদে আসজাদাল্‌ আম্বিয়া'।* অর্থাৎ, 'অবশ্যই আল্লাহ্‌ মাটির জন্য নবীগণের শরীরকে হারাম করেছেন'।

কে না জানে যে, হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর পীর ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবা বাবা বাকিবিল্লাহ তাঁর নিজের জানাজা নিজেই পড়ে গেছেন। বহির্জগতের বৈজ্ঞানিক অসম্ভব ধরনের বিষয়গুলো যখন ধাপে ধাপে এবং দিনের পর দিন সম্ভব করে তুলেছে, আর সেইসব সম্ভবগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে একান্ত মনের প্রচণ্ড অনিচ্ছায়। বিজ্ঞান যেমন অবাধ্য মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে ঘাড় ধরে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে, সে রকম কি এই দেহ আর আত্মার জগতের রহস্য কোনদিন খুলে দিতে পারবে না? হয়তো একদিন পারবে এবং যেদিন পারবে সেদিন জল্পনা আর ধরা-বাঁধা কাষ্ঠ সংস্কারগুলোর মৃত্যুঘণ্টা ধর্মের ঢোলের মত আপনিই বেজে উঠবে।

নফস ও রূহ সম্পর্কে আলোচনা

এবার আমরা নফস তথা প্রাণের কথা না বলে রূহ তথা আত্মার কথাটির একটু আলোচনা করতে চাই। বাবা জান শরীফ এই আত্মাকেই তাঁর পুঁথির ভাষায় বলেছেন প্রাণের প্রাণ। তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন : আব, পানি, জল আর ওয়াটার আসলে একই পদার্থের অনেক নাম।

কোরান বলছে, *'কুলুর রূহু মিন আম্‌রি রাব্বি'* অর্থাৎ 'আত্মা আমার রবেরই আদেশ হতে আগত।' অথচ কোরান এই কথাটি কখনোই বলে নি যে 'কুলুন নফস মিন আম্‌রি রাব্বি' অর্থাৎ 'নফস তথা প্রাণ আমার রবেরই আদেশ হতে আগত।' তাহলে আত্মা কী? আত্মার মধ্যে রবেরই (আল্লাহ্‌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি) আদেশ এবং কর্ম বিদ্যমান। নফসের গুণাগুণ কিছুই আত্মার মধ্যে নেই। এই জন্যই আত্মাকে চিনতে এবং বুঝতে পারে না নফস। এমনকি নফস আত্মার ধারণা করতেও পারে না। তাই আত্মা কেবল আত্মাকেই বুঝতে এবং জানতে পারে। ভাষার মাধ্যমে আত্মার পরিচয় দেওয়া যায় না। ভাষার মাধ্যমে রবরূপী আল্লাহ্‌কে যেমন বুঝানো যায় না তেমনি আত্মাকে বুঝানো যায় না। কোরানের বত্রিশ নম্বর সূরা সিজ্‌দাহ্‌-এর নয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুম্মা *সাওঅয়াহু ওয়ানাফাকা ফিহি মিররূহিহি'* অর্থাৎ 'পরে পরিপূর্ণ আকৃতি দেন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) আত্মা তার (মানুষের) মাঝে ফুৎকার করেন।'

এখানেও লক্ষ করার বিষয় হল যে, আল্লাহ্‌ নফস ফুৎকার না করে আত্মাকে ফুৎকার করলেন। এই আয়াতটির কথা প্রথমেই বলা হল কারণ এখানেই প্রায় সবাই আত্মাকে নফস বলে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভুল করে বসেন। আত্মার বিষয়ে যতবার কোরানে বলা হয়েছে তার মধ্যে এটাই একমাত্র বিশেষ ঘোষণা, যার মাধ্যমে মনে হতে পারে যে, সকল মানুষের মধ্যেই আত্মাকে ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ যেহেতু এখানে অকর্তা নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার সেই হেতু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে সেটা সে বুঝতে পারে না। নিজের মধ্যে নিজের পর্দাটি সরাবার সাধনা এবং রবের রহমত লাভ করতে পারলেই আত্মার পরিপূর্ণ রূপটি নফসের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং এই আত্মা প্রতিষ্ঠিত নফসের নামই হল মুমিন। 'প্রকৃত মুমিন' কথাটি ভুল। কারণ মুমিন মানেই হল আত্মার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করা। এই আত্মাকে জানাবার কেবল প্রবল ইচ্ছা ও সাধনার দ্বারা তা হয় না, আল্লাহ্‌র একান্ত ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

আবার যদি বলা হয় যে নফস আত্মাকে চিনতে পারে না, তাহলেও কথাটিতে ভুল থেকে যায়। কারণ, নফসকে চিনতে পারলেই রবরূপী আল্লাহ্‌কে চেনা হয়ে যায়। সুতরাং নফস আত্মাকে চিনতে পারে না বললে ভুল বলা হয় এবং সেই ভুলটি জেনে শুনেই বলা হয়েছে। কারণ, নফস হল আত্মার বাহন অথবা বসার আসন। নফসটিকে এমন একটি উন্নত স্তরে আসতে হবে, যে স্তরে আসামাত্রই

আত্মার বাহন বা আসনে পরিণত হয়ে যাবে। সেই উন্নত স্তর অথবা ধাপটিকে এখন যত প্রকার নামই দেওয়া হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, নামটি এখানে মোটেই মুখ্য নয়। উন্নতির পরিবেশ রচনা করাটাই মুখ্য। অবশ্য এই সামান্য নাম নিয়েও কম মতভেদের সৃষ্টি হয়নি এবং এটা এক ধরনের অজ্ঞতা অথবা গোঁড়ামি বলা যেতে পারে। মান আরাফা রূহুহু বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে মান আরাফা নাফসাহু, অর্থাৎ যে তার নফসকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, যে তার রূহকে চিনতে পেরেছে। অতএব নফস যখন আপনার মধ্যে পরিচয় দান করে সেই পরিচয়টুকুই হল রবরূপী আল্লাহ্‌র পরিচয়। সুতরাং নফস তথা প্রাণই রূহ তথা প্রাণের প্রাণকে চিনিয়ে দেবার আইন আছে বলে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। যে প্রাণ তার নিজের ভেতর লুকানো প্রাণের প্রাণকে চিনতে পেরেছে সেই প্রাণটি কি পরিশুদ্ধ এবং পরিতৃপ্ত নয়? অবশ্যই সেই নফস তথা প্রাণটি পরিশুদ্ধ এবং পরিতৃপ্ত বলে কোরান ঘোষণা করেছে এবং এই ধরনের প্রাণকে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করার আদেশ দেওয়া হয়। আর জান্নাতে প্রবেশ লাভ করার অর্থই হল স্বাধীনতা লাভ করা। এই স্বাধীনতার রূপ এবং শক্তি বিজ্ঞানময় এবং রহস্যের এক একটি প্রতিমূর্তি এবং এরাই হাদি, সাদেক, হানিফ, কামেল এবং মুরশিদ। আল্লাহ্‌র বিকশিত অনন্ত ছুটে চলার বিকাশময় রূপের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই এদের বিচরণ করার শক্তি রহমতরূপে লাভ করেন। এবং এটাই নানা ভাষায় নানা শব্দের ভঙ্গিতে অফুরন্ত ফয়েজ লাভ করা বলা হয়েছে এবং মর্যাদা অনুযায়ী এদের রূপ ও শান বিচিত্র। সুতরাং এই নফসই আত্মাকে চিনতে পারে, আবার এই নফসই আত্মাকে চেনা তো দূরের কথা ধারণাও করতে পারে না। এই পারে এবং পারে না-টাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এবং ইহাই আপন আপন তকদিরের রহস্যময় লীলাখেলা। কখনো মনে হয় কথাটি বিরোধের আঁধারে ডুবে আছে, আবার কখনো মনে হয় মিলনের আলোর সাগরে মিলে একাকার হয়ে গেছে। তাই বিরোধ যে পর্যন্ত আছে দর্শনের বিভিন্নতাও সেই পর্যন্ত আছে এবং থাকবে এবং থাকতে বাধ্য। কারণ, বিরোধ পৃথক করানোর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এবং এই পৃথক দেখাটাই বহুকে দর্শন করা এবং বহুকে দর্শন করাটাই শেরেক। পক্ষান্তরে মিলনের দর্শনে একেরই দর্শন লাভ হয় এবং সব কিছুতেই একের দর্শন হয় এবং এক ব্যতীত দ্বিতীয় দর্শন আর থাকে না এবং থাকার প্রশ্নই উঠে না। মহা এক শূন্যের গর্তে বহু দর্শনগুলো হারিয়ে যায় এবং হারিয়ে ফেলে সবকিছু। মহাশূন্যবাদের মধ্যেই একটিমাত্র শব্দ ধ্বনিত হয় আর সেটাই হলো : 'আমিই *সত্য*, 'আমিই *সুবহানি*, 'আমিই *প্রথম মুমিন*, 'আমিই *প্রথম*, 'আমিই *শেষ*, 'আমিই *প্রকাশ্য* এবং 'আমিই *গোপনীয়* ইত্যাদি। মিলনের মহাসাগরে যারা মিশে একাকার হয়ে গেছেন তাদের কথা ও ভাবধারা বুঝতে পারে না তারাই, যারা বিরোধের বিভিন্নতার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে তথা বহু দর্শনের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কারণ, মহা একের মধ্যে মিশে গিয়ে বিরোধকে কথার ভাষায় বুঝানো যায় না। তাই বিরোধের চোখে ও মনে একের কথাগুলো মনে হয় ধাঁধা, এবং অজ্ঞেয়তাবাদ ও সংশয়বাদের দোষে অভিযুক্ত করে বলতে চায় এই আছে এই নেই, থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, আছে যে তাও বলছি না আবার নেই যে তাও বলছি না। আসলে এটাই বিরোধের আসল রূপ এবং মূল চরিত্র। সুতরাং মিলনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করে বিজ্ঞ বিচারকের পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই আত্মতৃপ্তিই একদিন বিরোধের গলায় ফাঁস হয়ে ফ্রাসট্রেশনের তথা অন্তর্জ্বালার দাহ তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকে মৃত্যু নামক নফসের উপর ঘটনাটি আসার পূর্ব পর্যন্ত।

আমরা এখন রূহ তথা আত্মার কথায় ফিরে যাই। আত্মা নিত্য কারণ ইহার শেষ নেই। নিত্য বলতে কী বুঝায়? যা আগে ছিল এবং বর্তমানে আছে এবং পরেও থাকবে, তথা এক কথায়, সব সময় আছে এবং থাকবে। আসলে বর্তমান কালটি পরমাণুর চেয়েও ছোট। ভবিষ্যতের পথ বেয়ে বর্তমানের একটি চমক দেখাবার পরই অতীতের দিকে চলে যায়। একটি বর্তমানের চমকের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ কোটি কোটি আলাদা চমক দেখিয়ে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। একটি বর্তমানের চমকের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর জীবজন্তুরা কোটি কোটি আলাদা চমক দেখিয়ে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। এরকমভাবে সমস্ত আকাশ এবং তার নিচের মধ্যে যা কিছু আছে তারা অগণিত ভিন্ন ভিন্ন চমক বর্তমানকে দেখিয়ে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, কারো চমকের সঙ্গে অন্য আর একটি চমকের মিল নেই এবং এ রকম অগণিত বিভিন্ন চমক বর্তমানকে একবারই দেখানো হয়। দ্বিতীয়বার সেই একই রকম চমক আর কোনোদিন এবং কোনো কালেও দেখানো হয় না এবং কোনোদিন হতেও পারে না এবং এটাকেই কোরান 'জুল জালাল' বলে ঘোষণা করেছে।

জন্মচক্র সম্পর্কে আলোচনা

আত্মার যেমন জন্ম নেই, তেমনি মৃত্যুও নেই। জন্ম হয় দেহের, সুতরাং মৃত্যু ঘটনাটিও দেহেরই হয়। মৃত্যু অর্থ বিনাশ নয়, বরং স্বাদ গ্রহণ করা। কারণ দেহ তো দূরের কথা, কোনো কিছুরই বিনাশ হয় না। এই কথাটি বিজ্ঞানের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং মৃত্যু একটি ঘটনা মাত্র। যাহা এক রূপ হতে অন্যরূপে রূপান্তর করতে পারে এবং এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতা মৃত্যুর নেই এবং দেওয়াও হয়নি। সুতরাং দেহত্যাগ একটি অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, কিন্তু বিনাশ নয়। সুতরাং আত্মা একদেহ ত্যাগ করে অন্য আর একটি দেহ কি পুনরায় গ্রহণ করে? যদি বলা হয় করে না, তাহলে মৃত্যুর পর শোক এবং বিলাপ এবং কান্নাকাটি অনেকদিন পর্যন্ত করা চলে। যদি বলা হয় মৃত্যুর পর

শোক এবং বিলাপ করতে মহানবী বারণ করে দিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন আসে, কেন শোক আর বিলাপ করতে বারণ করা হল? যদি আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করতে পারে অথবা করে তাহলে শোক এবং বিলাপ করার প্রয়োজন হয় না। তাহলে কি মহানবী মৃত্যুর পর শোক এবং বিলাপ করতে এই কারণেই বারণ করেছেন? যদি বলা হয়, হ্যাঁ, এই কারণেই, তাহলে সমগ্র কোরানের পাতায় পাতায় জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। তাহলে কি জন্মান্তরবাদের দর্শনটিকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে বিকৃত অনুবাদ আর বিকৃত ব্যাখ্যার জগাখিচুড়ি পাকিয়ে? আর যদি বলা হয়, না–কোরানে জন্মান্তরবাদের কথা বলা হয় নি, তাহলেও আমার বলার কিছু নেই এবং থাকতে পারে না। কারণ, অধম লেখক উপন্যাস, নাটক অথবা ছোট গল্প লিখছে না যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।

বেহেস্তের সুখভোগ এবং নরকের যন্ত্রণাভোগ দুটোর একটিও আত্মা করে না। কারণ, দুটোই ভোগ–হোক না সুখ অথবা দুঃখ। আত্মা কোনো কিছুই ভোগ করে না। কারণ, আত্মা জন্মগ্রহণও করে না এবং জন্ম দেয়ও না। ভোগ করে নফস তথা প্রাণ। বেহেস্তের সুখ এবং দোজখের দুঃখ দুটোই ভোগ করে নফস তথা প্রাণ। সুতরাং আত্মা এসব রকমের গুণাগুণের উর্ধ্বে। তাই আত্মা নির্গুণ। বেহেস্তের সুখভোগই কি নফসের চরম গতি বলে ধরে নিতে চান? যদি বলেন, হ্যাঁ, তাই–আমি আপনার সঙ্গে একমত। আবার যদি বলেন, বেহেস্তের সুখভোগই নফসের চরম গতি বলে ধরে নিতে পারি না, তা হলেও আমি আপনার সঙ্গে একমত। উভয়টির প্রশ্নে একমত হওয়া কি অজ্ঞেয়বাদী অথবা সংশয়বাদী বলে ধরে নেওয়া যায় না? যদি বলি না, মোটেই যায় না, আবার যদি বলি, হ্যাঁ, ধরে নেওয়া যায়, তাহলে? আবার প্রশ্ন করতে পারেন। তাই এই বিষয়ের উপর আমাদের মহানবী কী বলেছেন সেটাই বলতে চাই। মহানবী বলেন, *'কাল্লিমুন্ নাসা আলা কাদ্রি উকুলিহিম'*। অর্থাৎ 'যার যে পরিমাণ বুদ্ধি, তার সঙ্গে সেই পরিমাণ কথা বল।' সবার কাছে সব কথা বলা ঠিক নয়। আর যদি মহানবীর বাণীটিতে মনের ঠিক উত্তরটি পেলাম না বলে আপত্তি করেন তাহলে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর ভাষায় বলতে পারেন, *'উস্ত্ দিওয়ানা কে দিওয়ানা না শুদ্।'* অর্থাৎ 'যে পাগলই হয় নি সে-ই তো পাগল।' আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগলই সুস্থ অথচ যে পাগল হয় নাই সে-ই অসুস্থ।

আত্মা যদি জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন না হয় তাহলে জন্মান্তরবাদের প্রশ্নটিই অবান্তর। যেহেতু আত্মা এই দুটোর একটিরও মুখাপেক্ষী নয় সেই হেতু আত্মার জন্য জন্মান্তরবাদ কথাটি একটি বাতুলতা মাত্র এবং বিকৃত মস্তিষ্কের বিকৃত ফসল। সেই হেতু ইসলামে জন্মান্তরবাদের কোনো প্রকার সমর্থনই থাকতে পারে না। যেহেতু নফস তথা প্রাণ জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন সেই হেতু নফসের তথা প্রাণের বেলায় জন্মান্তরবাদের কথাটি আসতে পারে। কারণ, নফস তথা প্রাণকেই পরিশুদ্ধ হতে হয় শোধন ক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই নফসের তথা প্রাণের তিনটি ভাগ করা হয়েছে : *নফসে আম্মারা* তথা যে নফস তথা প্রাণ আত্মশুদ্ধির কোন প্রকার ধার ধারতে চায় না এবং দুনিয়াকেই একমাত্র কাম্য বিষয় মনে করে; তারপর হল *নফসে লাউয়ামা* তথা যে নফস তথা প্রাণ আত্মশুদ্ধির জন্য সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে, যাকে 'মোজাহেদ নফস' অথবা 'অনুতাপশীল নফস'-ও বলা যায় এবং এই প্রকার নফসের অধিকারীদেরকেই কোরানে আমানু বলা হয়েছে এবং কোরানের যত আদেশ আর উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা এদেরকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে; তারপর হল *নফসে মোৎমায়েন্না* তথা যে নফস তথা প্রাণ নিজের খেয়ালখুশি মত চলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হতে পেরেছে তথা পরিশুদ্ধ হতে পেরেছে। এই নফস তথা প্রাণের আর কোনো প্রকার চিন্তা থাকে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে নিজের সমস্ত ইচ্ছাগুলোকে সমর্পণ করে দিয়েছে। নিজের বলে আর কিছুই রাখা হয়নি এবং এতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট। জেহাদের সাধনায় রত থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর তৃপ্ত হতে পারেনি বলে অনেক প্রকার অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়েছে বার বার। কিন্তু বিজয় লাভ করার পর রূহ তথা আত্মাকে বসাবার জন্য সিংহাসন রূপে বানানো হয়ে গেছে। কারণ সর্বপ্রকার বিরোধের অবসান হয়ে গেছে। এই নফসকে লক্ষ করে কোরানের উননব্বই নম্বর সুরা ফাজ্‌রের সাতাশ হতে ত্রিশ আয়াতে বলা হয়েছে : '*২৭। ইয়া আইয়াতুহান্ নাফ্‌সুল্ মুত্‌মাইন্নাহ্, ২৮। ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম্মারদিইয়াহ্, ২৯। ফাদ্‌খুলি ফি ইবাদি, ৩০। ওয়াদ্‌খুলি জান্নাতি।*' অর্থাৎ, 'হে মুত্‌মাইন্না নফস, তোমার রবের দিকে ফিরে আস, (তুমি) পরিতৃপ্ত তাঁর (আল্লাহ্‌র) সন্তোষ হতে। প্রবেশ কর আমার দাসদের মধ্যে এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং তৃতীয় তথা নফসের শেষ পর্যায়ে যখন আগমন হয় তখন সেই নফস প্রশান্ত এবং পরিতৃপ্ত। কিসের দ্বারা? আল্লাহ্‌র সন্তোষ হতে এবং আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে প্রবেশের প্রথম অনুমতি লাভ করে এবং বেহেস্তে প্রবেশ করে। একটু লক্ষ করে দেখতে চেষ্টা করুন তো, এই বেহেস্তে যে পরিতৃপ্ত নফস তথা প্রাণটি প্রবেশের অনুমোদন পেল সেই নফসটি কি মৃত্যুর পর পেল, না আগে পেল? যদি বলেন মৃত্যুর আগেই পেল তাহলে এটা ঠিক, আবার যদি বলেন মৃত্যুর পর পেল তাহলে সেটাও ঠিক। ইহা কেমন কথা বলে প্রশ্ন করলে উত্তরটি হবে যে, যিনি পরিশুদ্ধ হবার পর বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারলেন সেই পরিশুদ্ধ বলতে কী বুঝায়? আমিত্ব ত্যাগ করাকেই পরিশুদ্ধ বলা হয়েছে। মরার আগেই মরে যাও, এই কথার অর্থ হল আমিত্ব ত্যাগ কর এবং ইহা হল জীবিত থেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা। সুতরাং আমিত্বের মৃত্যুর পরই এই নফস জান্নাতে প্রবেশ করতে পেরেছে এবং এই আমিত্বের মৃত্যু ঘটাবার জন্য এই নফসকে যে কী প্রকার ত্যাগ আর সাধনা করতে হয়েছে সেটা কেবল ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবার উপায় থাকে না। সুতরাং এক হিসাবে এই পর্যায়ের নফসের অধিকারী জীবিত থেকেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পেরেছেন আবার অন্য হিসাবে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পরই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। এই হিসাবের রহস্যটি না বুঝতে পারলেই একটা গরমিলের হিসাব দাঁড় করানো হয়। কারণ, মানুষের অবাধ্য প্রবৃত্তি হিসাব ছাড়া চলতে চায় না এবং চলতে পারেও না। তাই গোঁজামিলই হোক আর জোড়াতালি মারা নড়বড়ে স্থূল চিন্তাই হোক, একটার মধ্যে তাকে যেতেই হবে। কারণ, সাধারণ মনের

এটাই হল এক ধরনের ধর্ম। অপরকে না বুঝেই অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী, শূন্যবাদী এমনকি নাস্তিক্যবাদী বলেও অপবাদ ছড়াতে বাধ্য হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে এদেরকে কোন প্রকার দোষারোপ করা যায় না। কারণ, তারা না বুঝেই এ রকম অপবাদ দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং চরম পর্যায়ের দৃষ্টিতে কাউকেই গালাগালি দেওয়া যায় না। তাই দেখা গেছে অনেক মহাপুরুষ শত লাঞ্ছনা আর অপমান হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন এবং এই কথাটি প্রমাণ করার জন্যও কি উদাহরণ দিতে হবে?

অতএব ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই যখন নফসেরই তথা প্রাণেরই প্রাপ্য এবং রূহ তথা আত্মাকে এর কোনটারই যখন ধার ধারতে হয় না, তখন অতি সহজেই বুঝা যায় যে, রূহ তথা আত্মা জন্মান্তরবাদের আওতায় আসে না বরং সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। কিন্তু নফস তথা প্রাণকেই মুক্তি ও দণ্ডের উভয়টির মুখোমুখি হতে হয় বলে জন্মান্তরবাদের প্রশ্নটি তুলতে চাইলে কি ভুল করা হবে? জন্মান্তরবাদ বলতে যদি নফসকে তথা প্রাণকে একটি অন্যরূপ ধারণ করতে হয় এবং সেই রূপটি উন্নতও হতে পারে আবার অধঃপতিতও হতে পারে; কিন্তু একই রূপগুণ নিয়ে যদি পুনরায় আসতে হয় না বলা হয়, তা হলে উহাকে জন্মান্তরবাদ না বলে নফসের তথা প্রাণের রূপান্তরবাদ বললেই কি ভাল মানায় না? অবশ্য রূপান্তরবাদ আর জন্মান্তরবাদ দুটো কথার মূল ভাবধারাটি মূলত একই। শব্দ বিন্যাসের ধাঁধায় না বুঝে মতবাদের বিভিন্নতা এসে পড়ে এবং এজন্য কাহাকেও বিরূপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ অনেকের মধ্যেই একের সৌন্দর্য এবং রহস্য ফুটে উঠে। অনেক না থাকলে একের বিজ্ঞানময় মর্যাদার শান প্রকাশ পেত না এবং মানুষ অভিভূত হয়ে বিভিন্নতার মধ্যে হাবুডুবু খেত না এবং এত মতবাদেরও সৃষ্টি হত না। আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মানুষ একের মধ্যে বহু রূপ দর্শন করে বিভ্রান্তির মরীচিকায় অবগাহন করে এবং এটাই স্রষ্টার বিকশিত রূপের আবরণে ঢেকে রাখার একটি অপূর্ব নৈপুণ্য। সুতরাং এমন একটি বিষয় নেই যে বিষয়টির উপর আজ পর্যন্ত সবাই একমত হতে পেরেছে। এই না পারাটাই বিকাশের চরম সার্থকতা এবং কুদরতের লীলাখেলা। কোরানের প্রথমেই তিনটি অক্ষর দাঁড় করিয়ে আমাদেরকে কম নাকানি চুবানি দেওয়া হয় নি। অথচ এই তিনটি অক্ষরের অবশ্যই অর্থ আছে। কারণ, তিনি কোনো কিছুই নিরর্থক তথা অযথা তৈরি করেন নি বলে ঘোষণাও করেছেন। সুতরাং এই তিনটি অক্ষরের অর্থ যদি নানাজনের কাছে নানা রকম হয় এবং হয়েছেও তাই এবং হতে বাধ্য, তাহলে কার অর্থ সঠিক বলে ধরে নেব? প্রত্যেকেই আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই তিনটি অক্ষরের যে কত রকম ডিজাইনের অর্থ করা হয়েছে তা যারা নানা প্রকার লিখকের তফসির পড়েছেন তারাই জানেন। অধম লিখক এই তিন অক্ষরের কী অর্থ হতে পারে এবং আল্লাহ্ এই তিন অক্ষর দিয়ে কী বুঝাতে চেয়েছেন তার বিন্দু-বিসর্গও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারে নি, তবে বিভিন্ন তফসিরকারদের মতামতটুকু কেবল বলতে পারবো। তবে গবেষণার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত কোরানের তফসিরগুলোকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি এবং এটা কেবল সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

আল্লাহ্তে লীন হওয়া অথবা আল্লাহ্কে পাওয়াই নফসের তথা প্রাণের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। যে পর্যন্ত নফস তথা প্রাণ আল্লাহ্কে রবরূপে ধারণ করার উপযোগী না হয় সে পর্যন্ত তাকে নিজের কর্মফল অনুযায়ী বার বার দেহধারণ করে কি কর্মফল ভোগ করতে হয়? এই কর্মফল ভোগের নামই হল জাহান্নামে বাস করা। তাই কোরানের কোথাও বলা হয়নি যে জাহান্নামে যাবে, বরং বলা হয়েছে জাহান্নামে আছে তথা বাস করছে। কিন্তু জ্ঞানীগণ এই কথা সোজাসুজি না বলে ভবিষ্যৎকালটি লাগিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝাবার জন্য সহজ করা হয়েছে। কারণ, এই দুনিয়ার জীবনটি যে জাহান্নামের জীবন এবং এই দুনিয়ার জীবনে কেহই যে আজ পর্যন্ত খুশি হতে পারেনি এটা কমবেশি সবাই বুঝতে পারি। কারণ, এই দুনিয়ার জীবনে কিছু না কিছু হাহুতাশ, অব্যক্ত বেদনা ও দুঃখ নিয়েই বিদায় গ্রহণ করতে হয়। তাই কর্মের ভোগ ছাড়া প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। নফসের তথা প্রাণের বৃত্তাকারে জন্ম ও মৃত্যুর আসা যাওয়া, ইহারই নাম দুনিয়া তথা সংসার। এই প্রকার দুনিয়া ত্যাগ করে কীরূপে নফসের তথা প্রাণের রবরূপী আল্লাহ্তে ফানা তথা নির্বাণ লাভ করা যায় ইহাই ইসলামের তথা প্রথম মানব আদম (আ.) হতে শুরু করে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (আ.)-এর মূল এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এবং বাকি সমস্ত আদেশ নিষেধের কতগুলো জীবনকে পরিচালনা করার জন্য যে তাগিদ দেওয়া হয়েছে তারও মূল এবং প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা। ফানা তথা নির্বাণ তথা মোক্ষ তথা কামালিয়াত হাসিল না করা পর্যন্ত নফস তথা প্রাণের বার বার জন্ম-মৃত্যুর বৃত্ত হতে মুক্তির আশা নেই। ভোগ-বিলাস, বিষয়ের লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী তথা অনিত্য তথা কিছুদিনের জন্য। কারণ, এসব আসে যায়, কিন্তু থাকে না। তাই ইহাতে অস্থিরতা প্রকাশ করা বোকামি। শরীরে জ্বরের দাহ উপস্থিত হলেই শরীর গরম হয়। কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী তথা অনিত্য। সবাই বুঝি যে এই দেহটি অনিত্য, তবু এই দেহটিকে নিয়েই যত কাজ কারবার করছি এবং 'আমি', 'আমি' বলে কত অহঙ্কারই না করি। কিন্তু এই দেহের মধ্যে যে রূহ তথা আত্মা তথা রবের আদেশ ও কার্যগুলো বীজরূপে লুকিয়ে আছে তাকে বিরাট গাছে পরিণত করি না এবং তার খোঁজখবর নেবার ইচ্ছাটুকুও ভুলে যাই। তাহলে কি ইসলাম সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? অথবা কি বিষয় ত্যাগ এবং কর্ম করতে বলেছে ইসলাম? ইসলাম এসবগুলোর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে বলেছে এবং ত্যাগ করতে বলেছে কামনা বাসনা। কারণ, কামনাই কর্মকে দূষণীয় করে তোলে। কর্ম নির্মল, কিন্তু কামনাই এই নির্মলতাকে দূষিত করে। ত্যাগের আসনে বসে ভোগ চালায় অসাম্যের রাজত্ব এবং এরই পরিণাম হল শোষণ, জুলুম আর নানা প্রকার অত্যাচারের বিশ্রী মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপ। সংসারের আসক্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়েও সংসার করা যায়। বিষয় কামনা না করেও বিষয় ভোগ করা যায়। এবং ফলের আশা না করেও কাজ করা যায়। এবং ইহাই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (আ.) এবং তাঁর বিশেষ সাহাবাদের জীবন ইতিহাসের প্রতিটি দিনের হিসাবের মাঝে জ্বলন্ত

ছবির মত ফুটে আছে। এবং এ জন্যই তাঁরা মরুভূমির এক অবহেলিত স্থানে জন্মগ্রহণ করেও এই মহান আদর্শকে সামনে রেখে সমগ্র পৃথিবীকে একদিন চমকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। মহানবী এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনের আদর্শগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরলে একটি বিরাট আলাদা পুস্তক রচনা করা যায়। অথচ আমরা সেই মহান আদর্শগুলো না হৃদয়ে ধারণ করতে পারছি, না ফেলে দিতে পারছি, এমনই এক অসহ্য পরিবেশের মধ্যে বাস করছি। আমরা সবাই কমবেশি বুঝতে পারি যে, এই কামনাই নফসের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে গ্রন্থিরূপে তথা গিরো তথা গিট্‌ঠু রূপে অবস্থান করছে এবং গিট্‌ঠু তথা গ্রন্থিগুলোর উপরই কামনা ফুৎকার করে দেওয়া হয় এবং এই কামনার ফুৎকার হতে মুক্তি লাভ করে রূহ তথা আত্মাকে কেমন করে জাগ্রত করতে হবে তার শপথ গ্রহণ করতে শিখানো হয়েছে কোরানের বিভিন্ন বাক্যে এবং বিশেষ করে এই কামনার বিষয়টির উপর সাবধান করার জন্য কোরানের শেষ সুরা নাস্‌ই হল একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সে রকম আমরা পাইকারিভাবে যেখানে সেখানে বলে বেড়াই এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করি। তেমনি এই সর্ববিষয়ের উপর কামনা বর্জনের আদেশ উপদেশগুলো চোরাদের মত আমাদের সবার উপরই কি কমবেশি বর্তায় না? বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে একবার বলুন তো।

আবার আমরা বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরীর প্রাণের প্রাণ তথা রূহ তথা আত্মার বিষয়টিতে ফিরে যাই। কোরানে সুরা বনি ইসরাইলের পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া *ইয়াসআলুনাকা আনির্ রূহ কুলির রূহ মিন্ আম্‌রি রাব্বি ওয়ামা উতিতুম্-মিনাল্ ইল্‌মি ইল্‌লা কালিলা।'* অর্থাৎ ‘এবং তারা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, বলুন, রূহ আমার রবের (আল্লাহ্‌র নয়) আদেশ মাত্র এবং এ বিষয়ে তোমাদের অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।'

মহানবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, রূহ কী? তিনি রবের নির্দেশে বললেন, ‘রূহ আমার রবেরই আদেশ, নির্দেশ এবং কাজ'।

রূহ তথা আত্মা মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হবে। আর মানুষকে এই আত্মার জ্ঞান অল্পই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই আত্মার জ্ঞান অর্জন করা যায় না বরং রবের রহমতরূপে লাভ করা যায়। তাই সাধক এই মহান রহমত লাভ করার জন্য কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকে। যদি রবের একান্ত ইচ্ছা হয় তবেই আত্মার জ্ঞান লাভ করা যায়, নতুবা অসম্ভব। সুতরাং কথার দ্বারা অথবা ভাষার মাধ্যমে রূহ তথা আত্মার জ্ঞান বিষয়ে জানতে চাওয়া একদম বৃথা। কারণ, রূহ তথা আত্মাকে বুঝবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তা কামনার মধ্যে বাস করে বুঝবার কোনো উপায় নেই। আমিত্বের বিসর্জন তথা নফসের তথা প্রাণের নির্বাণ লাভ করলেই রূহ তথা আত্মার জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ফানাফিল্লা তথা নির্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কাহারা এবং কে কে? মহানবী বলেন, *‘আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, আখেরুনা মোহাম্মদ, কুল্‌লানা মোহাম্মদ'*। অর্থাৎ ‘আমাদের প্রথম মোহাম্মদ, মাঝখানে আমরাই মোহাম্মদ, শেষেও আমরাই মোহাম্মদ, (এবং) আমাদের সবাই মোহাম্মদ।'

মহানবীর এ রকম সাংঘাতিক ধরনের রহস্যময় বাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে সব কিছু একেবারেই খোলামেলা হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এর রহস্য বুঝে চুপ করে থাকতে অনেকটা বাধ্য হন। সাইনবোর্ড যাদের প্রিয় তারা মহানবীর এসব বাণী ভুলেও প্রচার করতে চাইবে না। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধর্মের বিদ্বানদের বেশিরভাগই নিজেদের সাইনবোর্ডটি বড় বেশি ভালবাসে। এরও কি দৃষ্টান্ত দিতে হবে? হাতের আঙ্গুল কি আয়নায় দেখতে হবে? তবু মহানবীর এই মহামূল্যবান বাণীটির সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই। প্রথম নবী আদম (আ.) হতে শুরু করে সকল নবী এবং রসুলেরা, যেমন হজরত নুহ, মুসা, ইব্রাহিম,দাউদ, সোলায়মান, মরিয়ম, যিশুখ্রিস্ট এবং প্রত্যেক জাতির জন্য প্রেরিত প্রত্যেক নাম না জানা আনুমানিক দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার রসুল এবং মহানবীর বংশের বারজন ইমাম এবং প্রত্যেক উচ্চমানের আল্লাহ্‌র অলীরা সবাই আল্লাহ্‌র মহানূরের মহাসাগরের অধিবাসী। আর তাঁরা সবাই প্রথমে, মাঝখানে এবং শেষে একেরই বিকাশ, একেরই প্রকাশ।

নফস তথা প্রাণের তিনটি রূপ অথবা পর্যায় বলে জানতে পারলাম। আল্লাহ্‌কে তিন পর্যায়ের নফস তিন রকম রূপে দেখতে পায়। যে নফস আল্লাহ্‌কে যেমনভাবে চিন্তা করে তিনি সেই নফসের কাছে ঠিক তেমনিই। নফস তথা প্রাণের উপর অহঙ্কার নামক পরদাটি খুবই হাল্কা। এই পরদাটির আর এক নাম হল ‘আমি, আমি' অর্থাৎ ‘আমি ইহা করি', ‘আমি ইহা করতে পছন্দ করি না' এবং এই হাল্কা পরদাটির নামই হল মায়া, যাকে কোরানের ভাষায় তাগুত বলা হয়েছে। তাগুত বলতে শয়তানকে বুঝানো হয়নি অথবা কোন তৈরী মূর্তিকেও বলা হয়নি। মনের কল্পনার সৃষ্টি মায়া ও কামনাকে তাগুত বলা হয়েছে। সুতরাং ইহাকে শয়তানের বাহন বলা যেতে পারে। কামনায় মেশানো কলুষিত প্রবৃত্তিসমূহের ছায়া যে কোন বস্তুর উপর পড়লেই উহা সঙ্গে সঙ্গে তাগুত হয়ে যায়। কিন্তু কোন বস্তুই তাগুত নয়। মায়ার শক্তি যতক্ষণ নফসের তথা প্রাণের উপর প্রভাবের ছায়া ফেলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে রূহ তথা আত্মার পরিচয় জানতে পারে না। যখন নফস হতে মায়া কেটে যায় অথবা সরে যায় তখন রূহ তথা আত্মার আসল রূপটির পরিচয় পেতে থাকে। কোরানের সূরা ফালাকের মূল বক্তব্যটি এই বিষয়ের উপর পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। তাই কোরানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রধান রগের কাছেই আছেন। কেবল আমিত্বের মায়াটুকু দূর করলেই আল্লাহ্‌র পরিচয় তথা আত্মার পরিচয় জানা যায়। কারণ, রূহ তথা আত্মার দেহ নেই। অতএব ইহা অ-শরীরী এবং মহা এক চৈতন্য। উদাহরণ দিয়ে ইহা যেমন বুঝানো যায় না তেমনি উদাহরণ দিয়ে নির্ণয়ও করা যায় না। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন? বুঝাবে কে? নির্ণয় করবেটা কে? যে রূহ তথা আত্মা হতে সকল প্রকাশ, জ্ঞানের বিকাশ, তাকে কেমন করে কোন বুদ্ধি দিয়ে জানবে এবং জানাতে পারবে? রূহ তথা আত্মাকে আত্মাই জানতে এবং জানাতে পারে। অন্য কিছু দিয়ে জানা এবং জানানো সম্ভব নয়। সুতরাং

রূহের সমস্ত প্রকার কাজকর্ম কেবল রূহই করতে পারে বলেই নফসকে বার বার আদেশ উপদেশ দিতে হয়েছে এই বলে যে, আমিত্ব ত্যাগ কর এবং ফানা হয়ে যাও আল্লাহ্‌তে, তবেই স্থিতিলাভ করতে পারবে, তথা বাকা বিল্লাহতে অবস্থান করতে পারবে। ফানা তথা নির্বাণ তথা লয় হতে না পারলে বাকা তথা নির্বাণ তথা স্থিতিলাভ করা যায় না। কারণ, রূহ তথা আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। রূহ তথা আত্মা কাহাকেও জন্ম দেন না যেমন, তেমনি কাহারো হতে জন্মগ্রহণও করেন না। রূহ নিত্য, শ্বাশত, এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, সর্বপ্রথম এক এবং স্বয়ম্ভূ তথা আহাদ। তাই আমরা কোরানে যদিও আল্লাহ্‌কে 'আমরা' নামক বচনে বহুবার দেখতে পাই, এবং কয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে, কিন্তু রূহকে কোথাও বহুবচনে একবার ভুলেও ব্যবহার করা হয়নি। কোরানের সবখানেই ব্যবহার করা হয়েছে একবচনে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষেও নয়।তাই বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী পুথির ভাষায় বলছেন, 'প্রাণের প্রাণ সেই অসীম আকার–অসীমের সীমা নাহি সীমা ঘর তার। কালাম পড়িতে আছ দেখিয়া কালাম–কেমনে দেখিবে রূপ দেখে যেবা নাম? অক্ষরেতে প্রভু ধরা যাবে না কখন–ধূমপানে পেট পূর্ণ হবে না যেমন।'

রূহ তথা আত্মার রূপটি অসীম এবং সীমারূপে যে ঘরে বিরাজ করে সেটি অনেকটা বিরাট গাছটির একটি ছোট বীজের মধ্যে বাস করার মত। কাগজে লিখিত নাম ও কথা পড়ে কি রূহ তথা আত্মার রূপ দেখতে চাও? এই লিখিত অক্ষরে সাজানো বাক্য পাঠ করে প্রভুকে ধরা যায় না, তথা পরিচয় লাভ করা যায় না। যেমন যতই ধূমপান করা হোক না কেন, তাতে ক্ষুধার জ্বালা যেমন আছে তেমনিই থাকে। বাবা জান শরীফ তাই বলছেন, 'জুব্বা, (আবা), পাগড়ী আর তছবি রেয়াকার-উপরেতে বানাউট ভিতরে আন্ধার। চাদরের নিচে হেন পরীরূপ রাণী–সে চাদর খুলে দেখ মার মাতা নানী।' অর্থাৎ পা পর্যন্ত লম্বা জামা পরিধান করে এবং মাথার উপর অনেক প্যাঁচ দেওয়া কাপড়ের পাগড়ি পরে আর লোক দেখানো জপমালা তথা তসবির দানা হাতে নিলে কি প্রভুকে পাওয়া যায়? যায় না। বরং এটা লোক দেখানো এক প্রকার ইচ্ছাকৃত সাজ। কিন্তু এদের ভেতরে মাল নেই, কেবল অন্ধকার আর শূন্য ফাঁকা। পুঁথির তারপরের বাক্যটি খুবই চমৎকার এবং রহস্যপূর্ণ। নফস-রূপ যে চাদর বিছানো আছে সেই চাদরের ভেতর রূহ তথা আত্মা অবস্থান করছে, আর রূহ তথা আত্মার পরিচয় যখন জানতে পারবে তখনই বুঝতে পারবে যে আল্লাহ্ স্বয়ং বিরাজ করেছেন, অর্থাৎ আদিতেই আদি রূহের পরিচয় লাভ করতে পারবে। যেমন হজরত মুসা কালিমুল্লাহ বলেছেন যে, আমি আদিতেই মুমিন ছিলাম। তারপর বাবা জান শরীফ বলছেন, 'পুঁথি দেখে পুঁথি লেখে কি বুঝিবে তায়–তাতে কি পাইবে মর্ম মরি হায় হায়। বিদ্যা না জানিয়া লেখে সে লেখা হারাম–নফসান খাহেশ এই নহে মনস্কাম।' অর্থাৎ কেবল বই পড়লে আর বই লিখলেই আসল বিষয় জানা যায় না এবং এই সমস্ত লোকদের দেখে সত্যিই দুঃখ হয় যে এরা আসল রহস্যের কিছুই জানতে পারলো না। আসল রহস্যের কিছুই না বুঝে এরা এদের মনের যা পছন্দ হয় তাই লিখে যায় এবং এ রকম লিখা যে অন্যায় এবং নিষিদ্ধ সেটা তারা বুঝতে পারে না। তারা তাদের প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করেই লাভ করে তৃপ্তি। এ রকম লিখনির পরিনাম যে কী রকম ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং ঐক্যের মাঝে বিরাট ফাটলের নানা রকম চোরা গর্ত তৈরি করে এবং বিভ্রান্তির আগাছা গজিয়ে উঠে। তাই বাবা জান শরীফ আবার বলছেন, 'ফকিরে ফকির চিনে, মোল্লা লোকে কিবা জানে? জানে যাহা কেবল গীবত। না জানিয়া লেখে পুঁথি, তাতে কি ফকিরের ক্ষতি, এই মানেতে রহে ছালামত।' অর্থাৎ এটা অপ্রিয় সত্য কথা যে, ফকির তথা যিনি নিজেকে চিনতে ও জানতে পেরেছেন, তথা আত্মার পরিচয় নফসকে পরিশুদ্ধ করে যিনি জানতে পেরেছেন, কেবল তিনিই অপর আর একজন এই ধরনের ফকিরকে জানতে ও বুঝতে পারেন। কিন্তু আরবি ভাষা জানা পণ্ডিত নামক মোল্লাদের পক্ষে এটা জানা কি সম্ভব? ইঁদুর কি সিংহের শক্তির ধারণা করতে পারে? তবে এই মোল্লারা একটি বিষয়ে খুবই ওস্তাদ, আর সেটি হল পরের বদনাম করার বিষয়টি। পরের কোথায় কোন দোষ আছে সে বিষয়ে তারা কী রকম ওস্তাদ তা তাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। বিদ্যার ঠাসা কচকচানির বাহার উপচে পড়ে এদের সর্বাঙ্গ হতে। ফকিরের বিরুদ্ধে এরা যা মনে করে তাই লিখে যায়, কিন্তু মূল বিষয়টিতে অজ্ঞ থেকেও বিজ্ঞতার চমৎকার ভান ধরতে পারে এবং এতে ফকিরের কিছু যায় আসে না।

বাবা জান শরীফ পুনরায় বলছেন, 'দরজা খুলিতে যদি চাহে কোন জন–খোদার জেকের চাহি করিতে সাধন। খোদার কালাম যদি পড়িবে সদায়–খোদ না পড়িলে খোদা পাইবে কোথায়? কালাম পড়িয়া সবে কাল কাটাইল–জনমেতে কোন জন খোদা না পড়িল।' অর্থাৎ রূহের তথা আত্মার জগতের রহস্যের দরজা যদি কেউ খুলতে চায় তাহলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেমন করে যোগাযোগ করতে হবে সেই সাধন-ভজন করতে হবে। খোদার জেকের বলতে খোদাকে স্মরণ এবং সংযোগ করার সাধনায় লিপ্ত থাকার কথাই বলা হয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র কালাম তথা বাণী সব সময় পাঠ করলেই কি হবে? হবে না। কারণ, সেটাই পড়তে হবে, যেটার দ্বারা খোদাকে পাওয়া যাবে। তাহলে কী পড়তে হবে? খোদা পড়তে হবে এবং খোদাকে না পড়তে পারলে খোদা কখনোই পাবে না। অবশ্য এই বাক্যটিতে কেমন যেন একটা বিস্ময় এবং রহস্য জড়িয়ে রাখা হয়েছে। কারণ, খোদাকে পড়তে হবে বললে অবাক হবার কথাই তো। তিনি তাই অতীব দুঃখ করে বলছেন যে, সবাই খোদার বাণী পাঠ করেই জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু খুব অল্পই খোদাকে জানতে চেষ্টা করলো। অর্থাৎ খোদাকে জানা এবং খোদার আসল রহস্যের সন্ধানে ডুবে যাবার আকাঙ্ক্ষা সবার মাঝে দেখা যায় না। অধিকাংশই কথার মধ্যে ডুবে থাকে এবং এটাকেই বড় কিছু একটা করা হল বলে মনে করে আনন্দ পায়। সমস্ত কথার মূল কথাই হল, খোদার রহস্য জানতে হবে এবং এই জানার আহ্বানটিই ধর্মের একমাত্র মূলমন্ত্র। এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীও বলেছেন, *'হাম জেকোঁরা মগজে বা বার দাস্তাম্–উস্‌তে খাঁ পেশে সাগা আনা দাখ্‌তাম।'* অর্থাৎ 'কোরানের মগজ বা মূল বিষয়টি উঠিয়ে

নিয়েছি আর হাড়গুলো কুকুরদের জন্য ফেলে রেখেছি।' তাই মহানবী বলেন, 'তোমার রবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এমনভাবে লেগে থাক যেন মানুষ তোমাদেরকে পাগল বলে ডাকে।'

এখন রূহ তথা আত্মার বিষয়ে কোরান কী বলছে তার সামান্য আলোচনা করতে চাই। কোরানের সুরা মোমিনের পনের আয়াতে বলা হয়েছে, *'রাফিউদ্ দারাজাতি জুল্ আর্শি, ইউল্কির্ রূহা মিন্ আম্‌রিহি আলা মাইয়াশাউ মিন্ ইবাদিহি লিউন্‌জিরা ইয়াউমাত্‌তালাকি।'* অর্থাৎ, 'উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আর্শের অধিপতি, তিনি রূহ নিক্ষেপ করেন তাঁর আদেশ হতে (আল্লাহ্‌র) দাসদের মধ্য হতে যার উপর ইচ্ছা করেন সাক্ষাৎ দিবসের ভয় দেখিয়ে।' এই রূহ তথা আত্মার পরিচয় লাভ করাটাও একটি বিশেষ দান এবং এই বিশেষ দানটি তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাটিই এক ধরনের আইনও বলতে পারেন। কারণ, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা না থাকাটাও এক ধরনের আইন। এই রূহ তথা আত্মাকে নিক্ষেপ করা হয় বলা হয়েছে, যাকে আমরা দানও বলতে পারি। তবে এই দান মোটেই সামান্য নয়, বরং বিরাট। তাই যাদের তকদিরে ইহা লাভ করতে পেরেছে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বিশেষ আশীর্বাদ পেয়েছে। কারণ এই দানটির মূল্য এতই বেশি যে এতে সাক্ষাৎ দিবসটির তথা পরকালের সব কিছু জানা হয়ে যায়। ইহকাল থেকেই পরকালের বিষয় জানবার যে রহস্যটি দান করা হয় উহা একটি মহান এবং বিরাট দান। এই দানে যারা ভাগ্যবান তারাই মানুষকে পরকালের ভয় দেখিয়ে সাবধান করতে পারে এবং বন্ধন হতে কেমন করে মুক্তি লাভ করা যায় সে বিষয়ে আহ্বান জানাতে পারে। এবং রূহকে কেমন করে জাগ্রত করা যায়, কেমন করে আপনার মধ্যে উদ্ভাসিত করা যায়, সেই বিষয়ের একমাত্র শিক্ষকও তারাই যাদেরকে রূহ দান করা হয়েছে। কে দান করেছেন? তিনিই যিনি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন আর্শের প্রভু। আর্শ কী এবং কোথায় থাকে? আর্শ হল আসন। এবং সেই আসনের মালিক কে? মোমিন হল সেই আসনের মালিক। তাই মোমিনের সেই আসনেই তথা কাল্‌বেই প্রভুর প্রভুত্ব বিরাজ করে। এই মোমিন নামক প্রভুর অধিকারীরাই রূহ নিক্ষেপ তথা দান করেন। কাকে দান করেন? যাকে খুশি তাকেই দান করা হয়। এখানে খুশিটাই এক ধরনের আইন। কারো এ রকম আইন পছন্দ না হলে সেটা তার তকদিরের লিখা। তাই তকদিরের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। এই দান করাটি বহুবচনে কিন্তু যাহা দান করা হয় উহা সব সময় একবচন। কারণ, সেই একবচনটির নাম হল রূহ তথা আত্মা।

কোরানের সুরা নাবার আটত্রিশ আয়াতে বলা হয়েছে, *'ইয়াওমা ইয়াকুমুর্ রূহ ওয়াল্‌মালাইকাতু সাফ্‌ফাল্‌লা ইয়াতাকুল্‌লামুনা ইল্‌লা মান্ আজিনা লাহুর রাহ্‌মানু ওয়া কালা সাওয়াবা।"* অর্থাৎ 'সেদিন্ রূহ ও ফেরেস্তারা লাইন দিয়ে (শ্রেণীবদ্ধ হয়ে) দাঁড়াবে, দয়াময় (করুণাময়) যাকে অনুমতি দেবেন কথা বলতে এবং সে সত্য কথাই বলবে।'

সেই দিনটি কবে এবং কেন লাইন দিয়ে দাঁড়াবে? কে কে দাঁড়াবে? যারা দাঁড়াবে তাদের মধ্যে একবচন এবং বহুবচন দুটো একত্রে কেন ব্যবহার করা হল? আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কথা বলবে না এবং যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে যা সত্য কথা তাই বলবে এবং সত্য ছাড়া মিথ্যা বলার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, মিথ্যার মধ্যে বাস করলে তো মিথ্যা বলার প্রশ্ন আসে। কথা কে বলবে? রূহও বলতে পারে, আবার ফেরেস্তারাও বলতে পারে। একজন ফেরেস্তার কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে ফেরেস্তারা, অর্থাৎ অনেক তথা বহু। সুতরাং ফেরেস্তাদের বেলায় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আবার রূহও কথা বলতে পারে, অবশ্য আল্লাহ্‌র একান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। কিন্তু অনেকগুলি রূহ না বলে কেবলমাত্র রূহ বলা হয়েছে তথা একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং রূহের কথা আসা মাত্রই একবচনটি এসে পড়ে, যদিও বাক্যটির ভাষার দিকে চেয়ে মনে হয় বহু রূহকে দাঁড়াতে হচ্ছে। আরো লক্ষ করার বিষয়টি হল যে, এখানে কিন্তু নফসকে দাঁড়াবার কথা বলা হয়নি। কারণ নফসের তিনটি পর্যায় বা শ্রেণী আছে বলেই নফসের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যে নফস পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পেরেছে সেই নফসই কেবল রূহ-ধারণ করতে পারে এবং সেই পরিশুদ্ধ নফসই সব সময় সত্য ও সঠিক কথা বলে। এই পরিশুদ্ধ নফস তথা প্রাণের মধ্যেই রূহ তথা আত্মার আসন। সুতরাং আত্মা এক হলেও পরিশুদ্ধ প্রাণ অনেক। এই অনেক পরিশুদ্ধ প্রাণকেই দাঁড়াতে হচ্ছে। কিন্তু সবাই ধারণ করে আছে জাগ্রত একমাত্র আত্মাকে। যেদিন নফস পরিশুদ্ধ হয়ে বিজয়ী হতে পেরেছে কেবল সে দিনটির কথা বলা হয়েছে। পরিশুদ্ধ হওয়া মানেই আমিত্ব ত্যাগ করা, আর আমিত্ব ত্যাগ করা মানেই মরার আগে মরে যাওয়া। আর মরার আগে মরে যাবার দিনটিকেই বলা হয় 'সেই দিনটি।' সুতরাং সেই বিশেষ দিনটির পরিচয় লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপন রূপ ও চেহারা নিয়ে উদ্ভাসিত ও বিকশিত হয়। সুতরাং মোমিনেরা সেদিন দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেন। আমানুরা নয় এবং দলগত মুসলমানের প্রশ্ন তো আরো অনেক পরে। সেই সাধকেরাও দাঁড়াতে পারছে না যারা সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি তথা মোমিন হতে পারেননি। কারণ মোমিনের নফসই হল রবরূপী রূহের সিংহাসন। সুতরাং মোমিনদের কথাটি না বলে একবচনে রূহকে দাঁড়াতে হচ্ছে। যখন রূহ মোমিনের নফসের মধ্যে প্রকাশ এবং বিকাশ লাভ করে তখন সেই নফসটির কোন রকম নিজের ইচ্ছা থাকে না। বরং সেই নফস নিজেকে রূহতে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয়। আর যত প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সবই আসে রূহের পক্ষ হতে। তাই নফস রূহকে ছায়ার মত অনুসরণ করে যায় সম্পূর্ণ আনন্দে ও নির্ভয়ে। অবশ্য এই আনন্দ নামক ভোগটিও কিন্তু নফসেরই। কারণ রূহ সর্বপ্রকার ভোগের উর্ধ্বে অবস্থান করে। তাই মোমিনেরা আকারে মানুষ হলেও আমিত্বের ভাবধারা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেহেতু মোমিনদের কাজকাম সাধারণ মানুষের মত, তাই মানুষ মোমিনদের চিনতে পারে না। পদে পদে ভুল করে ফেলে। কারণ আচার-ব্যবহারে কিছুটা আলাদা হলেও সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা দেখতে পেয়ে মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। তাই সাধারণ মানুষেরা বলে ফেলে যে, এরা তো আমাদের মতই মানুষ। এই ভুলটি কিছুতেই মন হতে দূর হবে না, যে পর্যন্ত না নিজের আমিত্ব বর্জন করে মোমিন হতে পারবে। আমিত্ব

বর্জনের আগে সাধারণ মানুষ বরং মোমিনদের হাজারো ভুল দেখতে পায় এবং ভুল ধরে এবং যা-তা মন্তব্য করতেও কসুর করে না। অনেক সময় মোমিনদেরকে বিপথগামী বলে ফতোয়াও দেওয়া হয়। কারণ আমিত্বের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে গেলে এ রকমটি হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। মোমিনেরা দাঁড়ায় না বলে রূহ দাঁড়ায় বলা হয়েছে। সত্যিই কোরানের বিজ্ঞানময় নির্ভুল শুদ্ধ চয়নে হতবাক হতে হয়। কত সূক্ষ্ম কথার মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটি নির্ভুল সত্যকে। অগণিত মোমিন দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সবার মাঝেই একমাত্র রূহের বিকাশ ও প্রকাশকে নিয়ে। অগণিত বাল্বের মধ্যে একই বিদ্যুৎ আলো ছড়াচ্ছে। অগণিত ভিসিডি ও ক্যাসেট একই ছবি ধারণ করছে। কারণ, রূহ স্বয়ং রবরূপী আল্লাহ্। কিন্তু ফেরেস্তারা? তারা যত ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, আসলে সৃষ্টি। সৃষ্টির পাশেই তো স্রষ্টা। সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝে না এবং বুঝবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি। অতএব ফেরেস্তারা যদি কিছু বলতে চায় বা বলে তা স্রষ্টার অনুমোদন ছাড়া বলে না এবং বলার অধিকারও দেওয়া হয় নি। কিন্তু মোমিনেরা? তারা কিছুই বলে না, বরং যা স্রষ্টা রবরূপে বলে তারই বাহন মাত্র। 'গুফতায়েউ *গুফতায়ে আল্লাহ্ বুয়াদ্–গারচে আজ হালকু মে আবদুল্লাহ বুয়াদ।'* অর্থাৎ, আল্লাহ্র কথা আল্লাহ্ই বলছেন অথচ উহা আল্লাহ্র দাসের মুখেই শুনা যায়। তাই মোমিনদের চালচলন ও কথাবার্তার রহস্য অনেক সময় ফেরেস্তারাও বুঝে উঠতে পারে না। চমকে যায় এবং আল্লাহ্কে প্রশ্ন করে। কারণ, মোমিনের কথা তো আল্লাহ্র কথা আর ফেরেস্তাদের কথা তো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বাধ্য হয়ে বলা। অবশ্য ফেরেস্তাদের এই পরাধীনতায় সৌন্দর্য। পশুসুলভ সাধারণ মানুষদের স্বাধীনতা অতি জঘন্য এবং ঘৃণিত ব্যাপার। স্বাধীনতা পেয়েও স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে ফেরেস্তাদের স্বভাব অর্জন করতে পারলে এরা ফেরেস্তায় পরিণত হয় না বরং পরিণত হয় ফেরেস্তাদের ইমামরূপে নেতৃত্বদানকারী মহান নেতা রূপে। তখন ফেরেস্তারাই সেই নেতার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত। এই মোমিনদেরকে নিয়েই আল্লাহ্র 'আমরা'-রূপ। আসলে 'আমরা'-রূপটির বিকাশ এবং প্রকাশ না হলে তওহিদ হতে পারে না। কারণ, এই বিকাশ ও প্রকাশের ধারার বিভিন্নতা হতে ছুটে গিয়ে তওহিদের রহস্য বুঝবার আহ্বানটি হয়ে পড়তো অবান্তর। অতএব রূহপ্রাপ্ত প্রতিটি মোমিনই হল আল্লাহ্র 'আমরা'-রূপ। বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ছাত্র ও শিক্ষকদের যত সংখ্যা পাওয়া যায় সেই একই সংখ্যায় বিজ্ঞানী পাবার প্রশ্নটি যেমন হাস্যকর, তেমনি রূহ তথা আত্মাকে জানবার ছাত্র ও শিক্ষক যত পাওয়া যায় সেই অনুপাতে রূহপ্রাপ্ত মোমিনের সংখ্যাটি কিন্তু অনেক কম। মুরিদ এবং পীর সাহেব অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু রূহপ্রাপ্ত পীর সাহেব কয়জন পাওয়া যায়? যদি রূহপ্রাপ্ত পীরের সাক্ষাৎ ও সোহ্বত কেউ না পায় তাহলে সেটা তার তকদির। আবার কেউ যদি পেয়ে যায় তাহলে এই পাওয়াটাও তার তকদির এবং এই তকদিরের লিখন শত বোমা বর্ষণ করেও খণ্ডানো যায় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে খণ্ডানো যায়ও। আবার এই তকদির-খণ্ডানো-যায়-না আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যায়টাও একটি তকদির।

কোরানের সুরা বাকারার সাতাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *'ওয়া আতাইনা ইসাবনা মার্ইয়ামাল্ বাইআয়ানাতি ওয়াআইয়াদ্নাহু বিরুহিল্ কুদ্দুস; আফাকুল্লামা জাআকুম্ রাসুলুম বিমা লাতাহ্ওয়া আন্ফুসুকুমুস তাক্বার্তুম, ফাফারিকান্ কাজ্জাবুতুম্ ওয়াফারিকান্ তাক্তুলুন'।*

অর্থাৎ, 'এবং আমরা মরিয়মের ছেলে যিশুখ্রিস্টকে দান করেছি স্পষ্ট এবং তাঁকে পবিত্র রূহ দ্বারা শক্তি দান করেছি, তবে কি যখনই কোন রসুল তোমাদের মনের মত নয় এমন কিছু এনেছে তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কাহাকেও মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কাহাকেও করেছ হত্যা?'

রূহ কেবল যিশুখ্রিস্টকেই দান করা হয়নি বরং যিশুখ্রিস্ট এতই ভাগ্যবান একজন নবী যার মাতা মরিয়মকেও রূহদান করা হয়েছে এবং কোরানের সুরা নেসার একশত সত্তর আয়াতে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মরিয়মের ছেলে যিশুখ্রিস্টের উপর একটি বিশেষ দান করা হয়েছে যা আর কাউকে দেওয়া হয়নি। যিশুকে দান করা হয়েছে স্পষ্ট। স্পষ্ট বলতে কী বুঝায়? আল্লাহ্র শক্তির পরিষ্কার প্রতীক। কারণ, যিশুখ্রিস্ট যে আল্লাহ্র নিজেরই একটি স্পষ্ট দান তার প্রধান কারণ হল, তিনি জন্মগ্রহণ করার পরই কথা বলতেন এবং নিজের নবুওতের অসংখ্য স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। যে কোনো রসুলকে শক্তিশালী করা হয় রূহ দ্বারা, কিন্তু তাঁকে শক্তিশালী করা হয়েছে পবিত্র রূহ দ্বারা। যদিও রূহ বলতেই পবিত্র, তবু এখানে পবিত্র রূহ বলার মধ্যে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। কারণ বীজরূপে রূহ দান না করে রূহের জাগ্রত পরিপূর্ণ রূপটি তাঁকে দান করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পরীক্ষামূলক নফস তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া তাঁর জন্মগ্রহণের বেলাতেও আল্লাহ্ই একটি সম্পূর্ণ আলাদা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, আর সেটা হল তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন।

নবী ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য

তারপর রসুলদের কথা বলা হয়েছে। রসুল বলতে কী বুঝায়? আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ। কারণ আল্লাহ্র পরিচয় রসুল এবং নবীদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আবার নবী ও রসুল বলতে কী বুঝায়? প্রত্যেক নবী এক একজন রসুল, কিন্তু প্রত্যেক রসুল নবী নন। নবী আর আসবেন না। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে কোন সহিফা আর দেওয়া হবে না। 'হিব্রু ভাষার কোরান' হোক বা 'আরবি কোরান'ই হোক, আর

কাহাকেও এই রকম সহিফা দেওয়া হবে না। কারণ, নবুয়ত খতম। যেহেতু সহিফা নবীদেরকেই দেওয়া হয় এবং যেহেতু নবুয়ত খতম সেই হেতু সহিফার প্রশ্নটিও খতম।

রূহপ্রাপ্ত রসুল এবং মোমিনদের আদেশ-উপদেশগুলো সাধারণ মানুষের কাছে ভাল লাগে না। কারণ, লাগামহীন প্রবৃত্তির ইন্দ্রিয়গুলো সেই আদেশ উপদেশ মেনে চলার প্রশ্ন তো পরের কথা, বরং অহঙ্কারের মত্ততা প্রকাশ করে বিচিত্র ভঙ্গি আর নানা রকম যুক্তি প্রদর্শন করে আত্মতৃপ্তিতে মশগুল থাকতে ভালবাসে। তাই এরা যে কোনো রসুল এবং মোমিনদের আদেশ উপদেশগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় রত থাকে এবং এদেরকে মিথ্যুক, ভণ্ড ইত্যাদি জঘন্য গালাগালি দেয় এবং নানা রকম যুক্তিপূর্ণ দলিল ও ফতোয়া দ্বারা অপমান করে। এবং তাতেও যদি কোন ফল না পায় তাহলে এদের হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না। কারণ, পশুপ্রবৃত্তি রসুল আর মোমিনদের কথাকে অমৃত মনে করে বরণ করে নেওয়া তো দূরে থাক বরং বিষ মনে করে। এই বিষ (?) যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য এরা যত প্রকার কূটকৌশল প্রয়োগ করতেও সামান্য লজ্জা বোধ করা তো দূরে থাক, বরং অহঙ্কারীর ভূমিকায় কিছু একটা বড় কাজ করলাম বলে জাহির করে।

নবী-রসুল এবং মোমিনদের কথা ও উপদেশগুলো লাগামহীন মনের মানুষদের কাছে কোনদিনও ভাল লাগার কথা নয়। তাই কোন প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের বাণীগুলোকে না পারে ফেলে দিতে আর না পারে মেনে নিতে। তখন চেষ্টা চলে মহাপুরুষদের বাণীর আসল অর্থকে কেমন করে ঢেকে বিকৃত ব্যাখ্যার ঢালাও প্রচার করা যায়। এই বিকৃত এবং নানা রকম হেনতেন প্রকারের গোঁজামিল দেওয়া বাখ্যার পচা আবর্জনার স্তূপে ঢেকে যায় আসল কথাগুলো। কিন্তু মহানবীর কোরান এমনই একখানা মহাগ্রন্থ যার বাণীগুলোকে বিকৃত করার উপায় নেই, কিন্তু বাণীর ব্যাখ্যাগুলোকে প্রায়ই সংকীর্ণতার গলিতে ঠেলে দিয়ে নানা রকম গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করে। আর এই ধাঁধার খপ্পরে পড়ে সহজ সরল মানুষেরা, যারা অন্তর দিয়ে বুঝতে চায় সত্যের বাণী। কিন্তু মিথ্যার চাদরের ওজন এতই বেশি যে সত্যটিকে উদ্ধার করে দেখার ভাগ্য সবার পক্ষে হয়ে উঠে না। তাই দেখা যায় কোরানের হুবহু অনুবাদ না করে ভাবগত অনুবাদ করা হয়ে থাকে। কোরান যেখানে রূহ বলছে, অনুবাদক সেই রূহকে রূহ অনবাদ না করে জিবরাইল নামক ফেরেস্তার নামখানা বসিয়ে দিয়ে ভাবের অনুবাদ করে ফেললেন। অবশ্য এই জিবরাইল লিখার কারণগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একবস্তা নানা পেঁচাল শুনিয়ে দিয়ে আপনার প্রশ্নগুলোর ঠোঁটে তালা লাগিয়ে দেবে। আবার অনেকে ভাবতে শুরু করে দেন যে, কোরানে যিশুখ্রিস্টের এত বড় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর মাতা মরিয়মকেও যথেষ্ট মর্যাদার কথা কোরান স্পষ্ট ঘোষণা করছে এবং এও বলা হয়েছে যে, মরিয়মকেও রূহ দেওয়া হয়েছে, অথচ মহানবীর মাতা আমিনাকে রূহ দেওয়ার কথা তো দূরে থাক একবারও কোরানে নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং আমাদের মহানবীর মর্যাদাকে খাটো করা হয়েছে মনে করে একদল সাইনবোর্ড ধারণকারীরা নানা রকম আবোল-তাবোল কথার অবতারণা শুরু করে দেয়। কোরানের কত ব্যাখ্যায় যে এ রকমটি করা হয়ে থাকে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার কথার সত্যতা কতটুকু। সাইনবোর্ডটি কেবল মুসলমান নামক দলের অনেকের কাঁধেই ঝুলছে না, খ্রিস্টানদের মাঝে অনেকের কাঁধেও ঐ একই রকম সাইনবোর্ড ঝুলছে। ধর্মের এত সাইনবোর্ডের গুতাগুতির ফলে একজন সত্যসন্ধানী মানুষের পক্ষে সত্য উদ্ধার করাটা খুব কঠিন সমস্যায় পরিণত হয়। আপনি যে কোনো ধর্মের কয়টি বই পড়ুন, দেখতে পাবেন সত্যের চেয়ে সাইনবোর্ডের গান বেশি গাওয়া হয়েছে। এই রকম নাজুক পরিস্থিতি ও পরিবেশের দরুন ধর্মের দামটি দিনে দিনেই কমে যাচ্ছে এবং নাস্তিক্যবাদ আসার আপনিই সুযোগ পায়। কারণ, সবাই আমরা খাল কেটে যাই, কিন্তু সেই খাল দিয়ে যে কুমির আসবে সেটার কথা একবারও চিন্তা করি না। বিশ্বশান্তির জন্য যে আমাদের ঐক্যের কতখানি দরকার এবং আমাদের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানগুলো যখন আসল ও মূল উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলি তখন এই নানা ধর্মের নানা আচারগুলোই পরিণত হয় অনাচারে এবং এই অনাচার উপহার দিতে পারে কেবল দাঙ্গা আর খুনাখুনির বর্বরতা।

শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর রচিত ইংরেজি ভাষায় কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বহুল প্রচলিত। সৌদি সরকার ইহার লক্ষ লক্ষ কপি বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। কিন্তু তারা হয়তো জানেন না যে, এই ইংরেজি ভাষার তফসিরটি বিজ্ঞজনেরা পাঠ করলেই কেমন যেন হতাশ হয়ে যান। আমি দেখেছি, অনেকে এই তফসির পড়ার পর নাস্তিক হয়ে গেছে। ইহার কারণ হল, এই তফসিরে যেমন অনুবাদে অনেক ভুল পাবেন, তেমনি ব্যাখ্যাতেও। সূরা কাহাফে বর্ণিত জুলকারনাইন-কে আলেকজান্ডার দি গ্রেট অনুবাদ করে তার ব্যাখ্যায় যা মনে ধরেছে তাই লিখে রেখেছেন। এভাবেই মানুষ পথহারা হয়। অথচ ইংরেজি ভাষায় আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর কোরানের তফসিরটি বাজারে সবচাইতে বেশি চালু।

কোরানের একুশ নম্বর সূরা আম্বিয়ার একানব্বই হতে তেরানব্বই আয়াতে বলা হয়েছে :–৯১। *ওয়াল্লাতি আহ্সানাত্ ফারজাহা ফানাফাক্ না ফিহা মিররূহিনা ওয়াজা আল্ নাহা ওয়াব্নাহা আইয়াতাল্ লিল আলামিন।*

৯২। ইন্না হাজিহি উম্মাতুকুম্ উম্মাতাউ ওয়াহিদাতাউ ওয়াআনা রাব্বুকুম ফাবুদুন্।

৯৩। ওয়াতাকাত্তাউ আম্রাহুম্ বাইনাহুম্ কুল্লু ইলাইনা রাজিউন্।

অর্থাৎ, 'আর সেই যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমরা ফুৎকার করেছিলাম তার মধ্যে আমাদের রূহ এবং আমরা তাকে ও তার ছেলেকে করেছিলাম আয়াত (নিদর্শন) অগণিত জগতের জন্য।

'অবশ্যই এই যে তোমাদের জাতি, এ তো একমাত্র জাতি এবং আমিই তোমাদের রব (প্রতিপালক), অতএব আমার ইবাদত কর।

'কিন্তু তারা তাদের মধ্যে এক জাতিকে টুকরো করে ফেলেছে, কিন্তু সবাই আমাদের মধ্যে ফিরে আসছে।' (প্রায় অনুবাদকই ভবিষ্যৎকাল তথা ফিউচার টেন্স ব্যবহার করেন)।

যিশুখ্রিস্টের মাতা মরিয়ম কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলন করেননি। এই কথাটি কোরান অতি পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন। ইহা আল্লাহ্র বিধানের একটি সাংঘাতিক ধরনের ব্যতিক্রম। যদিও আল্লাহ্ কোরানে বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর বিধান বদল হয় না। তবু তিনিই আবার তাঁর বিধানভঙ্গের একটি ব্যতিক্রমকে নমুনা স্বরূপ ঘোষণা করলেন। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও যে তিনি দেখাবার ক্ষমতা রাখেন, ইহা তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। অবশ্য প্রাণী-জগতের মধ্যে এ রকম অনেক আজব আজব ধরনের ব্যতিক্রম তিনি দেখিয়েছেন এবং এই ব্যতিক্রমের নমুনা দিতে গেলে একটি আলাদা বই লিখা যায়। আফ্রিকায় একজাতীয় কাল হরিণ পাওয়া যায়, যারা জীবনেও পানি পান করে না। ইরানে শান্ডা নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, যারা জীবনেও কোন খাদ্যগ্রহণ করে না এবং এই শান্ডা নামক প্রাণীটি আমাদের দেশের অনেকেই দেখেছেন। কথিত আছে এই প্রাণীর চর্বি হতে এক প্রকার মালিশ জাতীয় তৈল হয়। খবরের কাগজে একটি তিন মাসের বকরির বাচ্চাকে প্রতিদিন দুধ দহনের ছবিসহ দেখানো হয়েছে। সন্তান জন্ম না দিয়েই এই ক্ষুদ্র বকরির বাচ্চাটি কী করে দুধ দিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর হল, ইহা বিধানের একটি ব্যতিক্রম। সেই রকম মনুষ্যজাতির মধ্যে আল্লাহ্ একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেন যিশুখ্রিস্টকে। কারণ, যিশুখ্রিস্টের মাতা মরিয়ম ছিলেন সতী, তথা কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হন নি। অথচ সেই সতী নারী মরিয়মের পেটে যিশুর অবস্থানের কথা কোরান ঘোষণা করেছে। ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেকেই ইহা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। তারা নানা রকম অপবাদ ছড়িয়েছে যা পাঠকদেরকে জানাতে ঘৃণা ও লজ্জাবোধ করি। অবশ্য ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশের কোনো এক বিখ্যাত মওলানা সাহেবও কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইহুদিদের সঙ্গে একমত হয়ে যা মনে লেগেছে তাই পাগলের মত লিখে গেছেন এবং সমগ্র তফসিরটি একটি বিভ্রান্তির অন্ধকার রূপেই পরিচিত হয়ে আছে। যদিও সাইনবোর্ড মার্কা কতিপয় লোকের কাছে অনেক বাহ্বা পেয়েছে। ইহাই বোধ হয় নোংরামির জঘন্য নমুনা। অবশ্য এই ধরনের জঘন্য নমুনা সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু না কিছু বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে আর সাইনবোর্ড মার্কারা ‘কী অপূর্ব'! বলে বাহ্বা দিচ্ছে।

যিশুখ্রিস্টের মাতা মরিয়মের মধ্যে ফুৎকার করলেন রূহ তথা আত্মা। আমি-রূপে নয় বরং আমরা-রূপে ফুৎকার করলেন রূহ তথা আত্মা। আমি-রূপে নয় বরং আমরা-রূপে ফুৎকার করা হল একবচনের রূহ তথা আত্মাকে। যদি রাখ ঢাক না করে খোলাখুলি বলতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে, রূহ তথা আত্মা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্। তবে আল্লাহ্রূপে নয়, বরং রূপটির পরিবর্তন হয় রবরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ স্বয়ং মরিয়মের মধ্যে মূর্তিমান। তারপর আল্লাহ্ আমরা-রূপ ধারণ করে মরিয়ম এবং তাঁর ছেলে যিশুখ্রিস্টকে করলেন আয়াত। এই আয়াত শব্দটিও রহস্যময়। কারণ, এই আয়াত বলতে কালিকলমের দাগ নয়, অথবা তুলির নিপুণ আঁচড়ও নয়, বরং একটি মূর্তিমান রহস্যের প্রতীক তথা নিদর্শন। ইহা একটি অভাবনীয় অতুলনীয় বিস্ময়কর নিদর্শন সবার কাছে। এমন কি পৃথিবী নামক একটি জগতের কাছে নয়, বরং পৃথিবীর মতো অগণিত আলামিনের তথা জগতসমূহের কাছে। কেন এই নিদর্শনটি অতুলনীয়? কারণ মরিয়ম সতী অর্থাৎ পুরুষের সান্নিধ্য হতে নিজেকে রেখেছেন দূরে, অথচ পেটে সন্তান। সুতরাং এটা তো একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। যা মানুষ স্বাভাবিক মনে করে না। কারণ স্বাভাবিকতার প্রকৃতি অন্য রকম। তাই এই নিদর্শনটি অবাক করে দেয় সবাইকে। বিদ্রোহী নফসের ইন্দ্রিয়গুলো যাতে সন্দেহের জিহ্বা বের করতে না পারে তার জন্যই আল্লাহ্ এই বিষয়টিকে নিদর্শন বলেছেন। কেবল মরিয়মই আল্লাহ্র একক নিদর্শন নন, বরং পিতা ছাড়া সন্তানটিও তো একটি নিদর্শন। পিতা নেই অথচ সন্তান–এটা কি একটি বিস্ময়কর নিদর্শন নয়? তাই তো সেই সন্তান যিশুখ্রিস্ট আল্লাহ্কে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন। যদিও আল্লাহ্ কাউকে জন্ম দেন না, তবু পিতা বলেই ডেকেছেন। এই ডাক জন্মদাতারূপে নয়, বরং একটি মহান আহ্বান। যেমন আমরা আমাদের ছেলে সন্তানদের সবাই পিতা বলে ডাকি, তাই বলে কি ছেলেরা আমাদের জননীর স্বামী বলে ধরে নেই? ভুলেও না। কারণ, এই পিতা ডাকটি আদরের ডাক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কিছু লোক ধর্মের নামে নোংরা, স্থুল সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলিয়ে যা-তা মন্তব্য ছুড়ে মারে এবং বিরাট ধর্ম-পালন ও-রক্ষা করার নোংরা আনন্দে তৃপ্তি লাভ করে। এই নোংরামি যে কত ডিজাইনের হতে পারে তা এদের লেখা পড়লেই বুঝতে পারবেন। অবশ্য এই নোংরাটা না থাকলে পরিষ্কারের সৌন্দর্য ফুটে উঠে না। আঁধার আছে বলেই তো আলোর মূল্যায়ন। আঁধার যদি না থাকতো তাহলে কি কেউ আলোর মূল্যায়ন নিয়ে এত ঘাটাঘাটি করতো? এই বিষয়টির উপর আমি অবশ্য সামান্যই উল্লেখ করলাম। কিন্তু বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরীর লেখা বইগুলো পড়লে রীতিমত চমকে যেতে হয়। এত স্পষ্ট করে মারেফতের গোপন কথাগুলো খুলে ধরেছেন যে সত্যিই অবাক হতে হয়। তিনি তাঁর রচনায় কোনো প্রকার হেঁয়ালীর আবরণই রাখেন নি। অগণিত জগতের জন্য মরিয়ম এবং তাঁর ছেলে যিশুকে আল্লাহ্ নিদর্শন করে রাখলেন।

তারপর কোরান বলছে যে, এই মানবজাতি তো মাত্র একটি জাতি। অর্থাৎ বহু জাতিতে মানুষকে ভাগ করা হয়নি। এবং এই মানব জাতির রব তথা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। সুতরাং রবের ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ইবাদতের অর্থ অনেক রকম করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ইবাদত বলতে রবের পরিচয় জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইহা অধম লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা এবং আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। অনেক কোরানের তফসিরকারেরা জাতি অনুবাদ না করে ধর্ম অনুবাদ করেছেন। আর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক-একজন এক-এক রকম ডিজাইনের ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য নানা প্রকার ব্যাখ্যার গুঁতাগুঁতিতে পাঠকের মগজের দফা রফা হবার উপক্রম হয়। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যার গুঁতাগুঁতিগুলোও সুন্দরই লাগে। অনেকটা লেজ খাড়া করে দুই ষাঁড়ের লড়াই দেখার মত চমৎকার আনন্দ পাওয়া যায়। এদের ব্যাখ্যার যুক্তিগুলো এতই স্থুল যে দর্শনের ভাষায় জেরা না করাই ভাল মনে করি। ‘অতএব আমার ইবাদত

কর', যেখানে বলা হয়েছে সেই ইবাদতের ধরন-ধারন কেমন হতে হবে? ইবাদত মূলত একই, কিন্তু প্রয়োগের বিভিন্নতা এক রকম নয় এবং হয় না এবং হতেই পারে না। কারণ, মহানবীর পূর্বের নবীদের ইবাদতের বিভিন্নতা থাকবেই। তাছাড়া প্রত্যেক জাতির মধ্যে পাঠানো নবীরা নিজেদের ভাষায় এবং নিজেদের কায়দা-কানুন মত ইবাদত করার পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। অতএব ইবাদতের আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি আলাদা ধরনের হতে পারে, কিন্তু ইবাদত মূলত এক ও অভিন্ন। এতে কারো সংশয় অথবা প্রশ্ন না থাকারই কথা। এরপরও যদি কারো কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে তবে অধম লেখক উত্তর দিতে পারবে না।

তারপরের আয়াতে মানবজাতিকে দোষারোপ করা হয়েছে এই বলে যে, এই একটি মাত্র মানবজাতিকে মানুষেরাই অনেক ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এক মানবজাতিকে অনেক ভাগে ভাগ করাটা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয় বলেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কত প্রকার ভাগের দল, আবার সেই দলের উপদল, আবার সেই উপদলের কত প্রকার যে শাখা-প্রশাখা হয়েছে তারও কি দৃষ্টান্ত দিতে হবে? অধম লেখকের পিতা বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ আমলে পুরনো ঢাকা শহরে কোরানের একটি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দুই দলে কী মারামারি। সেই শব্দটি হল 'অয়ালাদ্‌দোয়াল্‌লীন্' হবে না 'অলাজ্‌জোয়াল্‌লীন' হবে। এই সামান্য একটি বিষয়কে সামনে রেখে যেখানে দুই দলে ভাগ হতে পারে এবং কেবল ভাগই নয় সঙ্গে মারামারি আর গালাগালি তো আছেই। আমাদের এই মতভেদের দরুন আমরা একটি মানবজাতিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। কিন্তু যত ভাগই করি না কেন, শেষ পরিণামটি কী? কোরান বলছে, 'কিন্তু সবাই আমাদের মধ্যে ফিরে আসছে।' অর্থাৎ পুকুরেই থাকি, আর খাল-বিল, নদী-নালার যেখানেই থাকি না কেন, এবং যত রূপধারণ করেই অবস্থান করি না কেন, আমাদের শেষ পরিণাম হল আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যাওয়া, তথা তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে, তা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। 'মৃত্যু' নামক ঘটনার দ্বারা সবাইকে যেমন একাকার করে দেয়, তেমনি মানুষও আদিতে একটিই জাতি ছিল। কোরানের সুরা নেসার একশত একাত্তর আয়াতে বলছে, *'ইন্নামাল্ মাসিহু ইসাবনু মার্‌ইয়ামা রাসুলুল্লাহি ওয়াকালিমাতুহু, আল্‌কাহা ইলা মারইয়ামা ওয়ারূহুন।'* অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই মরিয়মের ছেলে মসীহ্ (যিশুখ্রিস্ট) আল্লাহ্‌র রাসুল এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) কালাম, যা নিক্ষেপ করা হয়েছে মরিয়মের দিকে এবং তাহা হতে (আল্লাহ্ হতে) একটি রূহ।' পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌র পরিচয় জানবার জন্য কমপক্ষে একজন রসুল অবশ্যই পাঠানো হয়েছে, ইহা কোরানের একটি অপূর্ব এবং নিরপেক্ষ ঘোষণা। কমপক্ষে একজন রসুল পাঠানো হয়েছে বলার মাঝে কিছু কথা থেকে যায়। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে একের অধিক রসুলও পাঠানো হয়েছে। তবে বনি ইস্রাইল জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি রসুল পাঠানো হয়েছে। কেন বনি ইস্রাইল নামক জাতির মাঝে এত রসুল পাঠানো হল? হয়তো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। এর কারণ, হয়তো এই জাতিটি খুবই উন্নত জাতি হতে পারে, আবার হয়তো এই জাতির মানুষগুলো সাংঘাতিক ধরনের বেয়াড়া ধরনের হতে পারে বলে মনে হয়। তা যে কারণেই হোক না কেন, এই বনি ইস্রাইল নামক জাতির মধ্যে এত রসুলের আগমন সত্যিই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। হিব্রু নামক ভাষা যাদের মাতৃভাষা ছিল তারাই বনি ইস্রাইল জাতি। কারণ, প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে আল্লাহ্ রসুল পাঠিয়েছেন কেবল এটুকু বলেই শেষ করা হয়নি। বরং যাতে কোন প্রকার হেঁয়ালি অথবা কোন প্রকার প্রশ্ন না উঠতে পারে তার জন্য কোরান স্পষ্ট করে বলছে যে, প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষায় পাঠানো হয়েছে রসুল। যাতে পৃথিবীতে বাস করা কোন মানুষ কোন প্রকার কৈফিয়ত না করতে পারে তারই জন্য কোরানের এই ঘোষণা। আবার সেই সঙ্গে কোরান এই কথাটি বলেও সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে, আর সেই কথাটি হল : সাবধান, নবীদের মধ্যে ছোট বড় করতে যেও না, কারণ তাঁরা সবাই আহাদ তথা অখণ্ড একক সত্তা। কিন্তু আমরা নবীদের ছোট-বড় করেই আনন্দ পাই। আমাদের কলুষিত নফস তথা প্রাণ আসল কাজটিকে বাদ দিয়ে এই ছোট-বড় করার আকামে লেগে থাকি আর এতেই আত্মতৃপ্তি লাভ করি আর মনে মনে ভাবি, কত বড় মহান কাজটাই না করে ফেললাম। এ রকম স্থূল আর নোংরা চিন্তাধারার ডোবায় সবাই কমবেশি অবগাহন করতে ওস্তাদ। আত্মদর্শনের মধ্যেই যে সত্যদর্শনের একটি মাত্র আল্লাহ্‌র বাণী বিভিন্ন ভাষা ও জাতির রসুলেরা বিভিন্ন কায়দাকানুনে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন, সেই মূল বিষয়টির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে চায় না এই কলুষিত মানবীয় প্রবৃত্তি। রসুলকে বড় করতে যারা সবচাইতে বেশি প্রচার করেছেন তারা হলেন শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টান ভাইয়েরা। এদের প্রচার এতই চরমে উঠেছিল এবং সব রকম নোংরামির এতই সীমা ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল যার দরুন মুসলমানেরা এর জবাব দিতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। অধম লেখক মুসলমান বলে বলছি না, বলছি একটি অতি অপ্রিয় সত্য কথা। অবশ্য অনেক শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টান ভাইয়েরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং অনেক খ্রিস্টান ভাইয়েরা এ রকম নোংরামি হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কার এবং কুসংস্কার এই দুটোর একটিও ধর্ম নহে। উভয়টিই অনুষ্ঠান। যদিও সুন্দর এবং অসুন্দরের প্রশ্ন আছে, তবুও দুইটির একটিও ধর্ম নহে। কোনো বিশেষ চিন্তাধারা এবং দর্শনকে ধারণ করাকেই ধর্ম বলে। অনুষ্ঠান এই রকম কিছুই ধারণ করতে অক্ষম। সুতরাং অনুষ্ঠান পালনকে ধর্ম বলা হয়নি। ধর্মের নামে অনুষ্ঠান মনের কিছুটা শান্তি দিতে পারে এবং সেই শান্তিটার রূপ সুন্দরও হতে পারে আবার অসুন্দরও হতে পারে। আপনার মাঝে আপনাকেই চেনবার নাম ধর্ম। তবু দুনিয়াতে যত প্রকার ঝামেলা দেখা দিয়েছে সবই ধর্মের নামে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে।

কোরান একজন রসুলকে যেভাবে বর্ণনা করেছে ঠিক সেভাবেই তার ব্যাখ্যা করা উচিত মনে করি। কোরান এই আয়াতে যিশুখ্রিস্টকে যিশুখ্রিস্ট না বলে একটি বিশেষণ লাগিয়েছেন। সেই বিশেষণটি হল 'মসীহ'। সেই মসীহ যিশুখ্রিস্ট হলেন আল্লাহ্‌র একজন রসুল এবং তিনি তাঁরই ছেলে যার উপর রূহ নিক্ষেপ অথবা ফুৎকার করা হয়েছে সেই মরিয়মের। এবং সেই রূহ কিন্তু বীজরূপী রূহ নয়, বরং বীজের

মধ্যে যেমন বৃক্ষের সব গুণাবলি গুটিয়ে থাকে সেই গুটানো অবস্থায় নয়, বরং পূর্ণ বৃক্ষরূপে ফুৎকার করা হয়েছে বলে সেই রূহের উপরও আর একটি বিশেষণ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বিশেষণটি হল কুদ্দুস তথা রূহুল কুদ্দুস। এই রূহুল কুদ্দুস শব্দটির আবার বিকৃত অনুবাদ করে জিবরিল নামক একটি ফেরেস্তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। রূহ সৃষ্টি নয়, বরং স্রষ্টার আদেশ ও কার্য। কিন্তু জিবরিল নামক ফেরেস্তাটি? যেহেতু ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং যেহেতু জিবরিল যিনি তিনি একজন ফেরেস্তা, সেই হেতু রুহুল কুদ্দুস তথা পবিত্র রূহ বলতে কিছুতেই এবং কোনক্রমেই জিবরিল নামক ফেরেস্তাকে বুঝানো যায় না। সৃষ্টি কী করে রূহ হতে পারে? কারণ, রূহ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তাই এই রূহ লা-মোকামে যেতে পারে, কিন্তু লা-মোকামে সৃষ্টির প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ। বরং সৃষ্টি সৃষ্টির শেষ প্রান্তে যেতে পারে এবং এই সৃষ্টির শেষ প্রান্তটিকে 'সেদরাতুল মোন্‌তাহা' বলা হয়। জিবরিল যেহেতু সৃষ্টি সেইহেতু তার গমনের গতি সেদরাতুল মোন্‌তাহা পর্যন্ত এবং এর বাইরে এক পা-ও এগিয়ে যাবার ক্ষমতা জিবরিল নামক ফেরেস্তার নেই। তাহলে যারা রূহুল কুদ্দুস বলতে জিবরিল ফেরেস্তাকে বুঝানো হয়েছে বলে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখে, তারা যে বিরাট একটি ভুল করছে এবং ভুল উপহার দিচ্ছে এবং ভুলের পরিণতি যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং অনেক করা হয়ে গেছে এর জন্য কি মনে মনে ভুল স্বীকার করে নেওয়া ভাল নয়? তারপর কোরান আবার আর একটি বিশেষণ লাগিয়েছে। সেটা হল, যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম। এই বিশেষণটি একটি সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ, কালাম হল আল্লাহ্‌র বাণী বা কথা। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট জন্ম হতেই আল্লাহ্‌র কালাম তথা বাণী। জীবনে তিনি যা কিছু বলেছেন সবই আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর মধ্যে মূর্তিমান হয়ে নিজের কথা নিজেই বলেছেন। যেমন চরম অর্থে আয়াত বলতে কোরানের একটি বাক্যকেও বুঝানো হয়নি। কারণ কোরানই বলছে যে, যখনই আয়াতের সংযোগ আসে তখনই মানবীয় নফস চেতনা হারিয়ে ফেলে। সমস্ত কোরানের বাক্যগুলো শ্রদ্ধেয় হাফেজেরা সারা দিনরাত মাইকে শব্দ করে পড়ছেন, অথচ কেউ তো কোনোদিন হতচেতন হবার কথাটি শুনি নি। অথচ একটি মাত্র আয়াতের সংযোগে আসার সঙ্গে সঙ্গে হতচেতন হয়ে যাবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কোরানে। তবে সরল এবং সাধারণ অর্থে কোরানের প্রতিটি বাক্য আবার এক একটি আয়াত বলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কারণ, আয়াতের শাব্দিক অর্থ হল পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন এবং বিশেষ দর্শন। এই আল্লাহ্‌র কালামটি কিন্তু নিক্ষেপ করা হয়েছে। কার উপর? মরিয়মের দিকে। এবং আল্লাহ্ হতে আরো একটি দেওয়া হয়েছে। সেটা কী? নফস না রূহ? দেওয়া হয়েছে একটি রূহ তথা আত্মা।

এই রূহ তথা আত্মার জাগ্রত অধিকারী যারা, তারা হলেন নবী, রসুল এবং মোমিনেরা। রসুলের রেসালতের ধারা বন্ধ হয় না, বরং এই ধারা চলে আসছে। এই রেসালতের ধারা যারা পরিপূর্ণরূপে অর্জন করতে পেরেছেন তাদেরকে শরিয়তের দৃষ্টিতে রসুল না বলে বরং মোমিন বলাই শ্রেয় মনে করি। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নেওয়াজকে বড় বড় কাওয়ালরা কাওয়ালিতে রসুল বলে সম্বোধন করেন এবং এই সম্বোধন হাকিকতের দৃষ্টিতে তথা চরম সত্যের দৃষ্টিতে একদম সঠিক এবং নির্ভুল আহ্বান, তবু শরিয়তের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি উচ্চস্তরের মোমিন বলাই অধম লেখক শ্রেয় মনে করে। তবে আমার সঙ্গে কেউ একমত না হলেও বলার কিছুই নেই। কারণ, প্রত্যেকের চিন্তা করার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে।

কোরানের সুরা মরিয়মের সতের হতে উনিশ আয়াতে বলছে, *১৭। ফাত্তাখাজাত্ মিন্ দুনিহিম্ হিজাবান, ফাআর্সাল্না ইলাইহা রূহানা ফাতামাস্সালা লাহা বাশারান সাবিইয়া। ১৮। কালাত্ ইন্নি আউযু বিররাহ্মানি মিন্কা ইন্কুন্তা তাকিয়া। ১৯। কালা ইন্নামা আনা রাসুলু রাব্বিকা, লিআহাবা লাকি গুলমান্ যাকিয়া।*

অর্থাৎ '১৭। সুতরাং তিনি (মরিয়ম) তাদের থেকে (মানুষ হতে) পরদা গ্রহণ করলেন, সুতরাং আমরা তাঁর দিকে পাঠালাম আমাদের (বহুবচন) রূহ (একবচন), অবশেষে উহা (রূহ) তাঁর জন্য পরিপূর্ণ মানুষের সুরত ধরেছিল। ১৮। তিনি বললেন, আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় চাই–যদি তুমি ধর্মভীরু হয়ে থাক। ১৯। তিনি বললেন (মরিয়মের নিজের রূহ বললেন) নিশ্চয়ই আমি আপনারই রবের (প্রতিপালকের) একজন রসুল আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।'

সুরা মরিয়মের এই তিনটি মাত্র আয়াতের হুবহু অনুবাদ যাতে করা হয় সেইদিকেই লক্ষ রেখে ভাষার সৌন্দর্যকে ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করা হয়েছে। কত সাবধানতা যে অবলম্বন করতে হয়েছে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন। এই তিনটি আয়াতের অনুবাদ অন্যান্য তফসিরে কেমন করা হয়েছে তা দেখার সহসা প্রবল ইচ্ছা হলো। আগেই বলে রাখতে চাই যে, যদিও কথাগুলো এখানে বলা মোটেই ঠিক হবে না তবু বলছি যে, আমার একটি প্রচণ্ড শখ অথবা হবি বলতে পারেন, আর সেটি হল কোরানের যত প্রকার অনুবাদ ও তফসির আছে তা সংগ্রহ করা। বিদেশে গেলেও ঐ একই ফিকির। যতগুলো কোরানের তফসিরই হাতের কাছে পাই না কেন এবং এর হাদিয়া যতই হোক না কেন, উহা না নেওয়া পর্যন্ত ছটফট করতে থাকি। অহঙ্কার না হলে বলতাম যে, এত সংখ্যক কোরানের তফসির সংগ্রহ করায় বন্ধুরা অবাক হয়ে যান। কিন্তু সংগ্রহ করলে কী হবে, আসলে অধম লেখক এ বিষয়ে একেবারেই অন্ধ। কারণ, ইনসানে কামেল না হওয়া পর্যন্ত অধম লেখকের পিঠের বোঝা বলতে পারেন। যা হোক, এখন যা বলতে চেয়েছিলাম তাই বলছি। এই তিনটি আয়াতের অনুবাদ যে কত রকমে করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যার প্রশ্নে তো আরো আজব আজব ডিজাইনের। সবগুলো তুলে ধরা মানেই বইটির আয়তন বাড়ানো। রূহকে জিবরিল নামক ফেরেস্তা অনুবাদ করা তো একটা মামুলি ব্যাপার। কিন্তু কোন একটি নামজাদা ফারসি ভাষার কোরান তফসিরের অনুবাদে আঠারো নম্বর আয়াতে 'তকি' নামক এক বদমাইশকে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং সেই তকি নামক বদমাইশটির জীবন বৃত্তান্তের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কুখ্যাত বদমাইশটির কথা যিশুখ্রিস্টের মাতা জানতেন বলে মরিয়মের রূহ যখন পরিপূর্ণ মানব-আকার

ধারণ করলেন তখন সেই বদমাইশটির আগমন হয়েছে বলে মনে করেছিলেন। কী অপূর্ব আবিষ্কার! কোরানের নামে কত প্রকার যে অখাদ্য পরিবেশন করে রাখা হয়েছে এবং এই অখাদ্য হতে অমৃত তুলে আনা যে কতখানি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

যিশুর মাতা মরিয়ম তাদের থেকে পরদা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ মানুষ হতে দূরে থেকে নির্জনস্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অবশ্য সেই আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। ইবাদত হজরত আদম হতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে এসেছে যুগ, দেশ এবং কালের পরিবেশের বিভিন্নতায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইবাদত মূলত এক এবং অভিন্ন। যদিও প্রয়োগ-পদ্ধতির বিভিন্নতা নিয়েই যত প্রকার জটিলতা এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে এক মানবজাতি বহু দল ও গোত্রে ভাগ হয়ে গেছে। এক জাতির ইবাদতের পদ্ধতি অপর জাতির কাছে বিজাতীয় ইবাদত নামে অপবাদ ও গালি দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য ইহা না বুঝার ফলও হতে পারে আবার এক ধরনের হিংসার নোংরা ফসল হতে পারে। তা যাই হোক না কেন, মরিয়ম নির্জন স্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে প্রায়ই বিভোর থাকতেন। তাছাড়া তিনি উপাসনালয়ের একজন সেবিকারূপেও নিযুক্ত ছিলেন। গভীর সাধনায় রত থাকার জন্য নির্জনতার প্রয়োজন কতখানি তা নবী এবং অলীদের জীবনী পাঠ করলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তাছাড়া দুনিয়ার যে কোনো গভীর বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাতে গেলেও নির্জনতার প্রয়োজন হয়। তা ঘরে থেকেও হতে পারে, আবার ঘর ছেড়েও হতে পারে। মরিয়মের নির্জনে এই গভীর সাধনায় মরিয়মের রব খুশি হয়ে দান করলেন রূহ, অর্থাৎ আপনার ভেতরের বীজরূপী রূহকে পূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন একান্ত রবের রহমতে। এই এক বচনের রূহকে রব দান করলেন আমরা-রূপে। আমি-রূপে নয়। এখানে রূহকে পাঠানো বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'আমাদের রূহ' তথা আল্লাহ্‌র আমরা-রূপের রূহ। তাছাড়া রূহ যখন কোনো আকারধারণ করেন সেই রূহের আকারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ মানুষের আকারধারণ করে থাকেন। কোরান অবশ্য এই আকারধারণ করাকে 'বাশারান সাবিইয়া' বলেছে।

মরিয়মের আপন রব হতে বাহির হয়ে রূহ যখন পরিপূর্ণ মানুষের আকার ধারণ করলেন তখন মরিয়ম ভয় পেয়ে গেলেন এবং ভয় পাবার কারণ হল দুটো। প্রথম কারণটি হল, এই রূহের পরিপূর্ণ মানবরূপ দর্শনটি ছিল তাঁর জীবনের প্রথম দর্শন। সুতরাং প্রথম দর্শনে ভয় পাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আর দ্বিতীয় কারণটি হল, তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনের অধিকারিণী। তাই রূহ নারীরূপ ধারণ করলে ভয় পাবার তেমন কারণ থাকতো না। যেহেতু রূহ পুরুষরূপ ধারণ করেছে এবং যেহেতু রূহের আসলরূপটি মানবরূপেই দেখা দেয় সেইহেতু মরিয়মের পক্ষে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। যদিও রূহ যে কোনো রূপধারণ করতে পারে; অনেক সময় রূহ মানবরূপ ধারণ না করে ফেরেস্তার রূপধারণ করেন। ফেরেস্তার রূপ ধারণ করলেই ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়ে যায়। কারণ ফেরেস্তা সৃষ্ট অথচ রূহ সৃষ্ট নয়। যদি রূহ কোনো বিশেষ পরিচিত নামধারী ফেরেস্তার রূপধারণ করে আসেন তা হলে আরো বেশি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যেমন রূহ অনেক সময় জিবরিল নামক ফেরেস্তার আকার ধারণ করেন এবং এতে অনেকেই তখন সেই রূহকে জিবরিল ফেরেস্তার আগমন হয়েছে বলে বিরাট এবং মারাত্মক ভুল করে বসেন। এই ভুলের যে কত রকম গোঁজামিল দেওয়া হয়ে থাকে তা গবেষকেরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন। যেহেতু জিবরিল ফেরেস্তা এবং যেহেতু ফেরেস্তা সৃষ্ট এবং যেহেতু রূহ আল্লাহ্‌র আদেশ এবং রূহ সৃষ্ট নয়, সেই হেতু রূহ বলতে কখনোই জিবরিল নামক ফেরেস্তাকে বুঝানো হয়নি। রূহ যে কোন আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং রূহ যদি মানব আকার ধারণ না করে কোন ফেরেস্তার আকার ধারণ করে এবং বিশেষ করে জিবরিল নামক ফেরেস্তার আকার ধারণ করলেই উহা ফেরেস্তা নয় বরং রূহের একটি ইচ্ছাকৃত ফেরেস্তার আকার ধারণ। কারণ, আকার ধারণ করাটা রূহের জন্য মুখ্য নয় বরং একটি গৌণ বিষয়। কারো রূহ পরিপূর্ণতা লাভ করলে মানব আকৃতিতে দর্শন লাভ করেন, আবার কেউ ফেরেস্তার আকৃতিতে দেখে থাকেন, আবার কেউ অন্য যে কোনো রূপেও দর্শন লাভ করে থাকেন। আসলে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত বীজরূপী রূহ যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে সেই পরিপূর্ণতাই হল আসল বা মূল বা মুখ্য বিষয়। আর বিভিন্ন আকার ধারণ করাটা হল রূহের গৌণ বিষয়। মহানবীর রূহ যে আকার ধারণ করতেন উহা মানবের আকারে আগমন না করে ফেরেস্তার আকৃতি ধারণ করতেন। মহানবীর সেই বিকশিত রূহের ফেরেস্তার আকৃতি ধারণ করে আসতেন বলে নাম দেওয়া হয়েছে জিবরিল ফেরেস্তা। আসলে উহা ছিল জিবরিল ফেরেস্তার কেবল একটা আকৃতি। এই আকৃতিটাই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সৃষ্ট ফেরেস্তা জিবরিল রূহ নয়। কারণ, জিবরিলের পক্ষে লা মোকামে যাওয়া অসম্ভব, যদি না সেই ফেরেস্তা রূহের কেবলমাত্র আকার হয়। রূহের আকার-রূপী জিবরিলের পক্ষে লা-মোকামে গিয়ে কোরানের বাণী বহন সম্ভব, কিন্তু সৃষ্ট ফেরেস্তা নামক জিবরিলের পক্ষে অসম্ভব, কারণ সৃষ্টি লা-মোকামে যেতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

পুরুষরূপে আপন রূহের প্রথম দর্শনে ভয় পেয়ে মরিয়ম আল্লাহ্‌র তথা রহমানের আশ্রয় চাইলেন। তখন মরিয়মের নিজের রূহ, যা মানব আকার ধারণ করেছেন, সেই রূহ বললেন যে, তিনি অবশ্যই মরিয়মের রবের একজন রসুল। ফেরেস্তা জিবরিল কী করে একজন রসুল হতে পারেন? তাঁকে তো কোথাও একটিবারও রসুল বলা হয়নি। তাহলে এই রূহের প্রশ্নে জিবরিল ফরেস্তার আগমনটি কি একটি উদ্ভট কল্পনা নয়? অথবা অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় জিবরিল নামক ফেরেস্তার কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং একজন রসুল জাগ্রত রূহের অধিকারী। রূহ সৃজনী শক্তির অধিকারী। এই রসুলদের নিয়েই আল্লাহ্‌র আমরা-রূপ। এরাই 'কুন ফাইয়াকুন' তথা 'হও' এবং 'ধ্বংস হও' বলতে পারেন। এরা 'হও' বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, সুতরাং সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারার বাইরেও করার ক্ষমতা রাখেন। সেই ক্ষমতার বলেই মরিয়মকে একটি পুত্রদান করার কথা ঘোষণা করলেন। যদিও এই ঘোষণাটি একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ঘোষণা। কারণ, মরিয়ম

বিবাহসূত্রেই হোক অথবা অন্য যে কোনো উপায়েই হোক না কেন, যৌন মিলনে লিপ্ত হননি। আর সে জন্যই এ রকম ঘোষণাটি মরিয়মের কাছে একটি প্রচণ্ড বিস্ময়।

বাইবেলে আছে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, 'আই *হ্যাভ্ মেইড্ অ্যাডাম ইন মাই ওউন ইমেইজ।'* অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি আদমকে আমার আকৃতিতে বানিয়েছি।' আল্লাহ্‌র আকৃতির যে মানব, সে তো সাধারণ মানুষ নয়। সে তো আদম। এই আদম বলার মধ্যেও একটি বিরাট রহস্য আছে। কারণ এই পরিপূর্ণ মানুষের রূপটিই হল রূহের সার্থক রূপ। এই আদমরূপী মানুষটি আমিত্ব বর্জিত মানুষ। এই আদম-রূপের মানুষটি হল আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি। তাই আদমরূপী মানুষকেই পৃথিবীতে প্রথম মানবের আগমন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আদমরূপী মানবের পূর্বে অনেক মানুষরূপী পশু তৈরি করা হয়েছিল কোটি কোটি বছর ধরে। কিন্তু তারা মানুষের মত আকৃতির হলেও তারা ছিল পশুরূপী মানুষ। তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রূহ ফুৎকার করা হয়নি। যেহেতু আদমের আগের পশুরূপী মানুষদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রূহ ফুৎকার করা হয়নি, সেই হেতু তারা আল্লাহ্‌র কাছে প্রথম মানবের স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। যিনি প্রথম আল্লাহ্‌র রূহ ফুৎকার করার ঘোষণাটি পেলেন তিনিই হলেন প্রথম মানব আদম। বিবর্তনবাদের জনক বলে যিনি পরিচিত, সেই ডারউইনের মতবাদ একদিকে যেমন ফেলেও দেওয়া যায় না, অপরদিকে পুরোপুরি গ্রহণও করা যায় না। আল্লাহ্‌র রূহ ফুৎকারটি প্রথম যার উপর করা হয় তিনিই হলেন প্রথম রূহপ্রাপ্ত মানব এবং তার নাম হল আদম। এই আদম হতেই শুরু এবং এর শেষ কবে হবে তা বলতে পারবো না। এই আদমের পর হতেই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বীজ রূপী রূহ দান করা হয়েছে। এই বীজরূপী রূহপ্রাপ্ত মানবজাতিই এই পৃথিবী নামক একটি জগতের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। পৃথিবী নামক অগণিত আরো জগৎ আছে এবং সেই জগৎসমূহে জীবও আছে, যাদের প্রতিপালক তথা রব হলেন স্বয়ং আল্লাহ্। তাই তিনি রাব্বুল আলম অথবা রাব্বুল আলামাইনে নন, বরং তিনি হলেন রাব্বুল আলামিন। তাই এই রাব্বুল আলামিনের জন্যই একমাত্র প্রশংসা অর্থাৎ প্রশংসা পাবার যোগ্যতা কেবল তাঁরই যিনি রাব্বুল আলামিন। রূহ তথা আত্মা তথা প্রাণের প্রাণ তথা যে কোনো নামই দেওয়া হোক না কেন, আমাদের আসল বিষয়টি এই বলার ছিল যে, নফস তথা চিত্তসমূহের বিকাশ তথা প্রাণ এবং রূহ তথা আত্মা বলতে এক জিনিসকে বুঝানো হয়নি। নফস এবং রূহ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন বিষয়। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, এই নফস ও রূহকে প্রায় ইসলামিক চিন্তাবিদেরা এক রকম মনে করে নিয়েছেন এবং এর ফলে গোঁজামিল দিতে হয়েছে এবং এই গোঁজামিলগুলোকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য প্রাক্তন দলিলপত্র এবং অনেকের দোহাই দিয়েছেন। তবু নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করে নিতে পারেননি। অবশ্য ভুল স্বীকার করে নেবার মত মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। নিজে যা বুঝতে পারে সেটাই সঠিক মনে করে নেবার প্রবণতার জন্ম হয় আত্ম-অহঙ্কারের চিকন গলি দিয়ে। ধরাই যাবে না যে এটা এক ধরনের চিকন আত্ম-অহঙ্কার। এই চিকন অহঙ্কারটি একটি চিকন আমিত্ব। ইহা এতই চিকন যে হৃদয় ধরতে পারে না এবং এর থেকে মুক্তি লাভ করাই বোধ হয় আমিত্বের শেষ ধাপ অতিক্রম করা। কারণ, ঘরসংসার ফেলে অতি সহজেই একজন আল্লাহ্‌কে পাবার পথে চলে আসতে পারে, কিন্তু এই চিকন অহঙ্কারটি ফেলে আসা সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার। কারণ, ইহা নিজের স্বকীয়তার কোরবানি। কেহই নিজের স্বকীয়তাকে স্বেচ্ছায় কোরবানি দিতে চায় না। কী নির্মম আর বৈজ্ঞানিক এই প্রকৃতির কোলে লালিত এই বিধান। এর কাছে সবাই আমরা হেরে যাই। যারা এখানেও পরাজয় বরণ করে না, তারাই বিভিন্ন নামের মহাপুরুষ তথা মোমিন। সমগ্র কোরান কেবলমাত্র এই একটি মাত্র উপদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় কোনো উপদেশ দেওয়া হয়নি। যার জন্য কোরানের ভাষার ভাব ও সৌন্দর্য রহস্যের ইঙ্গিতে ভরপুর। লক্ষ আদেশ আর উপদেশ দিলেও মানুষ যে এই শেষ দেয়ালটি ভাঙতে চাইবে না, এটা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন বলে একই উপদেশকে কত রকমে কত রূপের শৈলীতে প্রকাশ করে গেছেন। তাই তো দেখতে পাই, এই জনতার বাগানে আমিত্ব নামক পামড়ি পোকার আক্রমণে সবাই সবুজতা হারিয়ে ফেলছি। তবু তো যুগে যুগে কিছু ফুল ফোটে : কখনো বেশি আবার কখনো কম।

যখন কোন সাধকের রূহ পরিপূর্ণ রূপধারণ করে, তখন উহা অভাবনীয় শক্তি অর্জন করে। সেই শক্তির গতি একদিনে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে। এই গতি স্থান ও কালের মাঝে বাঁধা-ধরা দৈহিক গতি কিনা বলতে পারবো না। কারণ, এই গতির প্রশ্নে অধম লেখক অন্ধ তথা জানে না। মনে হয় ইহা আধ্যাত্মিক গতি। কারণ, রূহ যখন যেমন খুশি নিজের রূপ, বৈশিষ্ট্য ও সত্তাকে আপন ইচ্ছামত বদলিয়ে নিতে পারেন। এবং তখনই যোগাযোগটি হয় চিরস্থায়ী এবং এই চিরস্থায়ী যোগাযোগ যারা করতে পেরেছেন তারা মোমিন। তারা আমানু নন। তাই কোরানে একটি বারও এই কথাটি বলা হয়নি 'ইয়া আইয়ুহাল্ মোমিনু'। বরং বলা হয়েছে 'ইয়া আইয়ুহাল্ লাজিনা আমানু'। সুতরাং দেয়ালের বাইরে আদেশ আর উপদেশ দেয়াল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে পারলে আদেশ আর উপদেশ তখন সম্পূর্ণ নিরর্থক। সুতরাং নিরর্থক কথা একটিও কোরানে নেই। 'আস্*সালাতু মেরাজুল মোমিনিন।'* অর্থাৎ, মোমিনদের সালাতই তথা যোগাযোগই হল মেরাজ। আমানুদের সালাত মেরাজ নয়। কারণ, তাদের সালাত কায়েম হয় না। আর সালাত কায়েম হয়ে গেলে আমানুও আর থাকে না, আমানু তখন মোমিনে পরিণত হয়। তাই এই কথা বলা হয়নি, 'আস্সালাতু মেরাজুল আমানু'। কী বিজ্ঞানময় নির্ভুল ঘোষণা! আর কী অপূর্ব শব্দ চয়ন!

সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন কিছু একটা লিখতে হচ্ছে যা পড়ে অনেকেই হাসবে। সেই হাসির বিষয়বস্তুটি হল, ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে সঙ্গীত কি হারাম না হালাল? এই অপদার্থ প্রবন্ধটি লেখতে হচ্ছে একটা বিশেষ কারণে। সমাজের কিছু পঙ্গু মন-মানসিকতা নিয়ে সকল যুগেই বাধা আসতো। সঙ্গীতের বিষয়টি নিয়েও পঙ্গু মন-মানসিকতার পরিচয় ধর্মের নামে আমরা দেখতে পাই আজও। ভাল্লুকের হাতে খোন্তা দেবার মত বিপদ ডেকে আনে, যারা ধর্মের বিশাল ভূমির এক কোণে বসে সব কিছুর সিদ্ধান্ত চোখের পলকে নিয়ে বসে। এ জন্যই বোধ হয় বলা হয় থাকে যে, একজন অপদার্থ পাঁচ মিনিটে যতটি প্রশ্ন করতে পারেন ততটির উত্তর একজন জ্ঞানী পাঁচ দিনেও দিতে হিমশিম খায়। এই জাতীয় অপদার্থদের দ্বারা সাধারণ মানুষেরা ভুল করতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। কারণ, এ যুগে সব কিছু গবেষণা করে দেখার মত সময় নেই। সমগ্র কোরানে মদ, শূকর, সুদ আর মৃত প্রাণীর মাংস হারাম করার যে রকম প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়েছে, সঙ্গীত বিষয়টির উপর কোনো কথাই বলা হয় নি। সুতরাং আমাদের আশ্রয় নিতে হবে মহানবীর বাণী সমূহে তথা হাদিসে। হাদিসের কথা উঠলেই আবার প্রশ্ন দেখা দেয় যে ইহা সত্যিই মহানবী বলছেন কিনা। সঙ্গীত হালাল হবার যথেষ্ট দলিল হাদিস হতে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই দলিলগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ, কিছু মোল্লারা সঙ্গীত হারাম হবার হাদিস নাকি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমি সঙ্গীত হারাম হবার মত হাদিস একটিও আজ পর্যন্ত পাইনি। ধরে নিলাম সঙ্গীত হারাম হবার হাদিস পাওয়া গেল, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? পরস্পর বিরোধী কথার সমাবেশ দেখতে পাব। মহানবী কি পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন? যদি সঙ্গীত হারাম হবার একটিমাত্র হাদিসও পাওয়া যেত তাহলে অবশ্যই তা তুলে ধরতাম। আসলে কিছু কাঠমোল্লারা গবেষণা করে সাব্যস্ত করেছে যে সঙ্গীত হারাম। তাদের গবেষণার জন্য অনেক ধন্যবাদ। অধম লেখকের এই ধন্যবাদ তাদের কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা পড়ার মত যন্ত্রণায় ক্ষুধার্ত সিংহের মত গর্জন করে লেজ নাড়তে শুরু করে দেবেন। কারণ, এদের নকশা-নমুনা কী রকম অধম লেখক ভাল করেই জানে। কারণ আমিও একদিন এই শিয়ালদের দলের এক শিয়াল ছিলাম। অবশ্য বলতে লজ্জা নেই যে, এখনো আমি শিয়ালই, তবে ধোপার নীল জলে চুবান খেয়ে গায়ের রংটা কেবল নীল রূপধারণ করেছে। রাজসভায় বসালে সেই আদি শব্দটার চিৎকারই আশা করতে পারেন। আর সেই চিৎকারটাই হল এই অসভ্য প্রবন্ধটির অবতারণা।

প্রথমেই বলতে চাই বিশ্ববিখ্যাত দুইজন মহাপুরুষের কথা। প্রথমে যাঁর নামটি বলবো তাঁর সম্বন্ধে এত বড় সাংঘাতিক মন্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের সমস্ত বইগুলোও যদি হারিয়ে যায় তবু কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি ইমাম গাজ্জালীর *এহিয়ায়ে উলুম উদ্দিন* নামক বিরাট বইটি বেঁচে থাকে। ইমাম গাজ্জালীর পর যার নামটি বলবো তাঁর লিখিত গ্রন্থটিকে তিনি নিজেই মানুষের রচিত কোরান বলে ঘোষণা করেছেন এবং তা একমাত্র ওহাবিরা এবং তাদের অনুসারীরা বাদে সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। তাঁর নাম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী এবং সেই অমর গ্রন্থটির নাম *মসনভী।* এই দুইজন মহাপুরুষ সঙ্গীতকে হালাল বলে কেবল ঘোষণাই করেননি, বরং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। এমনকি সঙ্গীতের তালে তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচতেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী তো তাঁর সাথীদের নিয়ে সঙ্গীত শ্রবণে এমন বিভোর হয়ে নাচতে থাকতেন যে কখনো কখনো বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেরতেন। এখন সঙ্গীত যদি কিছু কাঠমোল্লাদের কাছে হারাম হয়ে থাকে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবার ফতোয়া দেওয়া হয়, তাহলে এই দুই মহাপুরুষের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? তাছাড়া এই অত্যাধুনিক যুগে যারা সঙ্গীতকে হারাম বলে মনে করেন তাদের বাড়িতে বাড়িতে খানাতল্লাশি দিলে কি রেডিও, টেপ এবং টেলিভিশন সেট পাওয়া যাবে না? এ রকম পাগলামি কথাবার্তার দ্বারা ওজন বাড়াতে গিয়ে সমাজকে বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই দিতে পারেন নি তারা। কিছু সংখ্যক কাঠমোল্লারা এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ওহাবি মোল্লারা এবং তাদের অনুসারীরা এই দুই মহাপুরুষের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। অবশ্য উপরে উপরে এই দুই মহাপুরুষকে ভাল বলবে, কিন্তু ভেতরের ঘৃণাটি যে বোবার মত মনের ভেতর গর্জন করছে তা কিছুদিন এদের সাথে থাকলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের সৌদি আরব নামক দেশটিতে রাজকীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রচার বিভাগের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশনে সঙ্গীত পরিবেশন কি করা হয় না? কাগজের টাকা, যাকে আরবিতে রিয়েল বলা হয়, সেই রিয়েলের উপর বাদশাদের ছবিগুলো কি দেখতে পান না? আপনাদের বেলায় সব হালাল হয়ে যায় আর আমাদের বেলায় কেবল ফতোয়ার তরবারি দেখানো হয়। আমাদের জাতীয় কবির ভাস্কর্যকে মূর্তিপূজার নাম দিতে পারেন আর আপনাদের রিয়েলের উপর বাদশাদের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোয় কি মূর্তিপূজা হয় না? কী চমৎকার ফতোয়া! আপনাদের আমরা মোটেই অশ্রদ্ধা করি না। কিন্তু এ রকম কথাবার্তায় যদি শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে চায় তার জন্য দায়ী কারা? আপনারা আমাদেরকে মিসকিন বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেন, কিন্তু কোরান কি মিসকিনের প্রতি ভালবাসা দেখাতে বার বার আদেশ করেনি? ফকিরের চেয়ে যে অধম তাকেই মিসকিন বলা হয়। আর সেই মিসকিন বলে ঠাট্টা করাটার কোনো একটি দলিল কোরান-হাদিস হতে দেখাতে পারবেন? অবস্থার চাপেই একদিন যারা মিসকিন তারা হয় আমির আর যারা আমির তারাই হয় মিসকিন। জানি না, এটা কি ভবের লীলাখেলা, না পুঁজিবাদের অভিশাপের নর্দমা; যে নর্দমা দিয়ে একদিন কমিউনিস্টদের আনতে হয় না, বরং আপনিই এসে পড়ে। এর জন্য দায়ী কারা? আর সেই জন্যই প্রথমে আমাকে সঙ্গীত বিষয়টিতে একটি অপদার্থ এবং পঙ্গু প্রবন্ধ বলতে হয়েছে। *মারেফতের বাণী* বইটিতে এ রকম একটি অখাদ্য প্রবন্ধ যোগ করতে হবে, ইহা ভাবিনি। কারণ, 'ইংরেজি পড়া হারাম' ফতোয়া শোনার মত আমাদের পরের বংশধরেরা সঙ্গীতের বিষয়টি পড়ে হাসবে।

সঙ্গীত হালাল না হারাম এ বিষয়ের উপর কিছু লেখার আগে কয়েকটি বিষয়ের উপর সামান্য কথা বলতে চাই। আর সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল কোরান বলছে, 'তোমার আগে যে সকল রসুল পাঠিয়েছি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর'। কোরানের এই একটি বাক্যকে যদি আমরা ভাল করে তলিয়ে দেখি তাহলে কিন্তু প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্নটি হল, মহানবীর আগের অনেক রসুলেরা তখন জীবিত ছিলেন না। অথবা কোরান মহানবীকে আদেশ দিচ্ছে যে, অতীতের রসুলদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন যে এই জাতীয় কাজের আদেশ-নিষেধ করা হয়েছে কিনা। যদি মহানবীর পূর্বের রসুলেরা সত্যিই মৃত হয়ে থাকেন তাহলে কোরানের এই জিজ্ঞেস করার আদেশটির কি কোনো মূল্য থাকে? পূর্বের রসুলেরা যদি সত্যিই মৃত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা মহানবীর কথা কেমন করে শুনবেন? মহানবীর পূর্বে বহু রসুলকে বহু স্থানে কবর দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করার কথা কোরান বলেনি। কারণ, মাটির দেহটি আত্মা নয়। আবার দেহটি যে স্থানে রাখা হয়েছে উহাও কবর নয়। তবে সমাজের দৃষ্টিতে মাটির গর্তটিকেই কবর বলে থাকি। তাই কোন রসুলই মাটির দেহ নামক কবরে যেমন আবদ্ধ নন, তেমনি মাটির গর্তেও সীমাবদ্ধ নন। এজন্যই মহানবীকে কোরান আদেশ করছে যে, আপনার পূর্বের রসুলদের যে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। জিজ্ঞেস করার অর্থই হল, উত্তর পাওয়া। সুতরাং পূর্বের রসুলদের নিকট হতে উত্তর পাবার অর্থই হল, তাঁরা মৃত নন। কোনো এক ঘটনার পরিবেশে মহানবীকে হজরত উমর ফারুক (রা.) বলেছিলেন যে,আপনি প্রাণহীন মৃতের সঙ্গে কেন কথা বলছেন? উত্তরে মহানবী বললেন, তারা তোমার চেয়েও বেশি শোনে।

শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা, এটা যুক্তির যুগ। সাইনবোর্ডের দিন চলে গেছে। যদিও স্বীকার করতে বাধ্য যে, যুক্তি সব কিছুর সমাধান দিতে না পারলেও বিবেকের চোখ দুটো খুলে দিতে পারে।

কোরানের এই বাক্য হতে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। আর সেটি হল মহানবীর পূর্বের রসুলেরা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সবার উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকলে আমাদের মহানবী কি জীবিত নন? তিনি কি একটি দেহের মধ্যেই আবদ্ধ? তিনি কি আমাদের কথা শুনতে পান না? তিনি মিলাদ মাহ্‌ফিলে আগমন করলে কি দাঁড়িয়ে কেয়াম করা অবশ্য কর্তব্য নয়? তাঁর আগমনে বসে বসে নবীকে সালাম দেওয়া কি জঘন্য বেয়াদবি নয়? ক্লাসে, কোর্টে, রাষ্ট্র প্রধানের আগমনে আমরা কি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি না? এই দুনিয়ার সামান্য ব্যাপারে যেখানে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি সেখানে মহানবীর আগমনে বসে বসে কেয়াম করা কি অন্যায় নয়? সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে একবার নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখুন না আপনার বিবেক কী উত্তর দেয়। আর একটি প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে যে, একসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ মিলাদ মাহফিল যেখানে একই সময়ে হচ্ছে সেখানে মহানবীর পক্ষে এত মাহফিলে একই সঙ্গে কী করে আগমন সম্ভবপর?

এক আজরাইল যদি সর্বজীবের প্রাণহরণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করেন এবং এক শয়তানের যদি সব মানুষকে ধোঁকা দেবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন, তাহলে মহানবী কি মাত্র কয়েক লক্ষ মিলাদ মাহফিলে আগমন করতে পারেন না? যে মহানবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্‌ কিছুই সৃষ্টি করতেন না সেই প্রিয় মহানবীর ক্ষমতা কি আজরাইল আর শয়তান হতেও কম বলতে চান? যদি তাই মনে করে থাকেন তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ, কোরান বলছে, ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ নেই। আবার কোরান বলছে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সুতরাং আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন এবং এই করাটাও একটি তকদিরের লিখন।

সঙ্গীত বিষয়টির বেলাতেও মতবিরোধ আছে। তবে যারা সঙ্গীতকে হারাম বলতে চান তাদেরকে একটি অনুরোধ করতে চাই যে, অন্তত হারাম না বলে পছন্দ হয় না বলাটাই ভাল। তারপর গ্রহণ করা না-করা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত ব্যাপার এজন্যই বলতে হল যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মতবাদ আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি যা সবাই একবাক্যে মেনে নিতে পেরেছে। এই পারা না-পারাটাও তকদিরের লিখন। সমর্থন করাও তকদির এবং বিরোধিতা করাও তকদির। যেমন শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র অলীদের কেরামতে বিশ্বাস করেন না, অথচ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের লাথি-গুঁতোগুলো একান্ত বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করেন। যদি বিজ্ঞানী বলে কেউ না থাকতো তাহলে তের হাত জিহ্বা বের করে যে বিরোধিতা করা হত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোরানে বর্ণিত আসহাবে কাহাফ তিনশত নয় বছর গুহার ভেতর ঘুমিয়ে ছিলেন। এই আসহাবে কাহাফ কিন্তু নবী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বনি ইস্রাইলদের অলী। না খেয়ে এভাবে এতটি বছর ঘুমিয়ে থাকাটা কি অলীর কেরামত নয়? পানাহার বিহনে এতদিন কী করে বেঁচে থাকলেন? তাদের শরীরকে এতদিনেও মাটি গ্রাস করতে পারলো না কেন? তাহলে কেবল নবীদের শরীরকেই মাটির জন্য হারাম করা হয়নি, বরং আল্লাহ্‌র অলীদের শরীরও যে মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে কোরানে বর্ণিত সূরা কাহাফ হতে এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাংলার বিখ্যাত মাওলানা হাফেজ মঈনুল ইসলাম সাহেব রচিত *তবলীগ দর্পণ* বইটির ব্যাপক এবং বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। এই *তবলীগ দর্পণ* বইটি পড়লে আপনি এমন কিছু অজানা তথ্য জানতে পারবেন যা আপনাকে অবাক এবং বিস্ময়ে অভিভূত করবে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যত চরম উন্নতিই হোক না কেন, একটি মানুষ তিনশত নয় বছর কোন প্রকার খাদ্য এবং পানীয় না গ্রহণ করে বেঁচে থাকার সমর্থন দিতে পারে না। কারণ, মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় যদি আল্লাহ্‌র খাস রহমত বর্ষিত না হয়। কাহাফবাসীরা ছিলেন আল্লাহ্‌র অলী এবং তাঁরা অতি উঁচু স্তরের অলী বলেই এত বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। গুহার মাটিও তাঁদের দেহকে গ্রাস করা তো দূরের কথা বরং ভালবাসার স্পর্শে মায়ের কোলে তুলে রাখার মত সযত্নে রেখেছে। অলীরা যে মারা যান না এবং মাটি যে তাদের দেহ খেতে পারে না এর চেয়ে বড় জ্বলন্ত নজির যাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবার পরও বুঝতে পারেন না তাদেরকেও দোষারোপ করা যায়

না। কারণ, এটা তাদের তকদির। তকদিরের অভিনয় তাদের করতেই হবে–এটাই বিধির বিধান। মানুষের মধ্যে স্রষ্টার নৈকট্য এবং নির্বাণ না হতে পারলে এত শত বছর পর দিব্যি ঘুম হতে উঠেই বাজারে যেতে পারে না। বস্তুর বিজ্ঞান যতটুকু উন্নত হয়েছে তাতে এই রহস্য অনুধাবন করা অসম্ভব। যে বিজ্ঞানের উন্নতি সেটাও মানুষই করেছে। যে বর্বরতার জঘন্য কীর্তিকলাপ সেটাও মানুষই করেছে। মানুষই স্রষ্টার রহস্য এবং স্রষ্টাও যে মানুষেরই রহস্য কাহাফবাসীদের ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। তাই বলা হয়ে থাকে, *সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।* মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নহে। তাই আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রসুল তথা বার্তাবাহক অবশ্যই পাঠিয়েছেন সেই জাতির ভাষায়, যেন সেই রসুল আল্লাহ্র সব রকম নিদর্শন বর্ণনা করে পথের সন্ধান দিতে পারেন। কোরান এই কথা কয়টি বার বার ঘোষণা করেছে। মদিনার খেজুর গাছ বাংলাদেশে বুনলে সেই খেজুর হয় না কেন? এক দেশের জলবায়ুর সঙ্গে যেমন অন্যদেশের জলবায়ুর মিল নেই সে রকম একদেশের আচার-আচরণ অন্যদেশের সঙ্গে মিল হয় না। একদেশের আবে জমজমের পানি যদি তাদের কাছে পবিত্র মনে হয় তাহলে অন্যদেশের কোন রসুল বর্ণিত পানিকে পবিত্র বলে ধারণা করাটা কি অন্যায় বলতে চান? বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ আর বৈচিত্রের বিকাশ তো স্বয়ং স্রষ্টাই এক রকম করে দেননি। তাহলে একে অপরকে ঠাট্টা তামাশা করাটা কি অন্যায় নয়? এক এক দেশের এক এক রকম প্রয়োগ-পদ্ধতি থাকবেই এবং সব প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো একই রকম হতে হবে বলে যারা মনে করেন তাদেরকে বলার কিছু নেই। কারণ, হয় এটা তাদের তকদির, না হয় নোংরা চিন্তাধারার শিক্ষা হতে এ রকম উদ্ভট কথাবার্তা শিক্ষালাভ করেছে এবং সকল ধর্মের ব্যাপারে এ রকম নোংরামির শিক্ষা কিছু না কিছু দেওয়া হয়ে থাকে। তাই বাংলার অন্যতম সুফি সাধক বাবা লালন ফকিরকে বলতে হয়েছে যে, বিশ্বনবী কে আর কে ছোট নবী এসব ফালতু বিষয় নিয়ে লালনের মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? কারণ, লালন তো লালনকেই চিনতে পারলো না। লালন মারা যাচ্ছে পানির পিপাসায়, অথচ লালনের সামনে দিয়েই মেঘনা নদীর মিষ্টি জল বয়ে যাচ্ছে। কী অপূর্ব দর্শন! কী চমৎকার খট করে আঘাত লাগে পাথরের মত মনটাতেও! কী বিস্ময়কর সত্য কথাটি সবাইকে জানিয়ে দেবার প্রয়াস!

কোরানের একটি শব্দের বিকৃত অনুবাদ যে কত মারাত্মক ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে এবং কোরানের উপর অশ্রদ্ধা আনয়ন করে তার একটি সামান্য নমুনা তুলে ধরতে বাধ্য হলাম। অনুবাদকারীরা চিন্তাই করে না যে, এর পরিণতি পরে কী হতে পারে। বরং তিনি বিরাট একটি মহান সওয়াবের কাজ করে ফেলেছেন বলে মনে মনে বিরাট তৃপ্তি লাভ করেন। এই রকম অশ্বডিম্ব প্রসব আজ থেকে শুরু হয়নি, বরং বহু বছর আগে থেকেই এর আরম্ভ। সুতরাং এই অশ্বডিম্বের তলে যে আসল বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে তা সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা অধম লেখকের পক্ষেও ধরা সম্ভবপর হত না যদি না ফ্রান্সের মরিস বুকাইলি রচিত *বাইবেল, কোরান ও বিজ্ঞান* নামক বইটি পড়ার সুযোগ হত। আমরা প্রায় সবাই জানি যে, কোরানের যে প্রথম সুরাটি নাজেল হয়েছে উহার নাম সুরা আলাক। হজরত খলিফা উসমান (রা.) এই প্রথম সুরাটিকে ধারাবাহিক নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে না রেখে প্রায় শেষের দিকে ছিয়ানব্বই নম্বরে নিয়ে ফেলেছেন। এই সুরা আলাক মাত্র পাঁচ আয়াতে (বাক্যে) নাজেল হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ আয়াতের সঙ্গে আরো চৌদ্দটি আয়াত অন্য সুরা হতে এনে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে আমরা কোন প্রকার আপত্তি করতেই পারি না। কারণ, ইহা একটি ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ। এখানে স্বাধীনতা মানেই পরাধীনতা নয়, বরং তার চেয়েও আরো কিছু, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না। সুরা আলাকের নয় এবং দশ নম্বর আয়াতটিতে নামাজ পড়ার কথা আছে। অথচ সুরা আলাক তো দূরের কথা মহানবী মক্কাতে থাকাকালীন কোনো আনুষ্ঠানিক নামাজ পড়ার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যাননি এটা একটা সাধারণ মুসলমানও জানেন। আনুষ্ঠানিক জামাতবন্দি নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মদিনাতে। অথচ সুরা আলাক মক্কাতে নাজেল হয়েছে এবং ইহাই সর্বপ্রথম সুরা এবং এই সুরাটি মাত্র পাঁচ আয়াতে নাজেল হয়েছে এবং এই পাঁচ আয়াতের মধ্যে একটিতেও নামাজের কথা বলা হয়নি। অথচ সুরা আলাকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে গেলে পাঁচটি বাক্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখা চলবে না, কারণ উনিশটি আয়াত আছে। এখন উনিশ আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে গেলেই আনুষ্ঠানিক জামাতবন্দি নামাজের কথা এসে পড়ে, অথচ ইহার প্রচলন মদিনাতে হয়েছিল। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে যে, বাকি চৌদ্দটি আয়াত, যাহা সুরা আলাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, উহা মদিনাতে নাজেল হয়েছিল। সুতরাং সুরা আলাককে মক্কী ও মদনী উভয় নামই দেওয়া যেতে পারে। এ তো হল সুরাটির পটভূমিকার প্যাঁচাল। এই বকবকানি আমার উদ্দেশ্যও নয়, বিধেয়ও নয়। আসল বিষয়টি হল সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এখন এই আসল বিষয়টি নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই। সুরা আলাকের প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াতটির অনুবাদ করছি। প্রথম আয়াতটির অনুবাদ হল, 'পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' প্রথম আয়াতটি প্রায় সব অনুবাদকারী ঠিকই অনুবাদ করেন, কিন্তু যত গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেন দ্বিতীয় আয়াতটি অনুবাদ করতে গিয়ে। এখানে আমি তিনজন অনুবাদকারীর তিন রকম অনুবাদ হুবহু তুলে ধরলাম। পরে আসলটা কী হবে তাও লিখে জানাবো। একজন অনুবাদ করেছেন, 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে'। আর একজন অনুবাদ করেছেন, 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে'। অন্যজন অনুবাদ করেছেন, 'তিনি মানুষকে রক্তখণ্ড (ক্লড) হতে সৃষ্টি করেছেন।' অধম লেখক কাউকে দোষারোপ করছি না। কারণ, আমি অনুবাদ করতে গেলে ঐ একই রকম হত। অথচ এই অনুবাদ যে কত বড় মারাত্মক ভুল সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন মরিস বুকাইলি।

মরিস বুকাইলি তাঁর রচিত *বাইবেল, কোরান ও বিজ্ঞান* নামক বইটিতে এই আয়াতটির অনুবাদ করেছেন এভাবে, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এমন কিছু হতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো।' পাঠক হয়তো মনে করতে পারেন যে, জনাব মরিস বুকাইলি সাহেবের অনুবাদ নিজের

মনগড়া। কিন্তু কোরানের গবেষণা করতে গিয়ে তিনি যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন সেটা তাঁর লিখিত বইটি পড়লেই বুঝা যায়। কোরানের উপর কত প্রকার অভিধান এবং এর গবেষণা করার পর তিনি দেখতে পেলেন যে, 'আলাক' শব্দটির হুবহু অনুবাদ হল 'এমন কিছু যাহা দৃঢ়ভাবে আটকানো।' কিন্তু এই অনুবাদটি পূর্বের এবং মধ্যযুগের এবং এমনকি আধুনিক যুগের অনুবাদকেরা ইচ্ছা করেই গ্রহণ করেননি। এই গ্রহণ না করারও একটি বিশেষ কারণ হল যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে এদের তেমন কোন ধারণা ছিল না। যার জন্য 'আলাক' শব্দটির শেষ পর্যায়ের 'রক্ত খণ্ড', 'রক্তপিণ্ড', 'জমাট রক্ত' অর্থগুলো গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ যে কী ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে তা হয়তো তারা জানতেন না। অবশ্য না জানলেও আমরা আমাদের অভ্যাসের দোষে একটা কিছু লিখে ফেলি। কারণ তা না হলে সমগ্র কোরানের তফসির করার সুনাম হতে বঞ্চিত হতে হয়। এভাবে কোরানের কত হাজার হাজার শব্দের অর্থকে যে বিকৃত করে পরিবেশন করা হয়েছে তার হিসাব কে রাখে, আর কেইবা এর গবেষণা করে? মরিস বুকাইলি দুঃখ করে বলেছেন যে, 'কোরানের এই "আলাক" শব্দটির অনুবাদে প্রায় অনুবাদকই "জমাট বাঁধা রক্ত" অনুবাদ করেছেন। এই রকম অর্থ করা কেবল মারাত্মক ভুলই নয় বরং ভুল পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং এ রকম জঘন্য ভুল হতে আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার কোনো ধাপেই মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত অথবা রক্তপিণ্ডের অবস্থা পেরিয়ে যেতে হয় না। আবার "আলা" শব্দটির আর একটি অর্থ হল "জোড়" এবং এই অর্থটিও এখানে অচল। "আলাক" শব্দটির প্রথম অর্থটি "এমন কিছু যা দৃঢ়ভাবে আটকানো"কে গ্রহণ করলেই আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কোরানের এই বর্ণনা ডিম্বাণুর বাস্তব অবস্থার সাথেও একদম হুবহু মিলে যায়।'

সূরা আলাকের এই বিষয়টির আলোচনার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না কিন্তু কোরানের নামে ভুলের পাহাড় কীভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে দাঁড় করানো হয়ে থাকে তারই একটি নমুনা তুলে ধরার জন্য এই বাজে প্যাঁচালের অবতারণা। আরবি ভাষার বিরাট আলেম হলেও যে কোরানের অনুবাদ ও তফসির করতে পারবে এটা যে মোটেই ঠিক নয় সে বিষয়ে মরিস বুকাইলি তাঁর ভাষায় স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন, 'কেমন করে অনেক বড় বড় নামজাদা আরবি ভাষার আলেমেরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে কোরানের অনুবাদ করতে গিয়ে কত হাজারো জঘন্য ভুল করে গেছেন।' কিন্তু এটা সত্যিই একটি দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ মুসলমানদের ধারণা হল, আরবি ভাষায় আলেম না হলে কোরানের ব্যাখ্যা কেমন করে করতে পারবে? ভুল এবং যা-তা কোরানের ব্যাখ্যা দিলেও কোনো দোষ নেই। কারণ, তিনি তো মোফাসসেরে কোরান। কার ব্যাখ্যা সঠিক আর কারটা বেঠিক এ নিয়ে সাধারণ মুসলমানেরা পড়ে মহাফাঁপড়ে। তাই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা একান্ত স্বাভাবিক এবং এতে সাধারণকে দোষারোপ করা যায় না। এই ভুলই জন্ম দেয় নানা মত ও পথ। যাকে আমরা নানা ফেরকা বলি। এতে হয় ভুল বুঝাবুঝি এবং মাঝে মধ্যে মারামারি। কাফের-মোনাফেক ফতোয়া একে অপরকে ছুড়ে মারে। তাই কোরান বুঝতে হলে তাকে কেবল আরবি ভাষায় আলেম হলেই চলবে না, তার সঙ্গে থাকতে হবে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান। কোরানের কোনো বাক্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে যদি পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুঝে উঠতে না পারেন তাহলে সোজাসুজি বলে দেওয়া ভাল যে, এই বাক্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই অকপট স্বীকৃতি কি আমরা পাই? ভাবতেও অবাক লাগে যে, কী করে একজন সমস্ত কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সুন্দর করে অনেক খণ্ডে লিখে বিরাট আলেম বলে পরিচয় দেন।

এখন আমরা সুরা আলাকের আসল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। অবশ্য মাত্র পাঁচটি আয়াতের উপর। কারণ, সর্বপ্রথম এই পাঁচটি আয়াতই নাজেল হয়েছিল। অবশ্য ইহা লক্ষ করার একটি বিষয় যে, আল্লাহ্‌র ঘর বলে পরিচিত কাবাতে নাজেল হয়নি। যদিও আল্লাহ্‌র ঘরেই আল্লাহ্‌র বাণী পাবার কথা। কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র ঘর কাবাতে না পেয়ে হেরাগুহাতে পেলাম। এই হেরাগুহাটি মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু নিকটে জাবালুন্ নুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। প্রথম প্রশ্নটি হল, আল্লাহ্‌র ঘর বলে সুপরিচিত কাবা ঘরে আল্লাহ্‌র বাণী না পেয়ে হেরাগুহাতে কেন পেলাম? আমরা জানি, স্বর্ণের দোকানেই স্বর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু মাছের দোকানে স্বর্ণ পাওয়া যায় বললে কে না অবাক হবেন? তবে আল্লাহ্‌র ঘর কাবা এবং হেরা গুহার মধ্যে কী এমন অদ্ভুত রহস্য আছে? সেই রহস্যটার মূল্যায়নটাও কি রহস্যময় নয়? তবে কি মহানবীর দিল-কাবাটাই আসল কাবা? সেই দিল-কাবার প্রতিই কি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত এবং দৃষ্টিদান? এরকমভাবে শত শত প্রশ্ন তোলা যায় একজন ঝানু উকিলের মত এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। চেষ্টা করলে উত্তরগুলো হবে গোঁজামিলে ভরা শিশুসুলভ। সুতরাং সুফিবাদই যে ধর্মের মূল বিষয় এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। আপনি যদি মেনে না নেন তাহলে আপনাকে মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ, ইহা আপনার তকদিরের লিখন ছিল। কারণ তকদিরের অভিনয় আপনাকে করতেই হবে। ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক। তবে এই তকদিরও বদলানো যায়, তবে সেটা পীরে কামেলের রহমত ছাড়া অসম্ভব।

মহানবী বসে বসে যে হেরাগুহায় সাধনা করতেন সেই সাধনার নিয়মগুলো কেমন ছিল? না কি সেই সাধনার কোনো নিয়মের বালাই ছিল না? যদি নিয়ম-পদ্ধতি থেকে থাকে উহা কী রকম নিয়ম ছিল? সেই নিয়মগুলো কি মহানবীর নিজস্ব মনের মত নিয়ম ছিল? যদি তা-ও না হয় তাহলে কি যিশুখ্রিস্ট, মুসা অথবা ইব্রাহিমের নিয়ম মাফিক সাধনা করতেন? যদি পূর্ববর্তী তিনজন অথবা অন্য যে কোনো নবীর নিয়ম মত সাধনা করে থাকেন তাহলে মহানবী হতে ইসলামের আরম্ভ হল কী করে? তাহলে তো পূর্ববর্তী সব নবীরাই একটি মাত্র ধর্ম প্রচার করে গেছেন এবং সেই ধর্মটির নাম হল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শব্দটি আরবি শব্দ। ইহার অর্থ আত্মসমর্পণ অথবা শান্তি। সুতরাং ইসলামের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে হয় আত্মসমর্পণের ধর্ম অথবা শান্তির ধর্ম। সুতরাং ইসলাম নামক আরবি শব্দটি ব্যবহার না করে

আত্মসমর্পণ অথবা শান্তির ধর্ম বললে বিজাতীয় ধর্ম বলা কি জঘন্য অন্যায় হবে না? প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষায় যদি ইসলামের অনুবাদ করা হয় এবং সেই অনুবাদের ভাষায় ধর্মটি প্রচার করা হয় তাহলে কি বিজাতীয় ধর্ম হয়ে গেল? এক এক দেশের এক এক রকম ভাষায় একই ভাব প্রকাশ করা হয়। তাহলে আল্লাহ্ কেন সুরা ইব্রাহিমের চার নম্বর আয়াতে ঘোষণা করলেন যে, প্রত্যেক জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য সেই জাতির নিজের ভাষায় অবশ্যই রসুল পাঠানো হয়েছে? এবং সেই রসুল আল্লাহ্র সব রকম নিদর্শন সমূহ সেই জাতির ভাষায় পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্য কেন পাঠানোর ঘোষণা করলেন? তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষায় 'ইসলাম' শব্দটির বিভিন্ন নাম হয় এবং এ রকম হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহলে সেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নামগুলোকে 'বিজাতীয় ধর্ম' নাম দেওয়া কি নোংরামি অথবা গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়া হয় না? এ রকমভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন তোলাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হল আসল বিষয়টি কী তার কিছুটা আভাস দেওয়া।

হেরাগুহায় জিবরিল ফেরেস্তার প্রথম দর্শন মহানবীকে কিছুটা বিচলিত করেছিল। তার উপর আরো বিচলিত হবার কথা এ জন্য যে, জিবরিল ফেরেস্তা আগমন করেই বললেন, '*ইক্‌রা বেস্‌মে রাব্‌বিকাল্‌লাজি খালাক।*' অর্থাৎ, 'পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেন'। মহানবী লেখা পড়া জানতেন না, তাই তিনি জিবরিল ফেরেস্তাকে বললেন, 'আমি যে পড়তে জানি না।' তখন জিবরিল ফেরেস্তা মহানবীকে তাঁর বুকে চেপে ধরলেন এবং বললেন, 'পাঠ করুন।'

এখন প্রশ্ন হল, এই পাঠ করার জন্য বুকে চাপ দেবার কী প্রয়োজন? বুকে চেপে ধরে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় উহা কেমন জ্ঞান? সেই জ্ঞানের রহস্য কী? আমরা জানি, আধুনিক যুগে ফটোস্ট্যাট মেশিনের বুকের ভেতর একটা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিলেই সেই সাদা কাগজে পূর্বরক্ষিত যে কোন ধরনের লিখা হুবহু বেরিয়ে আসে। জিবরিল ফেরেস্তার বুকে এমন কী রহস্য ছিল যে মহানবীকে বুকে চাপ দিয়ে জ্ঞান দিতে হল? তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বুকে চাপ দিয়েও জ্ঞানদান করা যায়। কিন্তু সেই জ্ঞানের ধরন-ধারনটা কী রকম? একটি বিষয় লক্ষ করে দেখুন, মহানবীকে জ্ঞানদান করা হল বুকে চাপ দিয়ে, অথচ আমাদের বেলায় বলা হল, 'আল্লামা *বিল্‌কালাম*' অর্থাৎ 'যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা দেন'। প্রশ্ন হল, আমাদের বেলায় কলম দিয়ে শিক্ষা দেবার উপদেশ দেওয়া হল কিন্তু মহানবীর বেলায় বুকে চাপ দিয়ে জ্ঞান দেবার বাস্তব ঘটনা দেখানো হল। কলমের বিদ্যা যত সুন্দরই হোক না কেন, যত আজব আজব বিজ্ঞানের চমক লাগানো বিদ্যার ফলই ভোগ করি না কেন, তাতে তো কেবল দেহের এবং মনের ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার আনন্দ ও হিংসা এবং সংঘাতের অনেক রকম আনন্দ উপভোগ করতে পারি। কিন্তু আমাদের দেহের ভেতর যে আমিটি আছে সেই আমিটার পরিচয় জ্ঞানের তো কিছুই জানা হল না এবং জানা গেল না। অবশেষে তো সব বিদ্যার বহর ফেলে রেখে বুড়ো বয়সে ঝিমুতে হয়। তাহলে বুকে চাপ দিয়ে যে জ্ঞান দেওয়া হয় উহাই কি মানুষের আসল পরিচয় লাভ করার গোপন জ্ঞান? কলমের জ্ঞানের অবশ্যই মূল্য আছে এবং সেই মূল্যকে খাটো করে যারা দেখতে চান তারাও বোকার স্বর্গে বাস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, নিজের পরিচয় জানবার ইচ্ছা যাদের আছে তাদেরকে এই বুকে চাপ দিয়ে জ্ঞান দেবার বিষয়টি অবশ্যই ভাবতে হবে। আর যারা মনে করেন যে, নিজের পরিচয় জেনে কী লাভ হবে, তাদের কাছে আমার এই লেখার জন্য জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। কারণ, কোনো এক মহাপুরুষ বলেছেন, 'লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ে যান, লক্ষ লক্ষ বই পড়ুন, দুনিয়ার সব পণ্ডিতদের সঙ্গ করুন, কিন্তু বই-পড়া জ্ঞানের উপর ধর্মের রহস্য নির্ভর করে না। বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্মের আসল রহস্য পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিটিকে বলুন আত্মাকে আত্মা-রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না।'

ইসলাম ধর্মের উপর সারাটি জীবন লেখাপড়া করলেও আপনাকে শ্রদ্ধাভরে আমরা 'বিরাট ইসলামিক চিন্তাবিদ' অবশ্যই বলবো, কিন্তু অলী অথবা পীরে কামেল অবশ্যই বলবো না। কারণ, অলী বা পীরে কামেল হবার বিষয়টি এ বিষয় হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন বুকে চাপ দিয়ে জ্ঞানদান করা এক বিষয়, আর কলম দিয়ে শিক্ষা দেবার জ্ঞান হল অন্য বিষয়। তাই সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নেওয়াজ বলেছেন, 'একটি গণ্ডমূর্খও যদি ফানা ফিল্লাহ্র স্তর অতিক্রম করে আসতে পারেন তাহলে তিনি দুনিয়ার যে কোনো বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি হতে কোটি গুণে জ্ঞানী।'

কোনো এক মহাপুরুষ বলেছেন, 'অসার ফেনায়িত বাক্যের দ্বারা আল্লাহ্কে পাওয়া যায় না। যত বড় প্রতিভার অধিকারীই হোক না কেন তাতেও আল্লাহ্কে পাওয়া যায় না। গায়ের জোরে তো পাবার প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ তাঁর কাছেই আসেন, যিনি সেই গোপন জ্ঞানের উৎসের পরিচয় লাভ করতে পেরেছেন।'

সুতরাং সুরা আলাকে একটি বিরাট শিক্ষার দুইটি ভিন্ন পথের ভিন্ন জ্ঞান অর্জনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রকাশ্য ভাষায়। সত্যিই কোরানের প্রতিটি শব্দচয়ন এক একটি মহাবিস্ময়, মহা বিজ্ঞানময়।

নাস্তিক ভাইদেরকে কটাক্ষ করে বলছি না, কারণ সৃজনের যে অগণিত রহস্য, সেই রহস্যের একটি রহস্য যে আপনারাও। আপনারা যে এই রহস্য-মঞ্চের এক কোণে না থাকলে কিছুটা শূন্যতা বিরাজ করবে। তাই নাস্তিক হওয়াটাও একটি তকদিরের লিখন। আপনাদের নাস্তিক্যবাদের দর্শন এবং ক্ষুরধার যুক্তিগুলোর যত কদরই হোক না কেন, যত মূল্যবান বলেই গ্রহণীয় হোক না কেন, কিন্তু একটা কথা আপনাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই পৃথিবীতে মৃত্যু নামক অপ্রিয় সত্যটি যতদিন থাকছে, ততদিন মৃত্যুর কথা ভেবে মানুষের মনটি কেঁদে যাবে; যতদিন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রশ্নটি বুকের মাঝে আহত পাখির মত ছটফট করবে, ততদিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র উপর হতে বিশ্বাসটি কোনো শক্তিই চিরতরে মুছে দিতে পারে না এবং পারবেও না। বাংলাদেশের দুই তিনজন ঘোর নাস্তিকের শেষ জীবনের কয়টি কথা আজও কিছুটা অবাক করে বৈকি। একজন বিখ্যাত নাস্তিক কবি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে নামাজ, রোজা এবং প্রতিদিন

কোরান তেলাওয়াত করে গেছেন। 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার', এই প্রবাদটি যদি মনে করতে চাই তাহলে কি অন্যায় হবে? মহানবীর সঙ্গে যুদ্ধে এক গাজি যে জাহান্নামে যাবে বলে মহানবী বলেছিলেন এবং তাতে সাহাবারা কিছুক্ষণের তরে হয়তো অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু যখন সেই গাজি আত্মহত্যা করেছিল তখন মহানবীর বাণীটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল।

আর একজন নামজাদা সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন, যাকে শিক্ষিত মহলের সবাই ঘোর নাস্তিক বলে জানতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি মহানবীর প্রশংসায় অনেকগুলো কবিতা লিখে গেছেন। বিশ্বাস করতে না পেরে হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সেই নাস্তিক কবিরই হাতের লিখা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এক জাঁদরেল নেতা, যার নাম বললে সবাই চিনবেন, সেই নেতার সঙ্গে কাওয়ালি শোনার ভাগ্য হয়েছিল এই অধম লেখকের। আমি প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম বৈ কি! পরে মনে মনে ভাবলাম, হয়তো কোন বন্ধুর মান রাখতে গিয়ে তিনি কাওয়ালি শুনতে এসেছেন। কাওয়ালি শুরু হল। বাঘের মত যেমন গলার স্বর তেমনি মধুর মত শুনতে। কাওয়াল গাইতে শুরু করলেন, '*ওহি কিবলা ওহি কিবলা নুমা হ্যায়–জো মেরে সামনে হ্যায় উহ্ খোদা হ্যায়। বাকা কাহ্তে হ্যায় জিস্কো উহ্ খোদা হ্যায়–ফানা সে পাক জাতে কিবরিয়া হ্যায়। হাম্ হ্যায় কাফির ইশ্ককে কাফির হামারা ইশ্ক হ্যায়। বালাগুল্ উলা বে কামালিহি কাসাফুদ্দোজা বে জামালিহি–হাসানুতজামীয়ু খেসালিহি সাল্লু আলাইয়ে ওয়ালিহি।*' সহসা সেই নেতার দিকে চেয়ে আমি একদম চমকে উঠলাম। একি দেখছি! সত্যিই দেখছি তো? হ্যাঁ, চেয়ে দেখছি সেই নেতার দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে আর পাথরের মত নিশ্চল মুখটি রক্তবর্ণ ধারণ করে আছে। সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি অধম লেখক জীবনেও হয়তো ভুলে যাবে না। আর সেই সময় মহানবীর একটি বাণী বার বার মনে পড়ছিল। মহানবী একজন সাহাবাকে এই বলে প্রশ্ন করেছেন যে, 'কালেমা পাঠ করার পরও তাকে হত্যা কেন করলে?' সাহাবা বলেছিলেন, 'হুজুর, সে কেবল মুখেই কালেমা পাঠ করেছিল।' মহানবী বললেন, 'তোমার তরবারির অগ্রভাগ কি তার হৃদয়ের ভেতরও প্রবেশ করেছিল?' অধম লেখক অজ্ঞ, মহাপাপী এবং ফেরাউনের চেয়েও অধম। সুতরাং আমার মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই। কেবল দৃশ্যের বর্ণনা করতে পারি মাত্র।

একটা সাংঘাতিক ধরনের গোপন কথা বলতে চাই। আর সেটা হল, ভয় এবং প্রেম দুটো সবদিক দিয়েই আলাদা। যে ভয় করে সে প্রেম করতে পারে না, আর যে প্রেম করে সে ভয় করতে জানে না। যদি মনটাকে একটি ঘর বলি এবং সেই ঘরের যদি একটি দরজা ও একটি জানালা থাকে তাহলে বলতে হয় যে, যদি মনের সেই দরজা দিয়ে ভয় ঢুকে পড়ে তাহলে প্রেম জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য এবং যদি মনের সেই দরজাটি দিয়ে প্রেম ঢুকে পড়ে তাহলে ভয় জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য। ভয়ের মধ্যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করার সংবাদ থাকতে বাধ্য। কারণ, সুখ ও দুঃখের প্রশ্নে ভয় জড়িয়ে থাকে। তাই প্রেমিক ভয়ের পরোয়া করে না, কিন্তু ভয় জানে না প্রেমের মধ্যে কী আনন্দ লুকিয়ে আছে। যে আল্লাহ্কে ভয় করে সে আল্লাহ্কে পরিপূর্ণরূপে কীভাবে চাইতে হয় সেই চাওয়াটা জানে না। কারণ সে চায় আল্লাহ্র তৈরি বেহেস্তের ভোগবিলাস এবং জাহান্নামের আগুন থেকে কেমন করে নিজেকে রক্ষা করা যাবে সেই ইবাদত-বন্দেগি করতে। সুতরাং এই ধরনের ইবাদত-বন্দেগিকে আল্লাহ্র ইবাদত না বলে পুরষ্কার এবং শাস্তির ইবাদত বলা হয়। কারণ, বেহেস্ত এবং দোজখ হতে রেহাই পাবার ইবাদত করা হলে আল্লাহ্র বদলে পুরষ্কার ও শাস্তিরই ইবাদত করা হয়ে যায়।

আর এক ধরনের ইবাদত-বন্দেগিও আপনি অনেক দেশেই দেখতে পাবেন। আর সেটা হল হালুয়া-রুটির ইবাদত-বন্দেগি। হয়তো বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এদের সংখ্যাও কম নয়। কারণ, নিয়তের উপরই যদি ইবাদতের মূল ভিত্তি বলে ইসলাম ঘোষণা করে থাকে, তাহলে যাদের নিয়ত হল হালুয়া-রুটি তাদের ইবাদতকে যদি হালুয়া-রুটির ইবাদত কেউ বলতে চায় তাহলে কি ভুল হবে? যদি বলেন, ইহা ভুল, তাহলে এটা তকদিরের লিখন। আর যদি বলেন, ইহা ঠিক, তাহলে এটাও তকদিরের লিখন। বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতি যদি ভাল করে লক্ষ করে দেখেন তা হলে দেখতে পাবেন যে, ইরানের কোনো কাজই ভাল নয়, সব খারাপ এবং ভুলেও একবার ভাল কাজ করতে জানে না ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষণের ছাপ দেখতে পাবেন। আর পরক্ষণে দেখতে পাবেন ইরাক যেন তুলসী পাতা ধোয়া জলের মত পবিত্র। হায়রে ধর্মের নামে অ্যাটমের মত সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি দেওয়া হালুয়া-রুটির ব্যবসা। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের আসল রূপটি সাধারণ পাঠকের কাছে ধরা পড়ার কথা নয়। কারণ, কথায় বলে, চোরের মায়ের গলার আওয়াজটা খুব বড় হয়।

ইরাকের সঙ্গে কুয়েত আর সৌদি আরব তো আরো মহান। প্রতিমাসে কোটি কোটি ডলার দান করছেন ইরাককে। কুয়েত আর সৌদি আরব তো ঐ দৈনিকটির কাছে এতই মহান যে, তারা কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না, কথা বলেন না। হালুয়া-রুটির ইবাদত-বন্দেগি বড় সাংঘাতিক কঠিন সাধন ভজন। যেমন মশারির তলায় বসে জিকির করা সহজ, কিন্তু টাকার স্তূপের উপর বসে ইমান ঠিক রাখা বড়ই কঠিন। আল্লাহ্ই জানেন–এটুকু বেফাঁস কথা-বার্তায় অধম লেখকের উপর না আবার শনির শামসির দেখানো হয়। এ রকম ঠোঁট কাটা কথাবার্তা না লেখাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল, কিন্তু মুখ হতে ফস করে বেরিয়ে গেল।

সেই নামজাদা দৈনিক পত্রিকাটিকে কয়টি প্রশ্ন করতে চাই। ইমাম খোমেনীর মত একজন নেতা বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় সুন্নি-মওলানা হাফেজ্জী হুজুরের ইমামতিতে নামাজ পড়েছেন বলে কি ইমাম খোমেনীর বিরাট অপরাধ হয়েছে? অথচ সৌদি আরবের বাদশা এবং তার পাখ ফইড়ারা বাংলাদেশের সুন্নি মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের ইমামতিতে নামাজ পড়া তো দূরে থাক, তাঁর হজে যাবার বিষয়টি নিয়ে যে কী প্রকার টানা-হেঁচড়া করতে হয়েছিল সেটা অনেকেরই জানা থাকার কথা। কারণ, সৌদিরা প্রায় সবাই ওহাবি এবং তারা সুন্নিদের যে মনে প্রাণে ঘৃণা করে তার এক বোঝা প্রমাণ দেওয়া যায়। ওহাবিরা তাকলিদ করাকে 'শিরক ফির রিসালত' বলে মনে করে। ওহাবিরা মহানবীর

রওজা মোবারক জিয়ারতের নিয়তে মদিনায় যাওয়াকে অবৈধ বলে প্রচার করেন। ওহাবিরা পৃথিবীর অধিকাংশ সুন্নি মুসলমানকে 'হালজামানার মুশরিক' বলে বিশ্বাস রাখেন। এ রকমভাবে ওহাবিদের জনক আবদুল অহাব নজদীর *কেতাবুত্ তৌহিদ* নামক বইটি পড়লে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন। আবদুল অহাব নজদীর মতে পৃথিবীর সব সুন্নি মুসলমানেরা সরাসরি কাফের এবং আরো হাজারো জঘন্য কথা যা শুনলে শরীর রি রি করে উঠে।

ইসলামে রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই এবং জুমার নামাজের খুত্বায় 'আস্‌সুলতানু জিল্লুল্লাহি ফিল আরদ্' অর্থাৎ 'রাজা-বাদশাহ হলেন দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ' ইহা একটি ডাহা মিথ্যা কথা বলে ইমাম খোমেনী ঘোষণা করে কি বিরাট অপরাধ করেছেন?

ইমাম খোমেনীর বিপ্লবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, 'আমরা শিয়াও নই, সুন্নিও নই, আমরা মুসলমান' এই ফরমান জারি করা কি বড় অপরাধ হয়েছে?

ইমাম খোমেনীর এই ডাক 'আমরা সবাই মুসলমান' সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দিয়েছেন এবং এই ডাক সৌদি আরবের জাতীয়তাবাদের বুকে কুঠার আঘাত হেনেছে এবং এরই জন্য সৌদি আরবের মার্কিন-পন্থী এবং জাতীয়তাবাদী রাজ-রাজারা ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এই ডাক দিয়ে কি ইমাম খোমেনী বিরাট অপরাধ করে ফেলেছেন?

ইমাম খোমেনীর নির্দেশে রাজতন্ত্রের কবর রচনা করতে গিয়ে ইরানের জনগণকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ জনগণকে ইরানি রাজার মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং ১৯৬৩ সালে ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে জনতা পথে নেমে পড়ায় রাজার মেশিনগানের গুলিতে পনের হাজার মানুষ রাজপথেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তেহরানে এক গণমিছিলের উপর ইরানি রাজার হুকুমে মেশিনগানের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে চার হাজার ইরানি মৃত্যুবরণ করেন এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সেই চার হাজার ইরানির সঙ্গে ছয় শত মহিলাও মৃত্যুবরণ করেন। সেই জনতার শ্লোগান ছিল, 'লা শারিকিয়া লা গারাবিয়া ইসলামিয়া জামাহিরিয়া' অর্থাৎ পূর্বও নয় পশ্চিমও নয় ইসলামি প্রজাতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ? স্বৈরাচারী রাজাকে উৎখাত করে ইসলামি বিপ্লব সংঘটনের জন্য ইরানের জনতাকে কী চরম মূল্য দিতে হয়েছে তা ইরানের জাতীয় গোরস্থান 'বেহেশতে জাহ্‌রায়' ষাট হাজার শহিদের কবরগুলো দেখলেই বুঝা যায়, যে কী নির্মম আর বর্বর অত্যাচার চালানো হয়েছিল ইরানি জনতার উপর। এবং কোম শহরের কাছেই যে বিরাট লবণ হ্রদে ইরানি রাজার হুকুমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন তাদের থেকে বাছাই করে সতের হাজার বিপ্লবী মুজাহিদদেরকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে জীবন্ত অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কী জঘন্য বর্বরতার নারকীয় নজির। কিন্তু এই এতদিনের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করার পর কিছু অপরাধীদের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য ইমাম খোমেনীকে যা-তা মন্তব্য করা উচিত বলে মনে করেন? আসল বিষয়টি তলিয়ে না দেখে স্বার্থপরদের প্রচারণায় কি বিভ্রান্ত হওয়া উচিত?

ইমাম খোমেনী একটি বিরাট অপরাধ করেছেন সৌদি রাজতন্ত্রের কাছে এই বলে যে, মক্কা এবং মদিনা হল পৃথিবীর মুসলমানদের ওয়াক্‌ফা সম্পত্তি এবং এই পবিত্র স্থানে যার যার মাজহাব অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগি করতে পারবে এবং এই পবিত্র স্থানদুটির উপর সৌদিদের কোন কর্তৃত্ব থাকতে পারবে না এবং এর কর্তৃত্ব থাকবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের হাতে। ইমাম খোমেনীর এই ঘোষণায় সৌদি রাজতন্ত্রের মাথায় ঠাটা পড়ার মত, মাথা খারাপ হয়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছে।

সবশেষে তবু একটা কথা বলতে চাই যে, ইমাম খোমেনীকে যদি আপনার পছন্দ না হয় ভাল কথা, কিন্তু তাই বলে আসল বিষয়গুলো না জেনে তাঁর নামে যা-তা কুৎসা রটনা করা কি কোরান-হাদিস অনুসারে অবৈধ নয়?

ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের আকিদাগুলোকে শিয়াদের আকিদা বলে অধম লেখকও জীবনে কম ভুল করেনি। যখন বুঝতে পারলাম তখন স্বেচ্ছায় নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে সেই ভুল অংশগুলো বাদ দিলাম।

এখন আমরা ভয় এবং প্রেমের বিষয়টি আবারও আলোচনা করছি। প্রেমিক নিজের সমস্ত সত্তাকে আল্লাহ্ তথা মাশুকের কাছে সঁপে দেয়। তাই কোনো প্রকার শাস্তি পাবার ভয় অথবা পুরস্কারের লোভ জানালা দিয়ে আপনিই পালিয়ে যায় এবং আশেকের স্মরণ মাশুক সইতে পারে না। তাই মাশুক সাড়া দেয় আশেককে। কোরানের সুরা বাকারার একশত বাহান্ন নম্বর আয়াতে তাই আল্লাহ্ বলছেন, 'অতএব তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।' আশেকের প্রতি কত বড় আশ্বাসের অপূর্ব অঙ্গীকার মাশুকের; আর মাশুক কোনদিনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। মাশুককে পাবার সাধনায় আশেক পর্বতের মত অটল, আর সেই কৃচ্ছ্র সাধনের রূপ দেখে মাশুক পাবার আশ্বাস দেন। কোরানের চুরাশি নম্বর সুরা ইন্‌শিকাকে আল্লাহ্ বলছেন, 'হে মানুষ! তুমি তোমার রবের উদ্দেশে যে কৃচ্ছ্র সাধন করছো, পরে তুমি তা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।' এই সাধনার পর্যায় অতিক্রম করার পর আশেক দেখতে পান, সব কিছু হতে তিনি আলাদা হয়ে গেছেন। কেবল আশেক আর মাশুক (আল্লাহ্) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। প্রকৃতির বহু রূপের মাঝেও দেখতে পান একমাত্র মাশুককে, লক্ষ মানুষের কোলাহলের মাঝেও দেখতে পান ওই একমাত্র মাশুককে। যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন, আশেক তার ব্যক্তিমালিকানার সমস্ত দম্ভগুলো উপড়িয়ে ফেলে দেন। তাই মাশুক বন্ধু বলে ডাক দেন আশেককে। কোরানের দশ নম্বর সুরা ইউনুসের বাষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, 'জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখ তাদের স্পর্শ করবে না।'

পৃথিবীতে বহু জাতি আছে এবং সেই বহু জাতি সংখ্যায় যতই হোক না কেন, প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ্‌র ধর্মের তথা আত্মসমর্পণের ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ্ রসুল পাঠিয়ে। এটা কোরানের প্রকাশ্য ঘোষণা। সুতরাং আত্মসমর্পণ নামক ধর্মের যত প্রকার নামই হোক না কেন উহা আসলে একই ধর্ম এবং সেটা হল ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এখানে একটা কথা বলতে চাই, কিন্তু কথাটি কতটুকু সবার কাছে শোভনীয় এবং গ্রহণযোগ্য হবে তা জানি না। তবে একটি কথা বিশেষ কারণে বলতে হচ্ছে এ জন্য যে আমার দায়িত্ব আমি পালন করে গেলাম। তারপর কে কী মনে করেন উহা আমার বিষয় নয়।

আমার মনে হয় প্রয়োগ-পদ্ধতির বিষয়টি ভেবে এই সিদ্ধান্তে আমাকে আসতে হল যে, মহানবীর দেওয়া প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা করলে সাধক যতটুকু উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয় ততটুকু উন্নত পর্যায়ে অন্য কারো সাধন পদ্ধতিতে যাওয়া যায় না বলে মনে হয়। কারণ, দেখুন, খাজা বাবার আধ্যাত্মিক উন্নত পর্যায়ের সামনে হিন্দু সাধকগণ মাথা নত করে মেনে নিলেন এবং মহানবীর সাধন পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন। এখানে অবশ্যই সাধারণের কথা বলছি না। কারণ, সাধারণ চিরদিনই সাধারণ থেকেছে এবং তাই থেকে আসছে। আমার এই উপদেশটি কেবল সাধকদের জন্য। যারা সাধনার চরম উন্নত পর্যায়ে উঠতে আগ্রহী। গুরু নানক যদিও শিখ ধর্মের জনক তবু তিনি কিন্তু মহানবীর সাধন-পদ্ধতিতে সাধনা করেছেন। কারণ গুরু নানকের পীর ছিলেন বাবা বাহ্‌লুল দানা। হরদেও নামে একজন হিন্দু সাধক অবশেষে বাবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মুরিদ হন। কথিত আছে যে, হরদেও সাধনার এত উন্নত পর্যায়ে উপনীত হন যে, দিল্লীর বাবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান তিন শিষ্যের মধ্যে তিনিও একজন বলে পরিচিত লাভ করেন। অপর দুইজন সাধকের নাম হল, বাবা আমির খসরু এবং বাবা নাসির উদ্দিন।

আমার এই দাওয়াত তাদেরই জন্য যারা সাইনবোর্ডে বিশ্বাসী নন। যারা আধ্যাত্মিক সাধনায় চরম উন্নত পর্যায়ে যাবার আগ্রহ রাখেন আমার এই দাওয়াত কেবল তাদেরই জন্য। দাওয়াত দিতে পারি, কিন্তু হুকুম করার অধিকার নেই। কারণ, কোরান স্পষ্ট বলেছে যে, ধর্ম বিষয়ে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ নেই। হুকুম অনেকটা বলপ্রয়োগের কাছাকাছি, তাই দাওয়াতের কথা বললাম। তারপর অধম লেখকের এই দাওয়াত গ্রহণ করা না করা সাধকদের ইচ্ছা।

সঙ্গীত বিষয়টি লেখতে হচ্ছে অনেক বন্ধুদের অনুরোধে। অনেকটা বাধ্য হয়ে একান্ত অনিচ্ছায়। কসাই যখন দুটো পশুর সামনে আর একটি পশু জবাই করছে তখন অন্য দুটো পশুর অবস্থা যেমন হয় এই সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধটি লেখতে গিয়ে আমার অবস্থাও অনেকটা সে রকম। এখানে একটি কথা বললে আমি জানি যে সেই কথাটি অহঙ্কারের ছকে ফেলে আমাকে যা-তা বলতে পারবেন। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। আর সেই কথাটি হল, আমি পাকিস্তান আমলে অনেক বিষয় নিয়ে মোল্লাদের সঙ্গে বাহাস করতাম। যদি বলি বাহাসে কোন মোল্লাই বেশিক্ষণ অধম লেখকের সঙ্গে টিকে থাকতে পারতো না, তাহলে অহঙ্কারের ব্যাকরণে ফেলতে পারেন, কিন্তু অহঙ্কার হলেও ইহা অতি অপ্রিয় সত্য কথা।

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বাহাসের বয়ান করেই আসল বিষয়ে হাত দেবো। বাহাসটি এজন্য স্মরণীয় যে, পাকিস্তানের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাওলানা, যার নাম সে সময় প্রায় সবাই জানতেন, সেই বিখ্যাত মাওলানা মোস্তফা সৈয়দ আল মাদানীর সঙ্গে আমার বাহাস হয়। যার কবর লালবাগ মাদ্রাসায় দেওয়া হয়েছে। সেই বাহাসের আয়োজন ছিল এক দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপার। একদিকে বিচারকমণ্ডলি অপর দিকে হাজার হাজার শ্রোতার দল মাঠে বসে আছে। ১৯৬২ সালের জুন মাসে ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার দিঘির পাড় নামক বাজারের মাঠে সেই বাহাসের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন দিঘির পাড় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব আরব আলী হালদার সাহেব। উনি আমাকে সেইদিনের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান আল্লামা আবুল হাশিম সাহেবের পরামর্শে বাহাসের জন্য নিয়ে যান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওলানা মাদানী সম্পূর্ণরূপে হেরে যান এবং তিনি রাগে আমার জামার কলার চেপে ধরে প্রশ্ন করেন যে, পায়খানা করার পর পানি খরচ করার মাসলা জানিস? আর কী! মাঠের হাজার হাজার শ্রোতারা মাদানীর উপর এমনই ক্ষেপে গেলেন যে, সে দৃশ্য বড়ই করুণ। কিল- থাপ্পড়, জুতা-সেন্ডেল দিয়ে মারা শুরু করে দিলেন। অবশেষে আমিই ধমক দিয়ে এবং বুঝিয়ে শ্রোতাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলাম এবং তাড়াতাড়ি মাদানী সাহেবকে সভা হতে অন্যস্থানে সরিয়ে দিলাম। সেই থেকে যে কোনো বাহাসে অধম লেখকের থাকার কথা উঠলেই মাদানী সাহেব ভূত দেখার মত ভয় করতেন। অথচ অধম লেখকের মত জাহেল, মূর্খ আর মহাপাপী খুব কমই পাবেন। এই এতগুলো কথা বলার একটিই উদ্দেশ্য যে, সঙ্গীত বিষয়টি নিয়ে অন্য আর একস্থানে বাহাস হয়েছিল এবং সেই বাহাসেরই সামান্য কিছু তুলে ধরলাম। কারণ, বিস্তারিত লিখে বিশেষ করে এই অখাদ্য বিষয়ের উপর বই মোটা করে এই আধুনিক যুগে কোনো লাভ নেই। *তিরমিজি শরীফ, এবনে মাজা* এবং আরো কয়টি হাদিসের বইতে আছে যে, হজরত সালমান ফারসি (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ কোরানে যা হালাল করেছেন উহাকে হালাল বলে এবং হারাম ওটাকেই বলা হয় যা আল্লাহ্ কোরানে হারাম করেছেন। আর যে বিষয়ের উপর কিছুই বলেন নি উহা আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর আল্লাহ্ কিছুই বলেন নি সেই বিষয়টি কারো কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং এটাকেই মোবাহ্ বলা হয়। কারণ, এটা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

ফতোয়ায়ে কাজিখান এবং *দোররে মোখতার* নামক এবং আরো কয়টি বিখ্যাত ফতোয়ার কেতাবে স্পষ্ট লেখা আছে যে, প্রতিটি জিনিসই বলতে গেলে মোবাহ্ বা হালাল। অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্ স্পষ্ট হারাম বলে ঘোষণা করেছেন উহা ছাড়া সব কিছুই মোবাহ বা হালাল। কিন্তু যদি হালাল জিনিসের সাথে হারামকে মিশিয়ে ফেলা হয় কেবল তখনই হারাম হয়। নতুবা হালালই থাকে। তাছাড়া ভাল নিয়তে

সঙ্গীত জায়েজ আছে। অতএব মন দেখে ফতোয়া দেবার কোনো মেশিন মোল্লাদের কাছে নেই। যদিও কথায় কথায় মুসলমানদেরকে কাফের ও মোশরেক ফতোয়া দেওয়াটা ওহাবি মোল্লাদের একটা অতি সাধারণ স্বভাব। মহানবী বলেছেন, 'প্রত্যেক বিষয়েরই বাহির এবং ভেতর আছে, সে রকম কোরানেরও বাহির ও ভেতর আছে।' হজরত ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'ফেকাহ্ বিষয় মানুষের বাহিরকে শুদ্ধ করে আর মারেফত মানুষের হৃদয়কে শুদ্ধ করে।'

হোস্সামী নামক ওসুলের কেতাবে আছে যে, 'যখন কারণ থাকবে না তখন আদেশও থাকবে না।'

হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'ভাল লোক তার ভাল মন হতে ভাল কথা বের করে, আর খারাপ লোক তার খারাপ মন হতে খারাপ কথা বের করে।'

হেদায়া নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'যে বিষয়ে কোরানের পরিষ্কার আদেশ পাওয়া যায় না, সেই বিষয়টির উপর হারাম ফতোয়া দেওয়া যাবে না। অলীরা ছাড়া অপরের জন্য সঙ্গীত হারাম যারা বলেন, তারাও ভুল করছেন। ইহার প্রধান কারণ হল, শরিয়ত অনুসারে যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল এবং যা হারাম তা সকলের জন্যই হারাম।' হজরত মোজাদ্দেদে আল ফেসানী তাঁর রচিত *মাক্তুবাত*-এ বলেছেন, 'আল্লাহ্র অপ্রিয় অথবা যা তুষ্ট করতে পারে না এ রকম কোনো কাজই অলীদের দ্বারা হতে পারে না। কারণ, এরা আল্লাহ্র অলী। আল্লাহ্র পছন্দ নয় এমন সব কাজ হতে তিনিই তাঁর অলীদেরকে সব সময় রক্ষা করে থাকেন।'

হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'যে গোসল করেছে তার পা ছাড়া আর কিছুই ধুইবার দরকার নেই। কারণ, তার আর সমস্ত কিছু পরিষ্কার আছে।' দোররে মোখতার নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'অলী হবার লক্ষণ হল যে, সব সময় পাপ কাজ হতে বিরত ও ভাল কাজে লেগে থাকা। এই দুটো লক্ষণ যার মধ্যে নেই সে অলী হতে পারবে না। অতএব অলীদের প্রকৃত অনুসারীরা ভুল পথে যেতে পারে না।'

হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তাহলে দুজনেই গর্তে পড়ে। যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুদের মত না হও তবে কোনো মতেই বেহেস্তে যেতে পারবে না।'

যে সকল সাহাবারা সঙ্গীত শুনতেন তাদের নামের একটি লম্বা তালিকা আমরা দেখতে পাই হজরত জাফর ইবনে কামাল উদ্দিনের রচিত *এত্তেবা ফি আহ্কাসিমা* নামক কেতাবের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় এবং এই কেতাবে বলা হয়েছে যে, মহানবী তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সঙ্গীত শুনেছেন এবং তা সনদসহ সহি হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে।

হাকিকাতোস্সেমা নামক কেতাবে এবং হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ও ইমাম হজরত আবদুল গণি নাবলুসি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঙ্গীতকে ঘৃণার সহিত একদম হারাম বলে, সে যেন বলছে, মহানবী হারাম কাজে লিপ্ত ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্ মিনহা)।'

অধম লেখক যে সকল কেতাবের নামগুলো বলছি সেই কেতাবগুলো সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ অনুবাদ করলেই থলির বেড়াল সুর সুর করে বেরিয়ে পরবে এবং সাধারণ মুসলমানদের চোখগুলো খুলে যাবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কি এই মহান কাজগুলোতে হাত দেবেন?

শামী নামক বিখ্যাত হানাফি মাজহাবের কেতাবে বলা হয়েছে, 'সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। নফস পরস্তির নিয়তে এবং হারাম কৌতুক-হাসি, খেল-তামাসার নিয়তে সঙ্গীতকে হারাম বলা হয়েছে। যে হারাম উদ্দেশ্যে সঙ্গীত হারাম হবে সেই ব্যাপারে বাজনাও হারাম হবে। আবার যে কারণে সঙ্গীত হালাল সেই কারণে বাজনাও হালাল হবে।' এখানে কেবল মাছিমারা কেরানির মত যে কেতাবে যা বলা হয়েছে তাই তুলে ধরলাম। হয়তো যুক্তির খাতিরে বলতে পারতাম যে, মদ হারাম বলে মদের বোতলটি আর হারাম হয় না। কারণ, ধুয়ে পরিষ্কার করে ঐ বোতলে পানি রেখে পান করা যায়। তাতে কি আপত্তি করার কিছু আছে? যাক সে কথা। এখন আমরা সহি হাদিসে সঙ্গীত বিষয়ে কী বলা হয়েছে সেটাই আলোচনা করবো। *বোখারী শরীফ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের সাত শত তেহাত্তর পৃষ্ঠায় এবং *তিরমিজি শরীফ*-এর এক শত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে হজরত রোবাই (রা.) বলেছেন, 'আমি আমার স্বামীর ঘরে যখন নূতন বিবাহিতা হয়ে ঢুকলাম, তখন মহানবী এসে বিছানায় এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি আমার কাছে বসেছ। আমাদের পরিবারের নব যুবতীরা দফ বাজাতেছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা, যারা বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, তাদের বীরত্বের গান গাইতেছিলেন। তাদের মাঝে একজন গাইতে শুরু করলো যে, আমাদের সঙ্গে একজন নবী আছেন যিনি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। তখন মহানবী বললেন যে, এটা না বলে পূর্বে যা গাইতেছিলে সেটাই গাও।' এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক রকম কথা এবং শক্ত যুক্তি দাঁড় করানো যায়। তবে খুব ছোট করে বলতে চাই যে, দেড় হাজার বছর আগে সেই মরুদেশে কয় প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল অথবা কয় প্রকার বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল এবং সেই বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাম কী এবং কেমন করে বাজানো হত? আজকের যুগে যত বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এবং দিনে দিনেই নূতন নূতন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে, তার কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ বাদ্যযন্ত্রও কি সেই দেড় হাজার বছর আগে এবং বিশেষ করে মরুদেশে প্রচলন ছিল? না, মোটেই না। সুতরাং যে কয়টি বাদ্যযন্ত্র তখন বাজানো হত সেটাই ছিল তাদের সম্বল। এর বাইরে কোন বাদ্যযন্ত্র থাকলে এবং বাজাতে জানলে কি তারা বাজাতেন না? মহানবী দফ বাজিয়ে যেহেতু গান শুনেছেন সেইহেতু আমাদেরকেও ঐ একই বাজনা বাজিয়ে গান শুনতে হবে বলে যদি কেউ ফতোয়া দেন তাহলে আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি যে, মহানবী উট-ঘোড়ায় উঠে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়েছেন, সুতরাং আমাদেরও বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজে উঠে ভ্রমণ করা যাবে না। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, এ রকম আজব ফতোয়া কিন্তু অনেক মোল্লারা আগেই দিয়ে ফেলেছেন। এসব মোল্লারা চমৎকার চিজ এবং আমাদের দেখতে ইচ্ছে করে। তাই এদেরকে চিড়িয়াখানার একটি ঘরে রেখে দেখার আহ্বান জানালে কিন্তু অনেক টাকা উপার্জন

করা যাবে। আরো মজার কথা হল, যেহেতু এটা বিশেষ করে *বোখারী শরীফ*-এর হাদিস তাই না পারে ফেলে দিতে আর না পারে গ্রহণ করতে। তাই এই হাদিসটির যে কত রকমের আজব আজব বয়ানের ঝুড়ি পাবেন তা দেখলে আপনি বোবার মত থমকে যাবেন। অথচ কাঁচের মত পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মহানবী গান কেবল দফ নামক বাদ্যসহই শুনতেন না বরং অন্য রকম করে গাইবার আদেশটিও স্পষ্ট লক্ষ করতে পারি এই গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটিতে। সমাজে কিছু ছাগল-পাগল না থাকলে সমাজের লোকেরা যে, 'ছাগল-পাগল' শব্দটি চিরতরে ভুলে যাবে। যেমন পৃথিবী থেকে অনেক প্রাণীর অস্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে গেছে, যাদের নাম আমরা আজ নিতে পারি না। তাই এদেরকে দোষ দেবেন না। কারণ, এটা যে তাদের তকদিরের লিখন। তকদিরের লিখন যে খণ্ডানো যায় না, কেবলমাত্র অলীয়ে কামেলের বিশেষ রহমত ছাড়া। এটা যখন আমরা জানি তা হলে কি বলার কিছু থাকে? বামন হয়ে যখন চাঁদ ধরার হামকি-ধমকি শুরু করে দেয়, কেবল তখনই কিছু একটা বলতে বাধ্য হতে হয়। কারণ, এতে সমাজের সাধারণ মানুষগুলোর ভুল করার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য *লোময়াত শরহে মেশ্‌কাত* নামক কেতাবে এটুকু অন্ততঃ বলা হয়েছে যে, 'যখন দফ বাজানো জায়েজ প্রমাণিত হল তখন সঙ্গীত জায়েজ হবে না কেন?' আবার এই হাদিসের উপর এক অপূর্ব ডিজাইনের ব্যাখ্যা করেছেন, *মেরকাত* নামক কেতাবের লেখক মোল্লা আলী কারী হানাফি সাহেব। তিনি বলেছেন যে, গান ও দফ বাজানো-ঈদে এবং অন্যান্য উৎসবে–হাদিস দিয়ে জায়েজ যেখানে প্রমাণিত হল এবং ইহা কেবল বিবাহ ও বাসর রাতে বাজানো জায়েজ হবে। তারপরের হাদিসটি তুলে ধরছি। এই হাদিসটি *তিরমিজি শরীফ*-এর প্রথম খণ্ডের একশত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, মহানবী বলেছেন, 'তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর এবং মসজিদে বিবাহ পড়াও এবং অনেকগুলো দফ বাজিয়ে উহাকে প্রচার কর।' এই হাদিসটিতে আমরা মহানবীর তিনটি আদেশ পাচ্ছি : প্রথম আদেশটি হল, 'তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর।' বিবাহকে ঘোষণার অর্থ হল, যতটুকু পার ততটুকু প্রচার করে দাও যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এই জানিয়ে দেবার কথা হয়তো এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সবাই জানুক যে তারা বিবাহিত। সুতরাং না জানালে হয়তো অনেকে অনেক রকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারে। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে, বিবাহের পূর্ব হতেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নইলে সন্তান এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে হল? এ রকম নানান ধরনের কথা, সে যুগের কথা না হয় বাদই দিলাম, এই নব্য আধুনিক যুগেও শোনা যায়। তাই যাতে কোনো ধরনের কান-কথার অবতারণা না হয়, বলা হল, তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর। তারপরের আদেশটিও প্রচারমূলক আদেশ এবং পবিত্রতার ভয়ভীতি যেন থাকে সেদিকটিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আদেশটি হল, 'মসজিদে বিবাহ পড়াও'। মসজিদ আল্লাহ্‌র বিশেষ অথবা খাস ঘর। এই মসজিদ ঘরে সবাই নামাজ পড়তে আসে এবং সবাই না আসলেও অনেকেই আসে, তাই মসজিদ ঘরে বিবাহ পড়ানো হলে বিবাহের কথাটি সহজেই প্রচার হয়ে যায়। তারপরের কথা হল, আল্লাহ্‌র মসজিদে বিবাহ পড়ানো হলে যুবক এবং যুবতী উভয়ের মনে একটি ভয় থাকবে যে, আমরা যে উভয়ে উভয়কে বরণ করে নিতে যাচ্ছি উহা এমনই একস্থানে অঙ্গীকার করানো হচ্ছে, যে স্থানটিকে সবাই আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ বলে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়।

এমনিতেই যে কোনো বিষয়ের উপর সত্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন উঠলে মসজিদ ঘরে শপথ করে বলার প্রশ্ন উঠলে মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটি ভয়ভীতি আসে। কারণ, মসজিদ ঘরের ভেতর মিথ্যা শপথ করতে ভয় লাগার কথাই। বিশেষ করে যারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। অবশ্য কিছু পাষণ্ড প্রকৃতির মানুষ আছে যারা সব যুগেই সবখানেই মিথ্যা শপথ করে এবং তাদের পরিণতি একদিক না একদিক দিয়ে ভয়াবহ রূপধারণ করে। এ রকম পাষণ্ডদের করুণ পরিণতির দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। তাই মহানবী আদেশ করছেন যে, 'মসজিদে বিবাহ পড়াও'। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের যত দোষই থাক না কেন, কিন্তু তারা মসজিদে বিবাহ পড়াবেই। এই নিয়মটি দেখে হানাফি ভাইদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেবল ওহাবি ভাইদেরকে নসিহতই করে গেলাম এবং তাদের কোনো কিছুই ভাল না বলে প্রচার করি। অনেকটা ইরান-ইরাকের যুদ্ধের মত। ইরানের সব দোষ আর ইরাক হল আবে জমজমের পানির মত পবিত্র। আমি অধম লেখক শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদেরকে কম গালাগালি করি নি, কিন্তু তাদের সব আকিদাই যে খারাপ আর সুন্নিরা সবাই তুলসি পাতা ধোয়া জলের মত পবিত্র সে রকম তো লিখে গেলাম। কথায় বলে, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। অবশ্য আধুনিক কালে কমবেশি সব মাজহাবের মানুষেরাই কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব অথবা নামিদামি হোটেলে বিবাহের কাজটি সেরে ফেলে। কিন্তু এদিক দিয়ে শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা প্রাণ থাকতে মসজিদ ঘরে বিবাহ পড়াবেই। তাদের এই মহান আকিদার জন্য ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। অবশ্য আধুনিকতার আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে তারা নীতির প্রতি অটল থাকতে পারবে কিনা জানি না।

এবার হাদিসটির তৃতীয় আদেশটি হল, 'অনেকগুলো দফ বাজিয়ে উহাকে প্রচার কর।' বিবাহটির প্রচারের জন্য দফ বাজানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশটির মধ্যে দফের সংখ্যা দেওয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে অনেকগুলো দফ বাজাতে। এই অনেকগুলো দফ বাজাবার উদ্দেশ্য কী? অনেকগুলো দফ বাজালে বাজনার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং এতে অনেক দূরের মানুষেরাও বিবাহের কথাটি জানতে পারবে। আসলে বিবাহের প্রচারটিই এখানে মুখ্য এবং দফ বাজানোটা হল গৌণ।

অবশ্য আরেকটি হাদিস আমরা *তিরমিজি, নেসায়ী, আহম্মদ* এবং *ইবনে মাজা শরীফ* হতে পাই। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হাতেব আজমীর ছেলে মোহাম্মদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহানবীকে বলতে শুনেছেন যে, 'হালাল এবং হারাম বিবাহের পার্থক্য গান ও দফ দ্বারা হয়।' এই হাদিসটিকে কেন্দ্র করে কিছু সুন্নি মাওলানা (অধম লেখকও এই দলেরই একজন) অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অনেক সময় করে ফেলেন। তারা এই হাদিসটিকে সামনে রেখে যারা বিবাহে কোনো গানবাদ্য করে না তাদের বিবাহ শরিয়ত মত হয়নি বলে ঘোষণা

করেন এবং আরো অনেক আজেবাজে কথা বলে ফেলেন। ওহাবিরা না হয় কথায় কথায় কাফের মুশরিক ফতোয়া দেয়, তাই বলে কি আমাদেরকেও তাই করতে হবে? কে কাফের আর কে মুনাফেক এ রকম সিদ্ধান্ত আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেলি দেখে আমাদের অবস্থাটা কেমন হয়েছে সেটা কি দুরবিন দিয়ে দেখতে হবে? কাফের-মুশরিক না বলে ইহা তকদিরের লিখন বললে কি সুন্দর শোনায় না? কারণ, সমস্ত জ্ঞানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আল্লাহ্ই জানেন যে, কে কাফের কে মুশরিক আর কে মুসলমান। এতবড় বিচারের ভারটি নেওয়া কি উচিত, না আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল? কেবলমাত্র যারা জুলুম, অত্যাচার আর নির্মম শোষণ করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনেছে এবং এই নির্মম শোষণের পরিণতিতে জনতার হাতে দেওয়া হয় ভিক্ষাভাণ্ড, বেকারত্ব ইত্যাদি–তাদেরকে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে কেবল কাফের এবং মুশরিক ফতোয়া দেওয়াকে সামান্যই মনে করি। বরং তারা কাফেরের চেয়েও বড় কাফের এবং মুশরিকের চেয়েও বড় মুশরিক এবং তাগুত-পূজা তথা মূর্তিপূজা করার চেয়েও বড় মূর্তিপূজারক। যদিও খালি চোখে তারা মূর্তিপূজা করে না, কিন্তু নিয়তের প্রশ্নে তাদের চেয়ে বড় মূর্তি পূজারক কয়জন আছে, যাদের মোটর গাড়িটাকে রোদ-বৃষ্টি হতে রক্ষা করার জন্য ইট দিয়ে ঘর বানানো হয় আর সেই ঘরে রাখা হয় মোটর গাড়িটাকে; অথচ তাদেরই মত মানুষ, যাদের ফুটপাতে ছেলে-মেয়ে নিয়ে রাত কাটাতে হয়। এরাই হল একদম পাক্কা কাফের, মুনাফেক, মুশরিক এবং মূর্তিপূজারী। এই বিষয়টি নিয়ে অধম লেখক পৃথিবীর যে কোনো বড় আলেমের সঙ্গে বাহাস করতে প্রস্তুত এবং বাহাসের শর্ত থাকবে যে, যে হেরে যাবে তার মাথা ঐ বাহাসের মাহফিলে জনতার সামনে কেটে ফেলা হবে। যদি অহঙ্কার করার সামান্যতম সুযোগ ইসলামে থাকতো তাহলে বাংলা ভাষায় না বলে উর্দুতে সিংহের মত গর্জন করে বলতাম, 'দুনিয়ামে হ্যায় কোয়ি মাকা লাল, তো আও মেরে সাথ বাহাস কারো।' এবং ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টার মধ্যে বাহাসের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিতাম।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, কেবলমাত্র এই দুটো হাদিসের উপর ভিত্তি করেই হজরত ইমাম মালেক দফ বাজিয়ে বিবাহ ঘোষণা করাকে ওয়াজেব এবং হজরত ইমাম আবু হানিফা এবং হজরত ইমাম শাফেয়ী মোস্তাহাব বলেছেন।

নেসায়ী শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবদুল অহাব শারানীর রচিত *কাশফোল গোমাহ* নামক কিতাবে এবং *বাবো এয়লান ফিন্নেকাহ*-এর দুইশত পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি এভাবে রচিত হয়েছে যে, হজরত সায়াদের ছেলে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদিন আমি বিবাহ উপলক্ষে কোরায়জা বিন কাব এবং আবু মাসউদ আনসারীর বাসায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে প্রতিবেশিনী মেয়েরা রাগ-রাগিনীর সহিত গান বাজনা করতেছিল এবং সেখানে বসে হজরত কায়াবের ছেলে কোরায়জা ও আবি মাসুদুল আনসারী শুনতেছিলেন। আমি সেই দুই সাহাবাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'হে রসুলাল্লাহ্র (আ.) বদরী সাহাবারা, আপনাদের সামনে এটা কী হচ্ছে?' তারা বললেন, 'যদি ইচ্ছা হয় তো আমাদের সাথে বসে গান শুনুন, আর যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তো চলে যেতে পারেন। নিশ্চয়ই হজরত রসুল করিম (আ.) আমাদেরকে গানবাদ্য করতে বিবাহ উৎসবে অনুমতি দিয়েছেন।' আমরা জানি যে, মদিনার আনসার সাহাবারা মহানবীকে কতটুকু ভালবাসতেন এবং মহানবীর জন্য তাদের জীবন দিতেও কোন পরোয়া করতেন না। সেই আনসারদের মধ্যে দু'জন সাহাবা কোন এক বিবাহ উৎসবে গানবাজনা শুনতেছিলেন। যখন হজরত আমের (রা.) সেই দুই মহান সাহাবাকে গানবাদ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তাঁরা বললেন যে, মহানবী তাদেরকে বিবাহ উৎসবে গানবাদ্য করার অনুমতি দিয়েছেন। যে দুইজন সাহাবা সাক্ষ্যদান করলেন যে, ইহা মহানবীর অনুমতিক্রমেই করা হচ্ছে, তাঁরা কি মামুলি সাহাবা? অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে কোনো সাহাবাই মামুলি নন, কিন্তু মর্যাদার প্রশ্নে এই দুই সাহাবার ভাগ্য এতই ভাল ছিল যে, তাঁরা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং একদিকে তাঁরা যেমন মহান সাহাবা অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন গাজি। বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব ইসলামের উপর কতখানি ছিল সেটা বুঝিয়ে না দিলেও সবাই কমবেশি বুঝতে পারে। সুতরাং মহানবীর দেওয়া অনুমতির কথা মিথ্যা হতে পারে না। আরো একটি বিষয় লক্ষ করার মত যে, গানবাদ্য শোনাটা নিজের রুচির উপর নির্ভর করছে। তাই বলা হল যে, পছন্দ হলে শুনতে পারেন, না হলে চলে যেতে পারেন। এখানে বাধ্যবাধকতার উপদেশ দেওয়া হয়নি। আর একটি হাদিস যাহা *বোখারী শরীফ*-এর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ ভাগে এবং *কেতাবুল ঈদাইন*-এর একশত ত্রিশ পৃষ্ঠায় এবং *মোসলেম শরীফ*-এর প্রথম খণ্ডের দুই শত একানব্বই পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, 'এক সময় আমার স্বামী হজরত রসুলুল্লাহ্ (আ.) আমার ঘরে ঢুকলেন, তখন আমার সামনে দুটি যুবতী গায়িকা বোয়াস যুদ্ধের গান দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে গাইতেছিল। রাসুলুল্লাহ্ (আ.) অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই সময় হজরত আবু বকর (রা.) ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন যে, "শয়তানের বাজনা রসুলের নিকট!" তখন হজরত রসুল করিম (আ.) হজরত আবু বকরকে (রা.) লক্ষ করে বললেন, "এদেরকে ছেড়ে দাও।" (অর্থাৎ এদেরকে দফ বাজিয়ে গাইতে দাও)। তারপর রসুল করিম (আ.) অন্যমনস্ক হলে আমার (মা আয়েশার) ইশারায় তারা বেরিয়ে গেলেন।'

এই হাদিসটিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদিও মহানবী মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন, কিন্তু দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে যে গান গাইতেছিল এবং তা মা আয়েশা (রা.) শুনছিলেন ইহাতে কোনো প্রকার সন্দেহ এবং প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি ইহা হারাম হত তাহলে কখনোই মহানবী সামান্যতম প্রশ্রয় দিতে পারতেন না। কারণ, হারাম যত ছোটই হোক না কেন উহা হারাম। খোদা না করুন, যদি ঐ দুই যুবতী মা আয়েশার (রা.) সামনে মদ পান করতো এবং মহানবী ঘরে প্রবেশ করে যদি সেই দৃশ্য দেখতে পেতেন তাহলে অবশ্যই প্রচণ্ড

ধমক দিয়ে কেবল মানাই করতেন না, বরং ঐ দুই যুবতীকে ঘর হতে তাড়িয়ে দেওয়া হত এবং মা আয়েশা (রা.)-কেও অনেক কিছু অবশ্যই শুনতে হত।

হজরত আবু বকর (রা.) মহানবীর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবা ছিলেন। মহানবী মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছেন দেখে তাঁর মনে কষ্ট হয়েছে বলেই আপন কন্যাকে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু মহানবী হজরত আবু বকরকে কিছু বলতে বারণ করে দিলেন। তারপর এক সময় মা আয়েশার (রা.) আদেশেই দুই যুবতী গায়িকা চলে গেলেন। এখানে হয়তো কেউ ভুল করতে পারেন এই বলে যে, যেহেতু মা আয়েশার বয়স কম ছিল তাই মহানবী সেই বয়সের দিকে লক্ষ করে কিছু বলেননি। কিন্তু প্রশ্ন হল মা আয়েশার বয়স কম হতে পারে, তাই বলে তিনি চার-পাঁচ বছরের শিশুটি অবশ্যই ছিলেন না। তা ছাড়া মহানবীর কথা না হয় বাদই দিলাম, ধরুন আমাদের যে কারো ছয় সাত বছরের বালক অথবা বালিকার হাতে যদি মদের বোতল এবং সামনে গ্লাস-ভরা মদ দেখতে পাই তাহলে কি চিৎকার করে উঠবো না? বাধা দেওয়া তো মামুলি ব্যাপার, তার চেয়েও কি চরম কোনো ব্যবস্থা নেব না? কারণ, আমরা সবাই জানি যে মদ হারাম।

বোখারী এবং *মোসলেম শরীফ*-এর ঈদের নামাজের অধ্যায়ে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–আনসার গোত্রের দুইজন যুবতী মেয়ে ঈদের দিনে দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে গান গাইতেছিল। হজরত রসুল করিম (আ.) নিজের চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে শুয়েছিলেন। হজরত আবু বকর (রা.) হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সামনে এসে ওদেরকে (গায়িকাদের) ধমক দিলেন। তখন মহানবী নিজের পবিত্র মুখ হতে চাদর সরিয়ে হজরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, "এদেরকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কিছু বলতে যেও না) কারণ আজ ঈদের দিন। প্রতিটি জাতির জন্য ঈদ (অর্থাৎ আনন্দের দিন) অবশ্যই আছে এবং আজ আমাদের ঈদ (বা আনন্দের দিন)।"

আসুন, এই হাদিসটিরও সামান্য ব্যাখ্যা করা হোক এবং তারপরের যে হাদিসটি তুলে ধরবো ওটার ব্যাখ্যা ফেঁড়ে-চিঁড়ে তন্নতন্ন করে এবং প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার বিভিন্ন যুক্তির উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হবে।

এই হাদিসটি অনেকটা আগের বর্ণিত হাদিসের কাছাকাছি, তবে এখানে ব্যতিক্রম শুধু এটুকুই যে, মহানবী হজরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন যে, আজ আমাদের আনন্দের দিন এবং আরো মনে করিয়ে দিলেন যে, এই আনন্দের দিনটি কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে এবং আমাদেরও আছে। সুতরাং আজকের দিনটি আমাদের আনন্দের দিন। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির আনন্দের দিন আছে এবং তারা আনন্দ করে, কিন্তু আমরা কি মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো? সবার আনন্দ করার অধিকার থাকলে আমরা কেন আনন্দ করবো না?

এবার আমরা যে হাদিসটি বর্ণনা করবো সেই হাদিসটি *তিরমিজি শরীফ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশত নয় হতে দশ পৃষ্ঠায় আছে এবং *মেশকাত শরীফ*-এর পাঁচশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় এবং *আবু দাউদ শরীফ*-এও আছে। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী কোন একটি যুদ্ধ হতে একবার ফিরে আসার সময় কালো রঙের একজন দাসী (হাবসি যুবতী দাসী) মহানবীর সামনে এসে বললো যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (আ.), আমি নজর মেনেছিলাম যে, (মানত করেছিলাম) আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ্ ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান করবো। মহানবী বললেন, যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও (অর্থাৎ তোমার মানত পুরা কর), নতুবা নয়। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো। তারপর হজরত আবু বকর (রা.) আসলেন এবং সে (মেয়েটি দফ) বাজাতে লাগলো। তারপর মাওলা আলী এলেন, সে বাজাতে লাগলো। একটু পরেই হজরত উসমান (রা.) এলেন এবং মেয়েটি বাজাতে লাগলো। যখন হজরত ওমর (রা.) আসলেন তখন মেয়েটি দফটিকে পাছার নিচে রেখে বসে পড়লো। সেই সময় মহানবী বললেন, 'ওমর তোমাকে শয়তানও ভয় করে। আমি বসেছিলাম আর এই মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতেছিল। আবু বকর, আলী এবং উসমানের আগমনের পরও সে দফ বাজাতেছিল। হে ওমর, যখন তুমি আসলে তখন সে দফটি রেখে দিল।' এই হাদিসটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কারণ এই হাদিসটিকে অনেকে সহি হাদিস বলে মেনে নিয়েও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইচ্ছে করে ভুল করে ফেলে। ইচ্ছে করে বললাম এ জন্য যে, এদের চোখ থাকতেও কানা সাজে আর বিবেক থাকতেও বিবেকহীনের ভূমিকা পালন কেমন করে করে সে বিষয়েই সামান্য আলোচনা করতে চাই। তারা একটা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করায় এই বলে যে, যেহেতু হজরত ওমরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়ে নিতম্বের নিচে দফটিকে লুকিয়ে রাখলো আর ঠিক সেই সময়েই মহানবী হজরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ করে বললেন যে, তোমাকে শয়তানও ভয় করে এবং এই 'শয়তানও তোমাকে ভয় করে'-কে পুঁজি করে গান বাজনাকে হারাম হবার প্রমাণ করে এবং বলে যে ইহা শয়তানি কাজ বলেই দফ বাজিয়ে গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কী চমৎকার যুক্তির বহর! মহানবী এবং অপর তিনজন সাহাবার মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান শোনার সময়টিকে কী ফতোয়া দেবেন? দফ বাজিয়ে গান শোনা যদি হারামই হয়ে থাকে তাহলে মহানবী এবং অপর তিনজন সাহাবা কেন শুনলেন? বিষ কি আগামীকাল অমৃত হয়ে যায়? বিষ চিরদিনই বিষ থাকে। পছন্দ না হবার ফতোয়া এক রকম আর হারাম হবার ফতোয়া অন্য রকম।

এই হাদিসটি হতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভাল মানত করলে উহা পূরণ করতে হবে। কারণ, মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান শোনাবার মানত করেছিল এবং সেই মানতটি ভাল বলেই পূরণ করতে মহানবী মানা করলেন না। বরং বলা হল, যদি মানত করেই থাক তাহলে কর, নতুবা করো না। মেয়েটি যদি মদ্যপান অথবা কোরাণে বর্ণিত যে কোন হারামের উপর মানত করতো তাহলে অবশ্যই মহানবী তা বারণ করতেন। যেহেতু দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হারাম না সেইহেতু মহানবী সেই মেয়েটিকে মানত পূরণ করতে বললেন।

এই হাদিসটি হতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যে দফ বাজিয়ে গান গাইবার মানত করেছিল সে কিন্তু বালক, যুবক, পৌঢ় অথবা একদম বৃদ্ধ পুরুষ নয়। সে হল একজন যুবতী নারী। কোনো নাবালিকা অথবা বৃদ্ধাও নয়। সুতরাং যুবতী নারীরা এ যুগে বাদ্যসহ গান গায় তাহলে হারাম হয় কেমন করে এবং পুরুষেরা যদি সেই বাদ্যসহ গান শোনে তাহলে সেটাও কী করে হারাম হয়? নিয়তের উপরই ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সুতরাং নিয়ত যদি ভাল হয় তাহলে মেয়েদের বাদ্যসহ গান গাওয়া এবং পুরুষদের শোনার মধ্যে দোষ কোথায়? নিয়ত খারাপ করে কোরান পাঠ করার প্রমাণ এবং তার পরিণতি কী হতে পারে হজরত ওমরের খিলাফতের সময়ের ঘটনাটির কথা মনে করুন তো। হাদিস শরিফে আছে যে মহানবী বলছেন, 'পাপ কাজের মানত পূর্ণ করাও পাপ। নেক কাজের মানত আদায় করাও নেক।'

হজরত আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী (র.) মেশকাত শরীফের *শরহে লোম্‌য়াত* নামক কেতাবে লিখেছেন যে, 'এই হাদিসের দ্বারা মেয়েদের গান গাওয়া জায়েজ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যদি ফেতনার ভয় না থাকে।'

দারকুতনী শরীফ-এ এই হাদিসটি বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী হজরত হাসান ইবনে সাবেতকে নিয়ে কোনো স্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মহানবীর সাহাবারা চুপ করে বসে আছেন এবং ওখানে একটি মেয়ে, যার নাম শিরীন, সে মেজমার নামক (এক প্রকার) বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ঐ সাহাবাদের মাহফিলে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে ছিল। এমন সময় মহানবী ঐ মাহফিলে এলেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন আদেশ অথবা নিষেধ কিছুই করলেন না।

মহানবী শিরীন নামের মেয়েটির কাছে এলে শিরীন জানতে চাইলো যে, 'মহানবী, আমার জন্য গানবাদ্য করার দরুণ কোন ক্ষতি হবে কি?' মহানবী হেসে বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হবে না।'

এই হাদিসটির সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে লক্ষ করুন যে, দুই-একজন সাহাবা নয় বরং বেশ কয়জন সাহাবা চুপ করে বসে গান শুনছেন এবং যে গান গাইছে সে কিন্তু পুরুষ নয়, একজন যুবতী নারী। এই যুবতী কি বিবাহিতা না অবিবাহিতা ইহার উল্লেখ হাদিসটিতে নেই। তবে যুবতীটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে শিরীন। সে যে বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে গান গেয়েছে সেই বাদ্যযন্ত্রটি কিন্তু আরবের বহুল প্রচারিত সেই যুগের 'দফ' নয়। এখানে মেয়েটি দফ বাদ্যযন্ত্রটি না বাজিয়ে আর এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছে এবং সেই বাদ্য যন্ত্রটির নাম হল 'মেজমার'। সেই শিরীন নামক যুবতী মেয়েটি কিন্তু বসে বা একই স্থানে দাঁড়িয়ে গান গায় নি বরং সাহাবাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেছিল। মহানবীর সাহাবাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু সব সাহাবাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং যে সাহাবারা বসে শিরীন নামক যুবতীর গান শুনেছেন এবং নিশ্চয়ই সেই যুবতীটি বোরখা পরে গান শোনান নি বরং যতটুকু শালীনতার দরকার ততটুকু পোশাক শিরীন নামক যুবতীটির শরীরে অবশ্যই ছিল। সুতরাং একটি যুবতী যদি শালীনতার পোশাক পরে এই যুগে পুরুষদের সামনে গান গায়, তাহলে কী ফতোয়া দেব? হাদিসটিতে আরো একটু লক্ষ করুন যে, সেই ঘুরে ঘুরে গান গাওয়ার সময় মহানবীর আগমন এবং মহানবীর এই গান গাওয়ার বিষয়টির উপর মন্তব্য অতি পরিষ্কার। মহানবী কিন্তু এসে কোনো প্রকার আদেশ অথবা নিষেধ করলেন না, তথা হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। বরং সেই শিরীন নামক যুবতীটিই মহানবীর সামনে এসে জানতে চাইলো যে মহানবী, আমার জন্য গানবাদ্য করার দরুণ কোনো ক্ষতি হবে কি? মহানবী হাসলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হবে না। মহানবীর এই স্পষ্ট বক্তব্যটির ব্যাখ্যা দেবার কোনো দরকার মনে হয় না। কারণ, ইহা সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, মহানবী শিরীন নামক যুবতীটিকে কী উপদেশ দিলেন এবং এই উপদেশটি কি সর্বযুগের সর্বকালের শিরীন নামক গায়িকার মত অন্যান্য গায়িকাদের জন্য প্রযোজ্য নয়? বিশ্বনবীর উপদেশ-বাণী কি বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বজনীন নয়?

তেবরানী এবং *নেসাই শরীফ*-এ উল্লেখিত আর একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, মহানবীর কাছে একটি মেয়ে আসলে মহানবী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আয়েশা, তুমি এই মেয়েটিকে চেন কি?' আমি চিনি না বলাতে মহানবী বললেন, 'এই মেয়েটি অমুক গায়িকা। তুমি কি এর গান শুনতে ভালবাস?' হজরত আয়শা বললেন, হাঁ ভালবাসি। তারপর সে গান গেয়ে শোনাল।

মহানবী জানতেন, যে মেয়েটি এসেছে সে একজন গায়িকা। মা আয়েশা জানতেন না বলেই মহানবী প্রশ্ন করেছিলেন। যখন সেই মেয়েটি একজন গায়িকা বলে মহানবী মা আয়েশাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিয়েই মহানবী চুপ করে থাকেন নি বরং প্রশ্ন করলেন যে, এই সদ্য পরিচয় করিয়ে দেওয়া গায়িকার গান শুনতে ভালবাসে কিনা। মা আয়েশা গান পছন্দ করেন বলেই বললেন যে গান তাঁর শুনতে ভাল লাগে। তারপর এই পরিচয় করিয়ে দেওয়া মেয়েটি গান গেয়ে শোনাল।

বোখারী শরীফ এবং *মেশকাত শরীফ*-এ এই হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নতুন বিবাহিতা একটি যুবতীকে (তার স্বামী) একজন আনসারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে মহানবী বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে গানবাজনা কি নেই? কারণ, আনসারেরা (মদিনাবাসীরা) গানবাজনা পছন্দ করে থাকেন।'

এই হাদিসটি হতে প্রমাণিত হচ্ছে, আনসারেরা তথা মদিনাবাসীরা যে গানবাজনা পছন্দ করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, স্বয়ং মহানবীই তাঁর পবিত্র মুখ হতে এই গানবাজনা পছন্দ করার কথা বললেন। আর এই হাদিসটি আমরা এমন এক হাদিস শরিফে পাচ্ছি যাকে কোরানের পরই মুসলমানেরা একবাক্যে স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং হাদিসটির গুরুত্ব অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠে না। নববধূ স্বামীর ঘরে যাচ্ছে অথচ সঙ্গে গানবাজনা নেই দেখে মহানবী সামান্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের সঙ্গে গানবাজনা কি নেই?' প্রশ্ন হল, মহানবী কেন এই গানবাজনার কথা মনে করিয়ে দিলেন? গানবাজনা যদি হারামই হতো তাহলে মনে করিয়ে দেওয়া এবং

প্রশ্ন করার কথাই উঠে না। বরং নববধূর সঙ্গে গানবাজনা মহানবী অবশ্যই মানা করে দিতেন। যেমন মদ পান করা হতে বিরত থাকার জন্য মহানবী বার বার বারণ করে দিতেন অথচ সঙ্গীত বিষয়টি কেবল মনেই করিয়ে দিলেন না বরং আনসারেরা যে সঙ্গীত ভালবাসেন সেই কথাও মহানবী ঘোষণা করে দিলেন।

এই হাদিসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন হজরত শায়খুল মোহাদ্দেসীন আবদুল হক দেহলভী তাঁর রচিত কেতাব *আশ শোয়াতোল্ লোমাত শরহে মেশকাত*-এর তৃতীয় খণ্ডের এক শত সতেরো পৃষ্ঠায়।

এবনে মাজা শরীফ-এর দুই শত চৌষট্টি পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) আনসারদের মধ্যে তাঁর এক আত্মীয়াকে বিবাহ দিলেন। মহানবী ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, 'যুবতীটিকে কি তার স্বামীর ঘরে তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি।' মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন গায়িকা কি তার সাথে পাঠিয়েছ?' তিনি বললেন, 'না'। তারপর মহানবী বললেন 'আনসারেরা গান পছন্দ করে। সেই যুবতীটির সঙ্গে একজন গায়িকা তুমি কেন পাঠালে না, যে তার স্বামীর বাড়ি গিয়ে গান গাইতো?'

এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দিতে গেলে আগের হাদিসটির ব্যাখ্যার মতই হয়। তবে এখানে মহানবী মা আয়েশাকে স্পষ্ট বলে দিলেন যে, সেই নব বিবাহিতা যুবতীটির সঙ্গে একজন গায়িকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এ জন্যই উচিত ছিল যে আনসারগণ গানবাজনা পছন্দ করে।

এখন যে হাদিসটি বর্ণনা করছি ইহা সহি রেওয়ায়েতের সহি এবনে মাজা শরীফে এবং ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম শরীফে ঐ রাবীগণ হতে হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, মহানবী মদিনার কোনো গলি দিয়ে একসময় যেতেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু বালিকা হাতে তালি দিয়ে এটাই গাইতেছিল যে, বনি নাজ্জার গোত্রের বালিকা আমরা। মহানবী আমাদের প্রতিবেশী। তাই আমরা কত বড়ই না ভাগ্যবতী। তখন মহানবী তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদের কতটুকু ভালবাসি সেটা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন।'

এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দেবার কি প্রয়োজন মনে করেন? একটু চিন্তা করলেই এই হাদিসটির বক্তব্য পরিষ্কার বুঝা যায়। তবে আরবেরা এই আধুনিক যুগেও যত বাদ্যসহই গান শুনুক বা কেন, হাতে তালি তারা দেবেনই। কারণ, হাতে তালি দেওয়া তাদের দেশের একটি বিশেষ রেওয়াজ। আরবি বিখ্যাত গায়ক আর গায়িকা বিশেষ করে এই যুগে যেমন সামিরা তৌফিক, উম্মে কুলসুম এবং আবদুহুর গান শুনলে হাতে তালি দেবার রেওয়াজটা যে আগের মত হুবহু রয়ে গেছে তা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। আরো একটি মজার কথা হল যে, আরবদের বিবাহে আমাদের দেশের হিন্দুদের বিবাহে যেমন উলুধ্বনি দেয় সে রকম তারাও দেয়। এই উলুধ্বনি দেওয়া প্রাচীনকাল হতেই আরবদের মধ্যে চালু ছিল এবং এখনো ঠিক তাই আছে। অথচ বাংলাদেশের কোনো মুসলিম পরিবারে এ রকম উলুধ্বনি বিবাহে দেবার কল্পনাও করে না। কারণ, বাংলাদেশের মুসলমানেরা এটাকে হিন্দুদের প্রথা বলে মনে করে। মহানবীর কন্যা খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা নিজেই যে উলুধ্বনি দিতেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ অনেক কেতাব হতে পাওয়া যায়।

আর একটি হাদিস *তফসীরে আহাম্মদী*-র ছয় হতে দশ পৃষ্ঠায় পাই, কিন্তু কোন হাদিস শরীফে এই হাদিসটি আছে তা উল্লেখ করা হয়নি। তফসিরে আহাম্মদীতে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমার কাছে একটি যুবতী গানবাদ্য করতেছিল। মহানবী ঘরে প্রবেশ করলে সেই যুবতীটি একইভাবে গানবাদ্য করছিল। তারপর হজরত উমর (রা.) প্রবেশ করলে সে বন্ধ করে দিল। মহানবী ইহা দেখে হাসলেন। হজরত উমর (রা.) মহানবীকে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মহানবী ঐ দাসীর কথা তাঁর (উমরের) কাছে বললেন। হজরত উমর (রা.) বললেন, মহানবী যা শুনেছেন আমিও উহা না শুনে এখান থেকে যাব না। মহানবীর আদেশে ঐ গায়িকা হজরত উমর (রা.)-কে গান শোনান।

হাদিসটির ব্যাখ্যা ইচ্ছা করেই দেওয়া হল না। কারণ, ইহা তফসীরে আহাম্মদীতে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো দলিল-প্রমাণ সামনে রেখে অথবা কোনো হাদিস শরিফের উল্লেখ না করে বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা তফসিরকারকের ব্যক্তিগত মতামত কিনা অথবা গান বাজনাকে হালাল প্রমাণ করার জন্য নিজের বানানো হাদিস কিনা তা যেহেতু জানতে পারলাম না সেই হেতু এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দেওয়া হাস্যকর ব্যাপারই মনে করি। কারণ, আইনের মানদণ্ডে ইহা টিকে না। আমি কেবল এ রকম একটি হাদিসের উল্লেখ তফসীরে আহাম্মদীতে পেলাম বলে জানিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করলাম। এভাবে গানবাজনার উপর আরো কথা আছে এবং থাকতে পারে যা কেবল বর্ণনা করে যাব। কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া হবে না। হাদিস শরিফের নাম থাকলে ব্যাখ্যা কমবেশি অবশ্যই দেওয়া হবে।

ইমাম বায়হাকী *দালায়েলুন নবুওয়াত*-এ লিখেছেন এবং ইমাম গাজ্জালী তাঁর অমর গ্রন্থ *এহ্ইয়াউল উলুম*-এ লিখেছেন যে, তবুকের যুদ্ধ হতে যখন মহানবী ফিরে এলেন তখন মদিনার মেয়েরা একটি আরবি কবিতা দফ বাজিয়ে এবং হাতে তালি দিয়ে গেয়েছিল।

রেসালা সামায় নামক কেতাবের লেখক কাজী সানাউল্লা পানিপথী লিখেছেন যে, একসময় হজরত উমর (রা.) এক গলি (সরুপথ) দিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি বাজনার শব্দ শুনে প্রশ্ন করলেন, এখানে কী হচ্ছে? তাঁকে জানানো হল যে, এখানে খাতনার উৎসব হচ্ছে। তিনি কিছু না বলে চলে গেলেন। যেহেতু ইহা হাদিস নয়, কারণ ইহা হজরত উমরের কথা বলা হয়েছে সেইহেতু বলার কিছু থাকে না। তবে যেহেতু হজরত উমর (রা.) একজন খুবই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা সেইহেতু হয়তো কিছু বলা যায়। কিন্তু এই বক্তব্য কতটুকু সমর্থনযোগ্য সেটার প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সে রকম প্রশ্ন উঠলে আমার বলার মত কিছু নেই।

কাজী সানাউল্লা পানিপথী আর একটি সুন্দর কথা লিখেছেন তাঁর ঐ একই কেতাবে যে, বিবাহ ঘোষণার জন্য যদি বাজানো জায়েজ বা মোস্তাহাব হয় তাহলে ঢোল, তাম্বুরা, নাকারা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদির মাঝে পার্থক্য এমন কী থাকতে পারে? খারাপ নিয়তের জন্য সবই যদি হারাম হয়, তাহলে ভাল নিয়তের জন্য সবই কি হালাল হবে না? দফ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাঝে তারতম্য করার কোনো মানেই হয় না এবং ইহা একটি বোকামির পরিচয় দেওয়া মাত্র।

মহানবী যে সকল কাপড় ব্যবহার করতেন সেগুলোর বুনন পদ্ধতির সঙ্গে এ যুগের কাপড়ের বুনন পদ্ধতির মাঝে কোন মিল তো দূরের কথা, কৃত্রিম আঁশের তৈরি টেট্রন, পলিস্টার, কেরলিন ইত্যাদির তৈরি জামা ব্যবহার করে সুন্নতি লেবাসের দাবি করি। যুগের পরিবর্তনে দ্রব্যের পরিবর্তন হবেই। সুতরাং সে যুগে আরবদের মধ্যে যে কয়টি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল উহা আমাদেরকেও এ যুগে বাজাতে হবে বললে লোকে মাথা খারাপ বলবে কি-না?

মীজানুল এয়েতেদাল নামক বিখ্যাত উসুলে হাদিসের প্রথম খণ্ডের আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এবং হজরত শেখ মোহাদ্দেস দেহলবী *মোদারেজুন নবুয়াত*-এ লিখেছেন যে, 'ইমাম বোখারী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহম্মদ হাম্বল ও ইমাম শাবা এবং অনেক মোহাদ্দেসের গুরু হাদিস শরিফের হাফেজ হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদ 'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত গান শুনেছেন। যখন তিনি বাগদাদে এলেন তখন হাদিস শোনার জন্য খলিফা হারুন-উর-রশীদ অনুরোধ জানালেন। তিনি উদ আনতে বললেন। খলিফা বললেন, গন্ধযুক্ত উদ নামক কাঠ জ্বালাবার জন্য কি আনবো? তিনি বললেন, তারযুক্ত উদ নামক বাদ্যযন্ত্র চাই। খলিফা আনলেন এবং তিনি উদ বাজিয়ে গান করলেন। তিনি আরো বললেন যে, যাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তারা কেবল হারাম জানবে। এই কথা শুনে খলিফা প্রশ্ন করলেন যে, সঙ্গীত বিষয়ে ইমাম মালেক হতে কোনো প্রকার বক্তব্য শুনেছেন কি? তিনি বললেন আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটুকু জানি যে, বনি ইয়ার বাহার এক নিমন্ত্রণে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। সেই দাওয়াতের মজলিসে উদ এবং অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং সেই লোকেরা গাইতেছিল এবং বাজাইতেছিল। সেখানে হজরত ইমাম মালেকের হাতে চার কোণ বিশিষ্ট একটি দফ ছিল। তিনিও ইহা বাজাইতে ছিলেন এবং গাইতেছিলেন।'

উপরের বর্ণিত কথাগুলোর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। কারণ, ইহা হাদিস নয়। তবে হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদের মত বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় আলেম যেখানে খোদার কসম করে বলছেন যে, ইমাম মালেক দফ বাজিয়ে গান করেছেন, সেখানে কী করে অবিশ্বাস করা যায়? এরপরও যদি কেউ সঙ্গীত বিষয়টিকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে বলার কিছু নেই। *মসনদে ইমাম আহ্মদ*-এ বলা হয়েছে যে, মহানবীর সামনে একজন হাবসি এক সময় দফ বাজিয়ে নাচতেছিল এবং গাইতেছিল যে, 'রসুলুন মোহাম্মাদুন্ আবদুন্ সালেহুন'। মহানবী প্রশ্ন করলেন যে, সে কী বলছে? সে বললো, আমি বলছি, 'রসুলুন মোহাম্মদুন্ আবদুন্ সালেহুন।'

ইহা যেহেতু হাদিস সেইহেতু সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। লক্ষ করুন, একজন হাবসি কেবল দফ বাজিয়ে গাইলো না বরং গান ও বাজনার সঙ্গে নাচতেছিল। সুতরাং গানের সঙ্গে নাচার দলিল পাওয়া গেল। তাই গানের সঙ্গে যদি কেউ নৃত্য করে তা মোটেই দোষণীয় নয় বরং জায়েজ এবং নৃত্য হালাল হবার অকাট্য দলিল পাওয়া গেল। যদি নৃত্য করা হারাম হত তাহলে অবশ্যই মহানবী সেই হাবসিকে বারণ করে দিতেন। ইমাম আবদুল বার রচিত বিখ্যাত কেতাব *আলএস্তিয়াব*-এ বলা হয়েছে, এবং জাহাবী ও শাবী হতেও একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত মাবিয়া (রা.) ও হজরত উমর ইবনুল আস (রা.) বলেছেন যে, সাহাবা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট উদ নামক বাদ্যযন্ত্রসহ উভয়ে গান গাওয়া শুনেছেন। হজরত আবদুল্লা ইবনে জাফর (রা.) এমনকি নিজের দাসীদের গান শুনতেন এবং দাসীরা এক প্রকার তার দিয়ে বাঁধানো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান করতেন। ইহা মাওলা আলীর সময়ের কথা। এই বিখ্যাত কিতাবটিতে আরো বলা হয়েছে যে, হজরত আবদুল্লা ইবনে জাফর (রা.) গানবাজনাকে কোনো প্রকার মন্দ কাজ বলে জানতেন না।

এই কথাগুলোর কোনো ব্যাখ্যা চলে না। কারণ, ইহা হাদিস নয়, তবে যারা ইসলামের উপর গবেষণা করেন তারা জানেন যে, ইমাম আবদুল বার একজন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং তাঁর রচিত বিখ্যাত কেতাব *আলএসতিয়াব*-এর মূল্য কতখানি। পাঠক ভাইদেরকে একটি কথা এখানে বলার আছে। সেটা হল, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) মহানবীর চাচাতো ভাই। মহানবী তাঁকে খুবই আদর করতেন। মহানবী তার মাথায় এবং মুখমণ্ডলে বহুবার চুমো খেয়েছেন এবং বিশেষ দোয়া করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য বহু সাহাবারা এবং তাবেইনগণ খুবই শ্রদ্ধা করতেন। যদি গানবাজনা হারামই হতো তাহলে এ রকম মহান সাহাবার পক্ষে কি হারাম কার্য করা সম্ভব?

অধম লেখক যদি হাজারও দলিল প্রমাণ দিয়ে গানবাজনাকে হালাল বলে দেখিয়ে দিতে পারে এবং হাদিসগুলোর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেও বুঝিয়ে দেয় তবু কিছু সংখ্যক মানুষ ইহা গ্রহণ করতে চাইবে না। এটা একপ্রকার এলার্জি রোগ কিনা জানি না। তবে এ রকম কিছু গানবাজনা-বিরোধী লোক না থাকলে সবই একাকার হয়ে যায়। সব বিষয়ের এবং সব দর্শনের বিরোধিতা না থাকলে হৈ চৈ নামক কথাটি আর থাকে না। সুতরাং হৈ চৈ এবং সমালোচনা ভাল। তাই বলে একে অপরকে কাফের-মুনাফেক ফতোয়া দেওয়া এবং এই ফতোয়ার দরুন মারামারি কাটাকাটি করা জঘন্য অপরাধ। গানবাজনা শুনতেই হবে এবং গানবাজনা না শুনলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় না যারা বলেন তারা যেমন উগ্র মেজাজী, তেমনি গানবাজনা শোনা হারাম বলাটাও একই রকম শোনায়। অনেক অলীয়ে কামেল জীবনে হয়তো গানবাজনা শোনার প্রয়োজনই অনুভব করেননি, আবার অনেক অলীয়ে কামেল গানবাজনার মধ্যে বিভোর হয়ে থাকতেন। সুতরাং আমাদের এইসব সামান্য বিষয়গুলোর মতবিরোধগুলো কমবেশি থাকবেই এবং এইসব মতবিরোধগুলোকে সম্বল করে মুসলমানদের বিরাট

ঐক্যের মাঝে যে অপূরণীয় ফাঁক তৈরি হয়েছে তা অচিরেই অবসান করতে হবে। যার যার মাজহাব অনুসরণ করে ইবাদত করতে দিন। আমাদের সকলের কণ্ঠে একটি স্লোগান ধ্বনিত হোক আর সেই স্লোগানটির ভাষা হোক, 'আমরা যে কোনো ফেরকারই হই না কেন, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল আমরা সবাই মুসলমান।'

খাজানা এবং *কাফি* নামক বিখ্যাত ফেকার কেতাব দুটোতে বলা হয়েছে যে, 'গানবাজনায় খারাপ নিয়ত থাকলে উহা হারাম হবে, কিন্তু ভাল নিয়তে গানবাজনা করলে উহা হালাল হবে।'

মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে গানবাজনার উপর সুন্দর মন্তব্য করা হয়েছে।

তারিখে মোগান্নী নামক প্রসিদ্ধ কেতাবের লেখক আবুল ফুরজ ইস্পাহানি এবং *মোবারেদ* নামক কেতাবের লেখক আবুল আস লিখেছেন যে, 'হজরত হাসান ইবনে সাবেত (রা.) উদ নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত গান শুনে দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে এবং ভাবের মাঝে ডুবে নাচতেছিলেন।' *জাখিরা ফেকাহ* নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'দফের বাজনা শোনা, নৃত্য করা এবং সঙ্গীতের রাগরাগিনী শোনার মধ্যে যদিও ঝাঁজ থাকে, কিন্তু হারাম নহে।'

হাক্কুল মোবীন নামক কেতাবে হজরত মাওলানা সাঈদ মোজাদ্দাদি লিখেছেন যে, ঢোলক, তাসা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি তবলের মত এবং প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে এবং থাকবেই।

এম্‌তা কেতাবের লেখক উদ নামক বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জেনে অন্য সকল বাজনার যন্ত্রগুলোকেও হালাল জেনেছেন।

ইসতিয়াব নামক কেতাবের লেখক মাওলানা আবদুর রব বলেছেন যে, গানবাজনা শোনার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

মাদারেজুন্ নবুয়ত নামক কেতাবের পাঁচ শত ষোল পৃষ্ঠা হতে একুশ পৃষ্ঠায় সঙ্গীত যে হালাল তার প্রমাণগুলো দলিল ও যুক্তিসহ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদ সেই যুগে ইলমে ফেকার বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তিনি প্রথমেই সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং পরে ছাত্রদেরকে হাদিস পড়াতেন। ইনি সেই বিখ্যাত ইমাম যিনি খলিফা হারুন-উর-রশীদের দরবারে প্রকাশ্যে সঙ্গীত হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন যে, হজরত ইমাম মালেক চারকোণওয়ালা একটি দফ বাজিয়ে গান করেছেন। *কেতাবে তাজকেরাত*-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরিকে সঙ্গীত হালাল না হারাম এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তাঁরা বললেন, সঙ্গীত নির্দোষ। ছোট এবং বড় কোনো গুণাহ এর মধ্যে নেই। ইমাম আবু হানিফা যে সঙ্গীত শুনতেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে লেখা আছে। পরে অবশ্য ইমাম আবু হানিফা যে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বলেছেন উহা ঘৃণিত এবং নোংরা গান। শর্ত অনুসারে যে সঙ্গীত হারাম হয় সেই সঙ্গীতকেই ইমাম সাহেব হারাম বলে মনে করার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

ইমাম (আহমদ) ইবনে হাম্বলের সঙ্গীত শ্রবণে এমন হাল হতো যে তিনি একটানা দালানের ছাদের উপর নাচতেন। ইমাম সাহেবের ছেলে হজরত আবদুল্লাহ হতে এর বিশদ বর্ণনা পাই যাহা *মাদারেজুন্নবুয়ত* নামক কেতাবের পাঁচ শত আঠারো পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এই বিখ্যাত কেতাবটি যিনি লিখেছেন তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বজনমান্য হজরত মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী।

ইমাম আবদুল গণি নাবলেসি হানাফি সাহেবের কেতাব *ইজা হোদ্‌দালালাত*-এ পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত হারাম নয়। সঙ্গীত দূষিত হতে পারে কেবল শ্রোতা, গায়ক এবং বাদকের দোষে। সঙ্গীতের সঙ্গে যদি অশ্লীলতাকে জড়ানো হয় তখনই সঙ্গীত দোষণীয় বলে গণ্য হবে। কেবল এই ধরনের অশ্লীলতাসহ সঙ্গীতকে প্রত্যেক ইমামই দোষণীয় বলেছেন। কিন্তু যে সঙ্গীত নির্মল এবং নির্দোষ সেই সঙ্গীতকে ইমামগণ কেবল হালালই জানতেন না, বরং নিজেরাও শুনতেন।

দাউদ তাই নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, হজরত দাউদ তাই নিজে সঙ্গীতের মাহ্‌ফিলে হাজির থেকে বিভোর হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। সবচেয়ে মনে রাখার মত বিষয় হল, হজরত দাউদ তাই ছিলেন ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং ফেকা শাস্ত্রের বিরাট আলেম।

হজরত নাসির উদ্দিন আবুল বজ এস্‌কান্দারী ফেকা শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি সঙ্গীত ভাল পরিবেশে এবং ভাল লোকের দ্বারা হয় তবে জায়েজ আছে।

জামে নামক কেতাবের লেখক কারি আবু বকর খেলাল এবং আবদুল আজিজ বলেছেন যে, দোষণীয় নয় বলে প্রমাণিত সঙ্গীত হালাল।

সঙ্গীত যে জায়েজ এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত যুক্তি ও দলিল দ্বারা সুন্দরভাবে প্রমাণিত করে গেছেন হজরত আবু ইবনে খোররম তাঁর লেখা বিখ্যাত *মোফাসসালাত* নামক কেতাবে। এই *মোফাস্‌সালাত* নামক কেতাবটি এতই সুনাম অর্জন করেছিল যে, দামেস্কের মুফতি শায়খুল উলামা হজরত আবদুর রহমান কাদরি শাফেয়ি এবং হজরত শেখ তাজ উদ্দিন পর্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বিখ্যাত *শামী* কেতাবের পঞ্চম খণ্ডের দুই শত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় সঙ্গীত হালাল হবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই কথাটি স্পষ্ট ভাষায় *শামী* কেতাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'অবশ্যই কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হারাম হতে পারে না। শ্রোতা এবং বাদকদের খারাপ উদ্দেশ্যের জন্যই হারাম হয়ে যায়।' *শামী* কেতাবের ফতোয়াটি কিন্তু অপূর্ব। আমরা যদি এই আধুনিক যুগে ফতোয়াটি

সামান্য বুঝিয়ে বলতে চাই যে, দালান, প্রাসাদ, মসজিদ, পায়খানা মাটি পুড়িয়ে যে ইট বানানো হয় সেই ইট দিয়েই বানানো হয়। মসজিদ বানানোর জন্য যে ইট ব্যবহার করা হয় সেই একই ইট দিয়ে মসজিদের জন্য প্রস্রাব ও পায়খানা বানানো হয়। এখন ইটের কী দোষ? যারা ইটের অবস্থান যেখানে যেভাবে বসিয়ে দিয়েছে তাদেরকে দোষ দেব, না ইটের দোষ দেব? এভাবে আমরা প্রত্যেকটি বিষয়কে আমাদের মনের ভাল এবং মন্দের মানদণ্ডে কি বিচার করে দেখতে পারি না?

আবার *শামী* কেতাবের পঞ্চম খণ্ডের তিনশত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত এবং নৃত্য এই দুটো হালাল এবং হারাম কিনা এ বিষয়ে অকাট্য দলিল প্রমাণের দ্বারা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বহু কেতাবে। *এহ্ইয়ায়ে উলুম* এবং *আওয়ারেফুল মারেফ*-এ সঙ্গীত যে হালাল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হজরত আল্লামা নাহরীর ইবনে কামাল বা-শা (র.) সঙ্গীত বিষয়টির উপর জ্বালাময়ী ভাষায়, ব্যাখ্যায় এবং দলিল প্রমাণের মাধ্যমে হালাল প্রমাণ করে গেছেন। এবং এইসব বিখ্যাত কিতাবগুলো আজও বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে অনুবাদ করে প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করা তো দূরে থাক বরং সুফিবাদের গলা টিপে কেমন করে খুন করা যায় সেই ফন্দিফিকির আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে। তবে বাংলার মাটিতে বাবা লালন ফকিরের গান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সুফিবাদ বেঁচে থাকবে। যদি রবীন্দ্রনাথ আর কাজী নজরুলের মত লালনগীতি প্রতিদিন টেলিভিশনে প্রচার করা হত তাহলে মানুষ কলুষিত বস্তুবাদের মায়াজালে আটকিয়ে থেকেও আত্মার প্রশ্নে বিনয়ে মনের অজান্তে মাথা নত করে দিত। লালনের গান হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত হানে সেই রকম কি অন্য কোনো বাংলার বিখ্যাত কবির গান এক শতাংশ আঘাত দিতে পারবে?

ইমাম সারখাসির রচিত কেতাব *বাহারোরায়েক*-এ বলা হয়েছে যে, বিবাহ, বিদেশ হতে ঘরে আসার সময় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশায় অবশ্যই সঙ্গীত জায়েজ।

খাজানা এবং *কাফি* নামক দুইটি কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'অসৎ উদ্দেশ্যে সঙ্গীতকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (অবশ্য অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য অনেক ভাল কাজও হারামে পরিণত হয় এবং হারাম বলে ফতোয়া দেওয়া হয়ে থাকে)। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং বিবাহ উৎসবে, জেহাদে উৎসাহ দিতে গিয়ে, এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় হানাফি মাজহাব অনুসারে কখনোই হারাম হবে না।'

ফতোয়ায়ে আলমগীর নামক কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের দুই শত একুশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফকে দফ বাজানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বিবাহ উৎসবে মেয়েরা অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া নিজেদের সন্তানদের জন্য দফ বাজানোকে আপনি কি মকরুহ মনে করেন?' ইমাম সাহেব বললেন, 'না, আমি এটাকে কখনো মকরুহ মনে করি না।'

মহিত সরখসি এবং *খাজানাতোল মুফতীন* নামক কেতাব দুইটিতে এই বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে, 'ঈদের দিন দফ্ বাজনাতে কোনই ক্ষতি নাই।'

সিয়ারুল আখতাব নামক বিখ্যাত কেতাবের তেপান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত মামসাদ উলুবের দায়নুরী (র.) সঙ্গীত শুনতেন এবং তরিকতের পীরে কামেলদের ওরশ মোবারক পালন করতেন। প্রত্যেক ওরশ শরিফে তিনি সঙ্গীতের আয়োজন করতেন এবং নিজে সঙ্গীত শুনতেন দেখে একজন লোক প্রশ্ন করেছিল, আপনি যে সঙ্গীত শোনেন, এতে যদি কোনো প্রকার মারেফতি রহস্য থেকে থাকে তবে খুলে বলুন। ইহাতে হজরত বললেন যে, 'সঙ্গীতের ভেতর যে রহস্য লুকিয়ে থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি কেবল মহানবী ও মাওলা আলীর এবং আমাদের মাননীয় অলীয়ে কামেলেরা যে সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন উহারই সুন্নত পালন করেছি।'

সিয়ারুল আখতাব নামক কেতাবের সাতান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত খাজা আবু ইসহাক সামি চিশতি অতিরিক্ত সঙ্গীত শুনতেন। তিনি বলতেন, সঙ্গীত হৃদয়কে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে তোলে এবং আপন রবের রহস্যের রূপ ধরা দিতে থাকে। কারণ সঙ্গীত হৃদয়কে কোমলতার দিকে এত দ্রুত এগিয়ে নেয় যে, 'আমার, আমার' এবং 'আমি, আমি'-র স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে থাকে।

একই কেতাবের সাতষট্টি পৃষ্ঠায় হজরত শেখ আবু আহমদ বলেছেন, 'সঙ্গীতের মাঝে এমন গোপনীয় রহস্য লুকিয়ে থাকে যা সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না। হাল্কাভাবেই সাধারণ লোকেরা সঙ্গীতকে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ লোকেরা সঙ্গীতের গভীরে প্রায়ই যেতে পারে না, যার দরুণ সঙ্গীত শ্রবণে একজনকে কাঁদতে দেখা যায়, আবার আর একজনকে হাসতে দেখা যায়। সঙ্গীতের নেয়ামত এমনই একটি বড় নেয়ামত যে সমঝদারের কাছে এর চেয়ে প্রিয় নেয়ামত আর কী হতে পারে?' ঐ একই কেতাবের একাশি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত খাজা মউদুদ চিশতি প্রায় সময়ই সঙ্গীত শ্রবণে বিভোর থাকতেন। তাঁর সঙ্গীতের মাহফিলে বহু আলেমদের আগমন হত। তিনি সঙ্গীত শ্রবণে মাঝে মাঝে শিশুর মত কাঁদতে থাকতেন এবং তাঁর করুণ কান্নায় মজলিসের অনেকেই কাঁদতো। আবার তিনি সঙ্গীত শ্রবণে কখনো হাসতে থাকতেন। তিনি তাঁর মুরিদানদের বলতেন, 'সঙ্গীতের সুরে পূর্ণভাবে ডুবে যাবার পর আশেক তার "আমি, আমি" ভাবের লেবাসটি ফেলে দিয়ে মাশুকের লেবাস পরিধান করে মাশুকের মধ্যে ডুবে যান।'

'আমি, আমি', 'আমার, আমার' এই আমিত্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি আছে এবং এই এক একটি আমিত্বের রূপ এক এক রকম প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। আমিত্ব যাহা ধারণ করে উহাই ধর্ম। সুতরাং বহু মানুষের বহু আমিত্ব এবং বহু আমিত্ব ধারণ করে আছে বহু ধর্ম। এই বহু ধর্মগুলোকে ত্যাগ করে, বর্জন করে, একমাত্র আত্মসমর্পণের ধর্মে তথা আল্লাহ্র একমাত্র ধর্ম ইসলামে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত কোনো ধর্মই বাতিল হয় না এবং হবার প্রশ্নই উঠে না এ জন্য যে, তিনি আদম হতে মহানবী পর্যন্ত মাত্র একটি ধর্মই পাঠিয়েছেন আর সেই ধর্মটির নাম হল আত্মসমর্পণের ধর্ম তথা ইসলাম ধর্ম। মানুষের 'আমি, আমি'

ভাবটির দ্বারা যে মানুষ অগণিত ধর্ম রচনা করে, করছে এবং করবে কেবল এগুলোই বাতিল হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তাই তো অধ্যাত্মবাদের গুরুদেব হজরত বাবা লালন ফকির সবচাইতে বেদনাদায়ক, সবচাইতে হৃদয়ে ধাক্কা দেয় যে কথাটি, সেই কথাটি বলে গেলেন, 'লালন তো লালনকেই চিনতে পারলো না, লালন মরে জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা।' লালনের এই কথা কয়টি সূরা কালামের একটি আয়াতকেই যেন কেন্দ্র করে বলা হয়েছে, *নাহ্নু আক্‌রাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ।*

সঙ্গীতের মর্যাদা এবং মূল্যায়ন যে কত উঁচুতে স্থান লাভ করেছে *সিয়ারুল আখতাব* নামক কেতাবটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায়। এই কেতাবটির অনুবাদ যদি করা হত তাহলে সঙ্গীতের উপর যা-তা মন্তব্য করতেন না। আসলে সঙ্গীত বিষয়টির উপর বহু মুল্যবান কেতাব আছে যেগুলোর বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন ছিল।

অতি সাধারণ মুসলমান বলেও যার বদনাম আছে, অথবা যাকে শুনে মুসলমান বলে অপবাদ দেওয়া হয়, অথবা বাপদাদা মুসলমান ছিল বলে তাকেও বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে মুসলমান বলে পরিচিতি লাভ করতে হয়েছে, সে রকম মুসলমানটিও বেশ ভাল করেই জানে যে, মহানবীর পবিত্র দাঁত কোন একটি যুদ্ধে শহিদ হয়েছিল এবং এই পবিত্র দাঁতের জন্য কয়েক শত মাইল দূরে বসবাস করা মহানবীর একজন আশেক তথা প্রেমিক পাথরের আঘাতে আঘাতে সব কটি দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। সত্যি, শুনতেই অবাক লাগে, মন ভয়ে শিউরে উঠে যে একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া দাঁত তুলতে হলে অবশ করে তারপর তুলতে হয়, আর তরতাজা পুরো বত্রিশটি দাঁত তুলে ফেলা কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কত বড় আশিক হতে পারলে এ রকম সুন্নতটি পালন করতে পারেন? ভোজন পর্ব শেষ করে মিষ্টি খাওয়াও মহানবীর একটি সুন্নত। গায়ে খস্‌বু লাগানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও একটি সুন্নত, কিন্তু এ রকম ভয়াবহ সুন্নত মাত্র একজন আশিকই পালন করেছেন। যিনি এ রকম ভয়াবহ সুন্নতটি পালন করেছিলেন তাঁর মহানবীকে জাহেরী সুরতে দেখার সৌভাগ্যটি হয়নি এবং যতদূর মনে হয়, দাঁত ভাঙার সময় সেই প্রেমিকের বাতুনি চোখটি খোলা ছিল না (?) তথা আমরা যাকে কাশ্‌ফ খোলা বলি সেটা ছিল না। কারণ মারেফতি চোখ খোলা থাকলে তিনি কেবল একটি দাঁতই ভাঙতেন, এতোগুলো দাঁত ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। অথবা বাতুনি চোখ খোলা অবশ্যই ছিল, কারণ মারেফতের রহস্যকে ঢাকার আদেশ পেয়েছিলেন বলে। কারণ, নবী এবং অলীরা আল্লাহ্‌র রহস্যময় জুব্বার ভেতর থাকেন, তাই তাঁদের কেবল আল্লাহ্ পাক এবং তাঁরা তদ্রূপ আল্লাহ্‌কে চেনেন। আর কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। যেমন এই পৃথিবীতে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ সরল একটি হল, সিংহই জানে এবং বুঝে যে একটি বাঘের শরীরে কতটুকু শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু একটা ইঁদুর কি তা জানতে এবং বুঝতে পারে? অসম্ভব। এখন বলতে হবে যে, দাঁতগুলো ভাঙতে গিয়ে সেই আশিকের অনেক রক্ত মাটিতে ঝরেছিল। সেই আশিক থাকতেন করন প্রদেশে। নাম তাঁর ওয়ায়েস করনি। মজ্জুব বলেই তিনি করন প্রদেশে সুপরিচিত ছিলেন। মহানবীকে যাঁর দেখার ভাগ্য হয়নি এবং শত শত মাইল দূর হতে এবং সেদিনের পথ ঘাটের অবস্থা অনুযায়ী বেশ কিছুদিন পর মহানবীর পবিত্র দাঁত শহিদ হবার কথাটি লোকমুখে শুনেছিলেন। মহানবীর শেষ কয়টি আদেশের মধ্যে এটিও একটি আদেশ ছিল যে, তাঁর পবিত্র শরীরের ব্যবহার করা জামাটি ওয়ায়েস করনিকে উপহার দিতে। যিনি মহানবীর পবিত্র শরীরের জামা পাবার যোগ্যতা বহন করেন তিনি নিশ্চয়ই জান্নাতি। এই কথা না বললেও সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারেন ওয়ায়েস করনির মর্যাদা কত উঁচুতে। যেমন হাতের আঙ্গুল কারো আয়না দিয়ে দেখতে হয় না, ইহা তেমনি পরিষ্কার বুঝা যায়। কারণ, জান্নাত হতেও কি মহানবীর পবিত্র শরীরের পবিত্র জামা উপহার পাওয়া অনেক বেশি দামি নয়?

পাক পাঞ্জাতন সম্পর্কে আলোচনা

এখন বলতে চাই যে, মহানবীর বংশ দেখতে চাইলেন আল্লাহ্। তাই ফেরেস্তা জিবরিলকে পাঠানো হল এবং *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফ*-এর ঐকমত্যেও এই ঘটনাটির উল্লেখ দেখতে পাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মহানবী একটি কম্বলে চারজনকে একসঙ্গে তাঁর পবিত্র শরীরের সঙ্গে একত্র করে ঢেকে দিয়ে আল্লাহ্‌কে বললেন যে, এই হল আমার বংশ। এখন প্রশ্ন হল, মহানবীর সেই কম্বলে ঢাকা চারজন কারা ছিলেন? তাঁদের নাম কী কী? কারণ, এটা খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার, তাই সবারই প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার কথা যে, এই চারজন মহাভাগ্যবান তবে কারা? কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক জিবরিল ফেরেস্তাকে পাঠিয়েছেন। এই চারজনের নাম এক এক করে বলছি : আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসায়েন। মহানবীর বংশ বলতে এই চারজনকেই মহানবী ঘোষণা করলেন এবং ইহাও আমাদের বেশ ভাল করে একদম নিরপেক্ষভাবে জেনে রাখা অবশ্য কর্তব্য বলে সব সময় মনে করতে হবে যে, বাকি যারা ছিলেন তারা যত বড় এবং যত মহান এবং যত মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাই হোন না কেন, তারা মহানবীর বংশের কেউ নন। এই বিষয়টি একটি মারাত্মক গবেষণার বিষয়। মহানবীর সাহাবাদের প্রচুর মর্যাদা আছে এবং সেই মর্যাদার হাদিসও বুখারী এবং অন্যান্য হাদিস শরিফে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মহানবীর বংশের আরো অনেকে থাকা সত্ত্বেও কেন মহানবী এই চারজনকেই সেদিন জিবরিলের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন? এই রহস্য যিনি বুঝতে পারেন নি তিনি মারেফতের গোপন কথার কাঁচকলাটিও বুঝতে পারেন নি। মহানবী এবং এই চারজনকে মিলে হল পাঁচজন। ইহাই পাক পাঞ্জাতন। রূহানি এলেম, তথা যে এলেম সিনা হতে সিনাতে প্রবেশ করানো হয়, সেই এলেমের দাতা হলেন এই পাঁচজন। 'আমরা আপনাকে দান করেছি একমাত্র কাওসার'–কোরানের এই ঘোষণাটির প্রকাশ্য রূপ হলো এই পাক পাঞ্জাতন।

যে চারজনের নাম মহানবী তার বংশ বলে আল্লাহ্‌কে জানালেন সেই চারজনের মধ্যে শেষজনের নাম হল ইমাম হোসায়েন, যিনি কারবালার মাঠে পরিবার পরিজন নিয়ে শাহাদত বরণ করেন।

মহানবী যে ইমাম হোসায়েনকে কতটুকু ভালবাসতেন তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। রীতিমত চমকে যেতে হয় সেই সব ঘটনাগুলো যখন মানুষ জানতে পারে। তার মধ্যে একটি হল যে, মহানবী জীবনে একটিবারের তরেও ইমাম হোসায়েনকে নাতি বলে সম্বোধন করেন নি। মেয়ের ঘরের ছেলে অথচ একটিবারও তিনি নাতি বলে ডাকেন নি। এই কথা শুনে কে না অবাক হবেন যে, ইমাম হোসায়েনকে মহানবী সব সময় 'আমার ছেলে' বলে ডেকেছেন। আর একটি অবাক বিষয় হল যে, মহানবী প্রায়ই বলতেন, *'হোসায়েন মিন্নি ওয়ানা মিনাল হোসায়েন,'* অর্থাৎ হোসায়েন আমা হতে এবং আমি হোসায়েন হতে। যদি কেউ প্রশ্ন করে মহানবী হতে হোসায়েন এটা বোঝা সহজ, কিন্তু হোসায়েন হতে মহানবী এটা বোঝা তো বেজায় কঠিন। হ্যাঁ, কঠিনই বটে। এ রকম অনেক কঠিন কথাই বলেছেন মহানবী।

যখন ইমাম হোসেন জন্মগ্রহণ করলেন, মহানবী মা ফাতেমার ঘরে প্রবেশ করে সদ্যোজাত শিশু হোসেনকে কোলে তুলে নিলেন। মহানবী তাঁর পবিত্র জিহ্বা মোবারক শিশু হোসেনের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন এবং শিশু হোসেন সর্বপ্রথম মহানবীর জিহ্বা মোবারকের লালা পান করতে লাগলেন। এমন সময় জিবরিল ফেরেস্তার আগমন হল এবং তিনি মহানবীকে বললেন যে, 'আল্লাহ্‌র রহমত এবং শুভ সংবাদ দিন তাকে এবং আলী ও ফাতেমাকে –এ জন্য যে, তাঁর নাম হোসায়েন এবং জান্নাতেও এই নামেই তিনি পরিচিত।' মহানবী বললেন, 'যদি এই শিশু হোসায়েনই আমাদের জন্য শুভ সংবাদ হয়ে থাকে তাহলে উহা কী রকম?' জিবরিল ফেরেস্তা বললেন, 'এই শিশুই একদিন কারবালার মাঠে তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে শহিদ হবেন এবং সেই সময়টি হবে একটি বিরাট পরীক্ষার সময়।'

হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, 'মহানবীর চেহারা মোবারকের সঙ্গে হুবহু মিল হল হোসায়েনের চেহারা মোবারক, এমন কি শরীরের সঙ্গেও।'

মহানবীর একটি অবাক করে দেওয়া আচরণ প্রায় সাহাবাদের মনে ছবির মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে থাকতো। কারণ, এ রকম কথা মহানবী বলতে পারেন! সেদিনের একটি ঈদের জামাতের আগের ঘটনাটি কেমন করে ভোলা যায়? যে কোনো অসাধারণ ঘটনা বা কথা মানুষের মনে অসাধারণ ভাবেই দাগ কাটে। আর মহানবীর প্রশ্নে তো আরো বেশি অবাক হবারই কথা। কারণ, কোরান পাক হতে আমরা জানতে পাই যে তিনি জীবনেও একটি কথা নিজের প্রবৃত্তি হতে বলেন নি।

একদিন সকালে মহানবী ঈদের নামাজের জন্য যাচ্ছেন। মদিনার সাহাবারা দেখতে পেলেন যে, মহানবীর পবিত্র কাঁধের উপর হাসান এবং হোসায়েন। আরো দেখতে পেলেন যে, মহানবীর খালি মাথার কেশ দুভাগে ভাগ করে সেই চুলের মুঠো ধরেছেন হাসান এবং হোসায়েন। মহানবী উট চলার ভঙ্গিতে ঈদের মাঠের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন। আল্লাহ্‌র নবীর পক্ষে এ রকম অসম্ভব ধরনের ব্যবহার দেখে সাহাবারা অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে দেখছেন। সাহাবাদের মধ্য হতে একজন হাসান এবং হোসায়েনকে লক্ষ করে বললেন, 'কী অপূর্ব সোয়ারী আপনারা পেয়েছেন!' এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী সেই সাহাবার সামনে এসে বললেন, 'কেন এই কথা বলছো না যে, কী অপূর্ব দুজন সোয়ার?' এ রকমভাবে বহুবার হাসান এবং হোসায়েনকে মহানবীর কাঁধে বহন করে নেবার দৃশ্য সাহাবারা দেখেছেন। আরো একটি ঘটনার কথা বলছি। একদিন মহানবী মদিনার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোৎবা দিচ্ছেন, এমন সময় বালক ইমাম হোসায়েন মসজিদে প্রবেশ করে মহানবীর দিকে অগ্রসর হতেই জামার অংশ পায়ের নিচে পড়তেই মহানবী সঙ্গে সঙ্গে খোৎবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে ইমাম হোসায়েনের সামনে গেলেন যাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যান।

আর একটি ঘটনা হয়তো অনেকেরই জানা থাকার কথা তবু উল্লেখ করলাম। একদিন মহানবী মসজিদে নামাজ পড়ছেন এবং যখন তিনি সেজদায় গিয়েছেন ইমাম হোসায়েন মহানবীর পিঠে উঠে বসলেন এবং যতক্ষণ ইমাম হোসায়েন পিঠে বসে ছিলেন ততক্ষণ মহানবী সেজদায় ছিলেন। হজরত সালমান ফারসি (রা.) বলেছেন যে, মহানবীর পাশে হোসায়েন বসে আছেন এবং হোসায়েনকে লক্ষ করে আমাদেরকে বলছেন 'তিনি সৈয়দ, তিনিই সৈয়দের পুত্র, তিনিই সৈয়দের পিতা। তিনিই ইমাম, তিনিই ইমামের পুত্র, তিনিই ইমামদের পিতা।'

মহানবী বলেছেন, 'আসমান এবং জমিনের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিটিকে যদি দেখতে চাও তাহলে দেখে নাও হোসায়েনকে।'

হুজায়েফ ইবনে ইয়ামানি (রা.) বলেছেন যে, আমি দেখলাম মহানবী হোসায়েনের হাত ধরে আমাদেরকে লক্ষ করে বলছেন যে, 'তোমরা জেনে নাও যে, আলী এবং ফাতেমার পুত্র এই হোসায়েন–যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি–সে (হোসায়েন) জান্নাতিদের একজন, তার প্রেমিকেরা হবে (সেই) জান্নাতের সাথী।'

মহানবী বলেছেন, হাসান এবং হোসায়েন হল জান্নাতের দুই যুবক, হাসান এবং হোসায়েন হল জান্নাতের দুই সরদার, দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় (যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক না কেন)।

মহানবীর এই হাদিসগুলো সাহাবাদের মধ্যে এতই পরিচিত এবং প্রচলিত হয়েছিল যে উমাইয়া বংশের রাজত্বকালেও পৃথিবীর বুক হতে মুছে দিতে পারেনি। কারণ, অপ্রিয় এবং দুঃখজনক হলেও ইহা অতি সত্য কথা যে, মহানবীর হাদিস সংগ্রহের উদ্যোগেই নেওয়া হল উমাইয়া রাজত্বের সময়। পৃথিবীর প্রায় মুসলমানদের শরীর এখনো ভয়ে শিহরিয়ে উঠে যখন ইতিহাসের পাতায় দেখতে পায় যে মহানবীর বংশের উপর অভিশাপ দেওয়া হতো এবং জুম্মার নামাজের খোৎবাতে সেই অভিশাপ বর্ষণ করা হতো উমাইয়াদের রাজত্বকালে।

কেবলমাত্র উমর ইবনুল আজিজের রাজত্বকালে এই অভিশাপ দেবার প্রথাকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর আবার নবীবংশের উপর অভিশাপ দেওয়া শুরু হয়ে যায়। উমাইয়ারা বিবেকের গলায় কেমন করে ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে দিতে পারে তার জঘন্যতম অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই অভিশাপ দেওয়াও ছিল একটি দৃষ্টান্ত। হজরত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে মাওলা আলীর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় সর্বসময় গালাগালি দিয়ে এসেছেন। এই গালাগালি এতই জঘন্য প্রকৃতির ছিল যে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদুদী সাহেবও সহ্য করতে না পেরে হজরত মুয়াবিয়ার (রা.) বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। কতটুকু সৎসাহস থাকতে পারলে হজরত মুয়াবিয়ার (রা.) বিরুদ্ধে এ রকম কথা লিখতে পারেন। আর আমি অধম লেখক নিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড লাগিয়েও লিখতে সাহস পেলাম না। অন্তত এই একটি বিষয়ের জন্য আমি মাওলানা মওদুদী সাহেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না এবং আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, এর জন্য আমার বন্ধু মহল এবং অনেক পাঠকের গালাগালি শুনতে হবে।

মহানবীর উপর মাওলা আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসায়েনের বর্ণিত কয়টি হাদিস আমরা আজ পর্যন্ত পেয়েছি? যারা ছিলেন মহানবীর অতি কাছের এবং যাদের কাছে অনেক মহামূল্যবান হাদিস পাবো বলে সবাই আশা করেছে তাদের মুখ বন্ধ কেন? তারা কেন বোবার ভূমিকা পালন করলেন? না–উমাইয়া রাজত্বকালে প্রাণের ভয়ে বোবা থাকতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, উমাইয়া আমলে নুন হতে একটু চুন খসলেই গুপ্তহত্যা বিষপ্রয়োগ ইত্যাদি পান্তা ভাতের মত ছিল। মারোয়ান নামক জারজ সন্তানটির মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু হজরত উসমানের (রা.) অনুরোধে মহানবী মৃত্যুদণ্ড হতে এই বলে মুক্তি দিলেন যে, সে যেন তাঁর (মহানবীর) চোখের সামনে না আসে। জারজ মারোয়ান ছিল মানুষের চামড়ায় ঢাকা পশু শিয়াল পণ্ডিত। মারোয়ান নামক পশু শিয়াল পণ্ডিতের ঘরে যারা মানুষের চামড়ায় ঢাকা জাহান্নামের জাক্কুম গাছের ফল কতগুলো পশু শিয়ালের (ব্যতিক্রম মাত্র হাতে গোনা) জন্ম হয়েছিল সেই পশুগুলোর রাজত্বকালকেই বলা হয় উমাইয়াদের ক্ষমতার শাসন। পশুর চামড়ায় ঢাকা জাহান্নামের জাক্কুম গাছের ফলগুলোর কাছে কী আশা করা যায়? কী আশা করতে পারেন? শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দিয়ে কী আশা করা যায়? কী আশা করতে পারেন? খাসির মাথা সামনে রেখে কুকুরের মাংস বিক্রি করতে বিবেকে এক বিন্দু আঘাত লাগে না যাদের, তাদের কাছে কী আশা করেন?

মাওলা আলীর বিনয়ভাষণ ছিল অপূর্ব এবং বিস্ময়কর। যেমন, তিনি তাঁর খিলাফতের সময় এক জনসভায় বলেছিলেন যে, হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর এই দুইজন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ইমাম জাহাবি এবং ইমাম বোখারি বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, মাওলা আলী বলেছেন যে, মহানবীর পরে সকল মানুষের মধ্যে হজরত আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তারপর হজরত উমর এবং তারপর আর একজন। মাওলা আলীর এই কথা শুনে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কি আপনি? মাওলা আলী জবাব দিলেন, আমি তো একজন সাধারণ মুসলমান।

অপরদিকে হজরত উমরের বিনয় ভাষণটিও মনে রাখার মত। কারণ খিলাফতের আমলে হজরত উমর যে কোনো ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে মাওলা আলীর নিকট উপদেশ চাইতেন এবং এই উপদেশ চাইবার একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত বা নমুনা আমরা হজরত উমরের বর্ণিত একটি হুবহু বাক্য তুলে ধরলাম, 'লাওলা *আলীইন লাহালা কাল উমর*' অর্থাৎ 'আলী না থাকলে অবশ্যই উমর ধ্বংস হয়ে যেত।'

আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি, মহানবী ইমাম হোসেনকে কতটুকু ভালবাসতেন এবং কত সুন্দর সুন্দর বাণী ইমাম হোসেনের উপর রেখে গেছেন।

পাক ভারতে যার উসিলাতে আমরা মুসলমান হয়েছি এবং যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা মানবীয় স্বকীয়তার ভিত্তি ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়ে হাজার বছর আগে প্রায় এক কোটি মানুষকে মুসলমান বানিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত খাজা বাবা গরিব নেওয়াজ হজরত ইমাম হোসেনের উপর অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন। ফারসি ভাষায় লিখিত খাজা বাবার বক্তব্যগুলো পড়লে কেবল অবাকই হতে হয় না বরং গবেষণার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। খাজা বাবার বক্তব্যগুলো এমন ধারালো যা পড়লে অনেক সময় বোবার মত চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন খাজা বাবা বলেন, 'জানে *মান নেসারাম্ বানামে হুসায়েন, মোনামে গোলামে গোলামানে হুসায়েন*। অর্থাৎ, 'আমাকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়ে দিয়েছি হুসায়েনের পদপ্রান্তে। আমি তো কেবলই গোলাম এবং তাঁরই কেবলমাত্র গোলাম, যিনি হুসায়েনের গোলাম।'

ওহাবিদের মূল আকিদাগুলোর কবর রচিত হয়েছে এই একটিমাত্র বাক্যে। তৌহিদের নামে, শের্ক-বেদাতের ধুয়া তুলে যারা বিভ্রান্তির কুয়াশা ছড়িয়ে দিচ্ছে আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীদের মধ্যে তারা অবশ্যই খাজা বাবার কথা মানা তো দূরে থাক, বড় পীর সাহেবকেই যা-তা বলতে দ্বিধা বোধ করে না।

খাজা বাবার মত বিশ্ববরেণ্য অলী নজিরবিহীন বিনয় দেখিয়ে গেছেন কেবলমাত্র ইমাম হোসেনের উপর এবং যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ তাঁর রওজা মোবারকে প্রবেশ করতে গেলেই আপনার চোখে পড়বে, যদি ফারসি ভাষার উপর আপনার কিছুটা দখল থেকে থাকে। খাজা বাবা এমন সাংঘাতিক কথাও বলে গেছেন যার আসল অর্থ অনেক আলেমেরা লুকিয়ে যান। কারণ অধম লেখকের মত লক্ষ আরবি জানা আলেম বলে পরিচিতদের খাজা বাবার সামনে একটি কানা পয়সার মত দাম আছে বললে অনেক বেশি দেওয়া হয়। অবশ্য ইহা আমার ব্যক্তিগত কথা। কারণ, ঘাড়মোগড়া, ঠেটা এবং জাননেওয়ালা আলেমদের (?) রং-রূপ সাধারণ মুসলমানেরা অনেক দেখেছেন। খাজা

বাবার সেই সাংঘাতিক কথাগুলোর মধ্যে মাত্র কয়টি তুলে ধরলাম, 'ইসলামই হুসায়েন, মুক্তিদাতাই হুসায়েন, সত্য বলতে কি, ইসলামের মূল ভিত্তিই হুসায়েন।' আবার বলেছেন, 'বোকারা বুঝতে পারে না, ইমাম হোসেন পানির পিপাসায় এবং অসহায়ের মত শাহাদত বরণ করেননি বরং তিনি আসল-নকলের ভাগটি পরিষ্কার করে দেখিয়ে গেলেন। ইমাম হোসেনের ঘোড়া জুলজিনার পদধুলি বলতেও লজ্জা হয়, অথচ আমি যদি সেই কারবালার মাঠে একটি আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিতাম তবে সঙ্গে সঙ্গে পানির নহর বয়ে যেত, আর খাজা যে ইমাম হোসেনের গোলামের গোলাম সেই ইমাম হোসেনের রহস্য এখনো বুঝতে পারে না?'

ইমাম হোসেন (আ.)-এর শেষ ভাষণ প্রসঙ্গে

কারবালার মাঠে একে একে যখন সবাই শাহাদাত বরণ করেছেন এবং হজরত ইমাম হোসেন যখন কেবল একা দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তাঁর শেষ কয়টি কথার কিছু অংশ অনুবাদ করলাম :

'কেন আমাকে হত্যা করতে চাও? আমি কি কোনো পাপ অথবা অপরাধ করেছি?' এজিদের সৈন্যবাহিনী বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলো। পুনরায় ইমাম হোসেন বললেন, 'আমাকে হত্যা করলে আল্লাহ্‌র কাছে কী জবাব দেবে? কী জবাব দেবে বিচার দিবসে মহানবীর কাছে?'

এজিদের সৈন্যবাহিনী পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আবার ইমাম হোসেন বলেন, *'হাল্ মিন্ নাস্‌রিন ইয়ান্‌সুরুনা?'* 'আমাদের সাহায্য করার মত কি তোমাদের মধ্যে একজনও নেই?'

তারপরের আহ্বানটি সাংঘাতিক মারাত্মক। ঐতিহাসিকদের মতে এটাই ইমাম হোসেনের শেষ আহ্বান।

'আলাম্ *তাস্‌মাও? আলাইসা ফিকুম্ মুসলিমু?*

'আমার কথা কি শুনতে পাও না? তোমাদের মাঝে কি মাত্র একটি মুসলমানও নেই?'

ইমাম হোসেনের এই শেষ ভাষণটি মাত্র একটি ছোট্ট বাক্য। অথচ এর ব্যাখ্যা যদি কাঁচ ভাঙার মত টুকরো টুকরো করে দেখাতে চাই তাহলে সেই বাক্যটি হবে খুবই বেদনাদায়ক। তাই বেশি কথা না বলে শেষ বাক্যটির সামান্য ব্যাখ্যা দিয়েই শেষ করতে চাই। খাজা বাবা যেমন বলেছেন, 'ইমাম হোসেন আসল এবং নকলের ভাগটি পরিষ্কার করে দেখিয়ে গেলেন', সে রকমই অর্থ বহন করছে ইমাম হোসেনের শেষ ভাষণটিতে। কারণ, এজিদের সৈন্যবাহিনীতে একজন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মের কেউ ছিল না। সবাই ছিল মুসলমান। অথচ কী সাংঘাতিক এবং ভয়ঙ্কর ভাষণ–'তোমাদের মাঝে কি একটি মুসলমানও নেই?' এজিদের সৈন্যবাহিনীর সবাই মুসলমান, এটা অধম লেখকের কথা নয় বরং যে কোন বিজ্ঞ আলেমকে প্রশ্ন করে দেখুন। অথচ ইমাম হোসেন এ কী তাক লাগানো কথা বলছেন, 'তোমাদের মাঝে কি মাত্র একটি মুসলমানও নেই?' না, একটিও সত্যিকার আসল মুসলমান ছিল না বলেই ইমাম হোসেন এই আহ্বান জানিয়ে পৃথিবীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই নকল মুসলমান। বাজারের চালু আসল মালকে যেমন হুবহু নকল করে জনতাকে ধোঁকা দেয় সে রকম এরা নকল মুসলমান হয়ে সরল জনতাকে ধোঁকা দিয়ে যায় এবং এই ধোঁকার ফাঁদে অনেক বিজ্ঞজনও মনের অজান্তে পা-খানা বাড়িয়ে দেন। বাজারে গিয়ে অনেক বিজ্ঞজনও নকল মাল কেনার ফাঁদে পড়ে যান, সে রকম অবস্থার শিকারও বলতে পারেন। আসল আর নকল চেনবার বিদ্যা রপ্ত করতে হয়, যদিও বিদ্যার প্রশ্নে তা সামান্য। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সবচাইতে বড় অধ্যাপককে জায়গাজমি কেনার দলিল লিখতে বললে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন, অথচ সেই দলিল লিখছে নবম কিংবা তার নিচের শ্রেণীতে পাঠ করা দলিল-লেখক। তাই আসল আর নকলকে চিনতে হলে একটা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রে। তবে সবার জন্য অবশ্যই নয়।

এখন মূল বিষয়টির দিকে আমরা ফিরে আসছি। সেই মূল বিষয়টি হল, হজরত ওয়ায়েস করনি কিন্তু মহানবীকে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা তো দূরে থাক জীবনে একবার জাহেরি চোখে দেখার ভাগ্যও হয়নি। তাই তাঁকে সাহাবার খেতাব হতে বাদ দেওয়া হয়, অথচ কোন কারণ নেই, কোন যুক্তি নেই, কোন প্রশ্ন আর সংশয়ের দোলা নেই, কেবলমাত্র মহানবীর প্রতি ভালবাসার দরুন তিনি একে একে সব কটি দাঁত পাথরের আঘাতে ভেঙে ফেললেন। কেন ভাঙলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। কারণ যুক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কিন্তু ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এবং এর ব্যাখ্যা নেই। হজরত ওয়ায়েস করনির মনপ্রাণ জুড়ে মহানবীর প্রতি কতটুকু ভালবাসা থাকলে দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরাতে পারেন। হয়তো যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে এই ভালবাসার মূল্যায়ন কতটুকু তা বলতে পারবো না তবে এটুকু অন্তত বলতে চাই যে, ভালবাসাকে ভালবাসা দিয়েই মাপতে হয়। অনেকে হয়তো বলতে চাইবেন যে, এ রকম দাঁত ভেঙে ফেলার ভালবাসার কী মূল্য থাকতে পারে? এর উত্তর দিতে চাই না এ জন্যই যে, এ রকম প্রশ্ন তোলার কিছু মানুষ না থাকলে ভালবাসার রূপটি একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। বিচিত্রতার ঝাঁকুনি থাকে না। তাই মহানবী তাঁর নিজের জুব্বা মোবারক দিয়ে এই ভালবাসার মূল্যায়ন করেছেন। এখন আর একটি বিরাট প্রশ্ন তুলতে চাই যে, মহানবী যে ইমাম হোসেনকে কতটুকু ভালবাসতেন তার সামান্য নমুনা আগেই তুলে ধরেছি। তবু একটি কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মহানবী বলেছেন যে, বেহেস্তের দুইজন সরদার হলেন হাসান এবং হোসায়েন এবং তিনি অন্য আর একটি হাদিসে বলেছেন যে, হোসায়েনকে যারা ভালবাসে তারা হোসায়েনের সঙ্গে থাকবে তথা বেহেস্তে থাকবে। এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে তা হল, ইমাম হোসেনের কারবালার মাঠে সবচেয়ে বেদনাদায়ক শাহাদাত

বরণের শোকে ইমাম হোসেনের জন্য শোকের মাতম তুলে, বুক চাপড়িয়ে, ছোট ছোট চাকুর ছড়া দিয়ে পিঠে আঘাত করে 'হায় হোসেন', 'হায় হোসেন' বলে রক্ত ঝরায়, তাহলে ইমাম হোসেন এই ভালবাসার জন্য কি কিছুই দেবেন না? কারণ নিরেট ভালবাসা এবং এই ভালবাসার ব্যাখ্যা ও যুক্তি উভয়ই সম্পূর্ণরূপে বেকার। ইমাম হোসেনের ভালবাসায় কেউ মাতম না করলেও বলার কিছু থাকে না। কারণ এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া ভালবাসা তৈরি করা যায় না। আর যারা ইমাম হোসেনের ভালবাসায় মাতম করে, রক্ত ঝরায় তাদেরকেও বলার কিছুই থাকে না। কারণ, যুক্তি ও ব্যাখ্যার যেখানে কবর বা শেষ, ভালবাসা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়। এটা হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয় মাথা দিয়ে নয়। যুগে যুগে সব সময়ে এই মর্ত্যে একশ্রেণীর মানুষ বুঝে মাথা দিয়ে, আর একশ্রেণী বুঝে হৃদয় দিয়ে। কাউকেই তুচ্ছ করা যায় না। কারণ এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই সব কিছুর রহস্য লুকিয়ে আছে। কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না। তাই কাউকেই দোষারোপ না করে এটা যার যার তকদিরের লিখন বললেই সুন্দর মানায়।

বিশ্বাস ও প্রেম সম্পর্কে আলোচনা

যেখানে অবিশ্বাসের ভূমি সেখানেই বিশ্বাসের ফসল জন্মে। অবিশ্বাসের মাঠটা যদি পোড়া মাটিও হয়, কোন ফসল জন্মাতে পারে না বলে যদি কোন জাঁদরেল জাননেওয়ালা বলে, তবু বিশ্বাসের ফসল কী করলে জন্মাবে তার চলে অবিরাম গবেষণা। কেবল মানুষ নামক জাতটা বিশ্বাস নামক ফসলটার জন্ম দেবার গবেষণায় মেতে থাকবে। কারণ, অবিশ্বাস আছে বলেই তো বিশ্বাসের মোহর মারার ইচ্ছাটা থেকেছিল, থাকে এবং থাকবে। অবিশ্বাসের নাম যদি মা হয় তবে সেই মায়ের পেটের সন্তানটির নামই বিশ্বাস। কাকের বাসায় কোকিলের জন্ম। অসাধুর ঘরে সাধুর জন্ম। মূর্তিপূজারক আজরের ঔরশে ইব্রাহিম। পুঁজিবাদের পেটে সাম্যবাদ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির প্রেমে প্রশান্তির দ্যুতিদর্শন। ময়লা আবর্জনার পেটে জন্ম হয় অবাক করা সব বড় বড় গাছ-গাছড়া। অবিশ্বাস যেমন কাঁদাতে জানে তেমনি হাসাতেও পারে। অবিশ্বাসের জঞ্জালের মাঝে বিশ্বাসের এমন সব মণিমাণিক্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলেন যে, সবাই ধন্য ধন্য করতে বাধ্য হয়। শত বছর আগে যা ছিল অবিশ্বাস্য, গাঁজাখুরি গল্প, আজ সেটাই বিশ্বাস্য এবং বাস্তব বলে সবাই মেনে নিচ্ছে এবং মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অবিশ্বাসের গালে চড় মারতে মারতে যারা এগিয়ে যায় বিশ্বাসকে আবিষ্কার করতে, তারা বৈজ্ঞানিক, তারা সাধক–হোক না সেই সাধনের নিয়ম কানুনগুলো সমাজের কাছে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়। অবিশ্বাসের আর এক নাম সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা। এগুলো আছে বলেই অতীতে যা ছিল অসম্ভব, অবাস্তব, গাঁজাখুরি গল্প আজ তথা বর্তমানে সম্ভব, বাস্তব এবং সত্যকথা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সন্দেহই জন্ম দিতে পারে জিজ্ঞাসার উৎসাহ আর এই জিজ্ঞাসার উৎসাহকে বুকে নিয়ে মানুষ এগিয়ে যায় সত্যকে আবিষ্কার করতে। এই পরিশ্রম কোথাও ব্যর্থ হয়, কোথাও কিছুটা এগিয়ে যাবার পর থেমে যায়, কোথাও একটাকে সন্দেহ করে এগিয়ে গিয়ে যা পাবার কথা নয় সেই সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটা পেয়ে যায়, কোথাও আবার যেটা খোঁজে সেটাই পেয়ে যায়। আবার এই পাবার পরও সন্দেহ থেকেই যায়। আশ্চর্য এই সন্দেহের শরীরটা। সব সময় যেন গতিময় অত্যন্ত শক্তিশালী এই সন্দেহ। যেটা পেয়ে গেল সেটার ভেতরেও সন্দেহ থাকে বলেই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। পূর্ণতার প্রশ্নটি নির্ভর করে সন্দেহের উপর। যখন আর কোন সন্দেহ থাকে না অথবা থাকবে না তখনই উহা পূর্ণতা পেল বলে ঘোষণা করা যায়। কিন্তু এই কথাটি শুনে অবাক হবেন যে, কোন আবিষ্কৃত বিষয়টিকে সন্দেহ নামক পিপীলিকা ধীরে ধীরে টেনে আনছে উন্নতমানের দিকে এবং এভাবে চরম উন্নতমানের মধ্যে এনেও সন্দেহ বিদায় নেয় না বরং আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে এক সন্দেহ হাজার সন্দেহের চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি পাবার পরও সন্দেহ থেকেই যায়? তবে কি পেয়েও তৃপ্ত না হয়ে বরং সন্দেহের জ্বালা আরো বেশি জ্বলে উঠে? হ্যাঁ, তাই। এট অপ্রিয় হলেও অতি বাস্তব কথা। অর্থাৎ সন্দেহ লেগেই থাকে এবং থাকবেই। যদি বলেন, এই সন্দেহের শেষ কোথায়? অসীমের যেমন শেষ নেই, সন্দেহেরও সে রকম কোন শেষ বলে কিছু নেই? তবে কি সন্দেহ অসীম তথা কোন, পাড়-কূল নেই? মানুষের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কি সন্দেহ থেকেই যাবে? হ্যাঁ, থাকে এবং থেকেই যাবে বলে মনে হয়। আপনার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের সন্দেহটি কি মুছে যাবে, না মুছবে না? কারণ, আপনার ফেলে রাখা সন্দেহের বিষয়টি নিয়ে আর একটি মানুষ সত্যের দিকে দৌড়াতে থাকবে। অনেকটা রূপকের ভাষায় রিলে রেইসের মত। একজনের কাঠি বা মশাল নিয়ে আর একজনের দৌড়ানোর মত। সন্দেহের পেটে সত্যের জন্ম হয় না বলেই সন্দেহ থেমে যায় না। সন্দেহের পেটে সত্যের একটি সামান্য অণুর সন্ধান দিতে পারে বলেই সন্দেহ কোনদিনও থেমে থাকবে না। পূর্ণ সত্য কোনদিনও সন্দেহ দিতে পারে না। পারে বলে মেনে নেওয়াটা ডাঁহা মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা মাত্র। যারা মেনে নেয় তারা মিথ্যুক এবং প্রবঞ্চক। দার্শনিক ডেকার্তের দর্শনের বিষয়টি মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা মাত্র। আমাকে অনেক দুঃখ বুকে নিয়ে এই কথাটি ঘোষণা করতে হচ্ছে। কারণ, তাঁকে এবং তাঁর দর্শনের বইগুলো বড় আদরের সঙ্গে কাছে রাখতাম। সন্দেহ জন্ম দিতে পারে আর একটি সন্দেহ এবং এই দুইটি সন্দেহের মাঝখানে যা পাওয়া যায় তা সত্যের অণু এবং এই সত্যের অণুটি আসলেই সত্যের অণু কি না তাতেও থেকে যায় সন্দেহ। ধরে নিলাম সেটি সত্যের অণু, তাহলে কি সন্দেহ চলে যাবে? না, যাবে না। কারণ, সন্দেহ অসীম এবং অণুর অনুশীলনের ধাপগুলোও অসীম। সুতরাং সন্দেহ কোনদিনও পূর্ণ সত্য দিতে পারে না বলে মনে হয়। তাহলে পূর্ণ সত্য কেমন করে পাওয়া যায়? কেমন করে পূর্ণ সত্যের মধ্যে ডুব দেওয়া যায়? কিসের মাধ্যমে পূর্ণ সত্যকে বুঝা যায়? প্রেম দিয়ে পূর্ণ সত্যকে পাওয়া যায়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে একমাত্র প্রেমই ডুবিয়ে দিতে পারে।

সুতরাং প্রেমের পেটেই জন্ম হয় পূর্ণ সত্যের। হজরত ঈসা মসিহ তথা যিশুখ্রিস্ট হলেন পূর্ণ সত্য, তাই তিনি বিতরণ করেছেন প্রেম। কারণ, প্রেমই দিতে পারে একমাত্র পূর্ণ সত্যকে। শত আঘাতের মাঝেও, শত অত্যাচারের মাঝেও তিনি প্রেমকে ধরে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। প্রেমকে ধরে রাখতেই হবে, কারণ পূর্ণ সত্য যে একমাত্র প্রেমই দিতে পারে। তাই তিনি এমন কথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দাও। কারণ, পূর্ণ সত্যকে পাবার পরই এই আদেশটির রহস্য বুঝতে পারবে। তিনি সন্দেহকে অল্প বিশ্বাস বলেছেন। তাই তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে অল্প বিশ্বাস ফেলে দিয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী হবার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, পূর্ণ বিশ্বাসের আর এক নাম হল প্রেম এবং এই প্রেমই নিয়ে যেতে পারে পূর্ণ সত্যে। আর পূর্ণ সত্যই দিতে পারে পূর্ণ তৃপ্তি আর মহা আনন্দ। কারণ, একমাত্র প্রেমের কোন শুরুও নেই এবং শেষও নেই। প্রেম যেমন অসীম তেমনি পূর্ণ সত্যও অসীম। অসীমকে ধরা যায় অসীম দিয়েই। তা ছাড়া প্রেমের এমনই অসীম গুণ যে, মানুষের যতগুলো গুণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় যে গুণটি তার নামটি হল ‘ইচ্ছা', এবং সেই ‘ইচ্ছা' নামক গুণটিও একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই প্রেমকে ‘সেফাতে হুব্বি' অথবা ‘ইশ্‌ক'-ও বলা হয়। কারণ, মানুষের সবগুলো গুণই প্রেমের দাসত্ব করে এবং পূর্ণ প্রেমই মানুষের সকল গুণের অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে পারে। এ প্রেম পূর্ণ সত্যকে পাবার পথের সব রকম দেয়ালগুলোকে একে একে বিলুপ্ত করে দেয়। তখন প্রেমিক পূর্ণ সত্যের মধ্যে ডুবে যায় এবং পূর্ণ সত্যও প্রেমিকের মধ্যে ডুবে যায়।

আবার আমরা আগের কথায় ফিরে যাই। সন্দেহ যেখানে থাকে না অনুসন্ধানের প্রশ্নটিও সেখানে উঠে না। সন্দেহ নেই তাই জিজ্ঞাসাও নেই এবং যেহেতু জিজ্ঞাসাও নেই সেইহেতু গবেষণার অনুশীলনের কথাই আসতে পারে না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্দেহটি কোথায় নেই? কেবলমাত্র একটি স্থানেই সন্দেহ নেই বা থাকে না বা থাকার প্রশ্নও উঠতে পারে না, আর সেই স্থানটি হল, আমার দেহের ভেতর যে আমি আছি এতে কেউ কোনদিন সন্দেহ করে না। সুতরাং আমার দেহের ভেতর আমাকে আমি অনুসন্ধান করাটাকে একটা বাজে কাজে লিপ্ত থাকাই মনে করি। বাজে কাজ এ জন্যই যে এখানে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই অথচ অনুশীলন করার প্রশ্নটি সমাজে ‘গাধার খাটুনি' নামে বিদ্রূপ করা হয়। আমি তো আমার মধ্যেই আছি এবং এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, তাহলে আবার আমার মধ্যে আমাকে খুঁজতে যাব কোন দুঃখে? আমার মধ্যে আমাকে খোঁজার উপদেশটি তাহলে এক ধরনের পাগলামি (?)। আমার আমিকে খোঁজার উপদেশ যারা দেয় তাহলে তারা কি এক ধরনের পাগল(?) নাকি? কারণ, যেখানে সন্দেহই নেই সেখানে কেন খুঁজতে যাব? সুতরাং মানুষ তার চারপাশে যা দেখে, শুনে এবং অনুভব করে তাহাই কেবল খুঁজে এবং এই খোঁজার প্রশ্নটিকে একান্ত ন্যায়সঙ্গত মনে করে। মানুষ অন্য সব কিছুর উপর সন্দেহ এবং সন্ধানীর চোখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে ভালবাসে এবং এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটাকে জ্ঞান-অর্জনের নাম দিতে ভালবাসে। পৃথিবীতে বাস করা মানুষগুলো এ রকম জ্ঞান-অর্জনের গবেষণায় বিভোর থাকতে ভালবাসে। কারণ, এই রকম জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে একটা জাগতিক লাভ-লোকসানের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। এই জাগতিক স্বার্থটি সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রশ্নে বড়ই লোভনীয়। এই লোভটি কমবেশি প্রায় সবার মধ্যে আছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া মানুষের রিপুগুলো এ রকম লোভনীয় স্বার্থটির পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যায়। সুতরাং আমার মধ্যে আমি আছি, অথচ আবার আমাকে খুঁজতে যাব কেন? এ কী রকম পাগলামি কথা? যারা পাগল(?) তারাই এসব আজব কথার উপদেশ দেয়। সত্যিই, যারা এ রকম উপদেশ যুগে যুগে দিয়ে গেছে এবং এখনো দিচ্ছে তারা এই লোভনীয় মানব সমাজের বুকে অনেক তিরস্কারের পর পুরস্কারও পেয়েছেন। পুরস্কার সবাই কমবেশি অবশ্যই পেয়েছেন এবং পূজনীয় রূপেও গৃহীত হয়েছেন। কিন্তু বহু তিরস্কারের ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। আত্মার বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেককে অনেক রকম কঠিন শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি এই লোভনীয় মানব সমাজ। কারণ, তাদের উপদেশটি ছিল, তোমার মাঝে যে তুমিটি আছে সেই তুমিটি কে? কী তার পরিচয়? তাকে চিনতে চেষ্টা কর। তাকে যদি চিনতে পার তবে পূর্ণ সত্যটিও চিনতে পারবে। তাকে চিনতে পারলেই পূর্ণ সত্য চেনা হয়ে গেল। সুতরাং মানুষ নিজের উপর কোন প্রকার সন্দেহ করে না বলেই খোঁজার প্রশ্নটিকে আমল দিতে চায় না। মানুষের যত রকম সন্দেহ এই আকাশ আর পৃথিবীতে। এই আকাশ আর পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর রহস্য মানুষকে কত রকম সন্দেহের প্রশ্ন তুলে চঞ্চল করে তোলে। গবেষণার পর গবেষণা চলতে থাকে। এরই মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে এবং এই গবেষণার প্রশ্নে মৃত্যুকে কিছুই মনে করে না। মনে করে জন্মিলে মরতে হবেই। ব্যাস! নিজের বেলায় এটুকু চিন্তাই যথেষ্ট। আকাশ আর পৃথিবীর গবেষণা নিয়েই যদি বিভোর থাকতো, এবং এই রহস্যের মহাসাগর হতে গবেষণার নূতন নূতন ফলগুলো মানুষের জাগতিক কল্যাণের তরে কাজে লাগতো, তাহলেও তেমন কিছু না হয় বলার থাকতো না। কিন্তু ইহাই আবার মানব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন প্রকার বিভীষিকাময় অভিশাপ। এক সঙ্গে মিলে মিশে ভোগ করার প্রশ্নে এরা তখন মানুষের সুরতে কুকুরের মত হিংসার ঘেউ ঘেউ, দাঁত খিচুনি আর তেড়ে মারতে আসার চরিত্রটি জাহির করে ফেলে। ফলে যারা অতি সাধারণ তাদের জীবন হয়ে পরে বিষময় এবং বেঁচে থাকার প্রশ্নে এদের হাতের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। বিংশশতাব্দীর এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও দাঁড়িয়ে দৈনিক খবরের কাগজগুলো পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে মানব সমাজ কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কোন মুহূর্তে এর পতন হবার সম্ভাবনাকে একদম অবহেলা কি করা যায়? অতএব সন্দেহ কেবল সন্দেহের অগণিত ঢেউগুলো উপহার দিতে পারে। তাই ইমাম কেবলাতাইনে, নবীশ্রেষ্ঠ মহানবী বলেন, ‘যে তার নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার রবকে চিনেছে।'

বিধান না দর্শন?

যারা মোটর গাড়িটাকে বিশ্রাম দেবার জন্য, রোদ-বৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য তৈরি করে ইটের ঘর, তাদের কাছে শোষিত বেকার যুবক, ঘর-নেই মানুষের রাস্তার ধারে ঝুঁপড়ি বানিয়ে শিশুসন্তানদের নিয়ে মন-কাঁদানো অবস্থায় জীবনটাকে খড়কুটা ধরে বাঁচার মত বেঁচে আছে–এদের কতটুকু দাম থাকতে পারে? কতটুকু নিম্নমানের পশুর চেয়েও নিম্নমানের হলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুদের সঙ্গেও তুলনা দেবার নিদর্শন নেই বলেই এরা 'আসফালুস সাফেলীন', অর্থাৎ উদাহরণ দেবার মত বিশেষণ-ছাড়া একদম নিউ মডেলের পশু। এই সম্পদ জমাকারীরা ধনের নেশায় ভয়ঙ্করভাবে নেশাগ্রস্ত। এই নেশার তুলনা নেই, এই নেশা হেরোইন আর প্যাথেডিনের মত মৃত্যুর নেশাকেও হার মানায়। হেরোইন আর প্যাথেডিন তো একটা যুবশক্তির মূলে আঘাত হানে, কিন্তু সম্পদ জমাকারীদের নেশা একটি দেশের অধিকাংশ মানুষের নিম্নতম মানবিক শক্তির উপরই কেবল প্রচণ্ড আঘাত হানে না বরং সামান্যতম বিবেকের বিন্দুটিকে পায়ের তলায় পিষিয়ে মারছে, যখন দেখতে পাই প্রাণহীন লৌহের তৈরি মোটর গাড়িটা থাকে ইটের তৈরি দালানে আর আল্লাহ্পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষগুলো থাকে ফুটপাতের পাশে ঝুপড়িতে। হজরত ইমাম শাফী (র.) একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, 'পাক পাঞ্জাতন (মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসায়েন)-কে ভালবাসতে গিয়ে যদি 'শিয়া' অপবাদ মাথায় তুলে নিতে হয় তবে খোদার কসম, আমার চেয়ে বড় শিয়া আর কেউ নাই।' অধম লেখকও হজরত ইমাম শাফীর (র.) মত চিৎকার করে বলতে চায় যে, এই নিঃস্ব, এই রিক্ত, এই এতিম, মিসকিনদের অধিকারের কথা বললে যদি 'কমিউনিস্ট' অপবাদ মাথায় তুলে নিতে হয় তাহলে খোদার কসম, অধম লেখককে 'কমিউনিস্ট' বলে গাল দিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাটি বলে দিতে চাই যে, অনাগত যুগই এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে যাবে। আমরা বালির বাঁধের মত অনেক বই পুস্তকের বস্তা দিয়ে বাঁধ দিতে চেষ্টা করছি, কিন্তু এইসব বই পুস্তকে আমাদের পরের প্রজন্ম 'খাক থু' করে এক লাদা থু থু নিক্ষেপ করে ঘৃণিত বেঈমান জানবে। হেরোইন জমাকারীর যদি মৃত্যুদণ্ড নামক শাস্তিই যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে যারা সম্পদ জমা করে এহেন অবস্থা তৈরি করে তাদের কী শাস্তি?

খলিফা উমর ফারুক জেরুজালেম যাচ্ছেন উটের পিঠে চাকরকে বসিয়ে। তারপর? মার্কস, লেনিন আর মাও সে তুং-এর বিবেকের চোখে বোবা বিস্ময়! সেই উঠের রশি ধরে টেনে চলছেন একশত বাংলাদেশের চাইতেও বড় দেশের প্রধান। দুটি মিনিট নেগেটিভ চিন্তার দর্শন মন হতে সরিয়ে চিন্তা করুন তো! চিন্তা করুন তো, বাংলাদেশের উঁচু (?) পদের একজন সরকারি কর্মচারীর পক্ষেও কি এই আচরণ প্রদর্শন করা সম্ভব? ভাতের হাঁড়ির সাম্যের সামনে পদমর্যাদার সাম্য নির্ঘাত আত্মহত্যা, নয়তো পদত্যাগ পত্রের প্রশ্নটি কি অবধারিত? মাওলানা ভাসানী যখন উমর ফারুকের এই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন মাও সে তুংকে, তখন মাও সে তুং কেবল একটি কথাই বলেছিলেন, 'বিবেকের সাম্যবাদকে গ্রহণ করা আরো জটিল।' হ্যাঁ, তাই। মানুষের রক্ত শোষণ করে যারা সম্পদের পাহাড় তৈরি করে উপাসনালয়ে বাঁচার আশ্রয় গ্রহণ করে, আর তারা তখন? তখন ঐ শোষিত জনতার একটি কণ্ঠস্বর শ্লোগানের ভয়ঙ্কর ঢেউ তুলে, 'যে ঘরে তোদের মত শোষক, জালেম আর সম্পদ জমাকারীরা আশ্রয়গ্রহণ করে, সে ঘর আর যাই হোক না কেন ওটা কখনোই আল্লাহ্র ঘর হতে পারে না।' এক সের হিরোইনসহ ধরা পড়া আসামীর দিকে যে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকায়–সে তাকানোর ভাষা হল মৃত্যুদণ্ড। আর যারা দেশ ও দশের আমানত বেমালুম হজম করে বসে আছে তাদের দিকে তাকাবো কীভাবে? বলবেন কি? বুকে হাত রেখে বলুন, কী ধরনের উপহার পাবার যোগ্য তারা? এই বিবেকের দাঁড়িপাল্লায় উঁচু নিচু হবার ঝড় বইতে চায়। আল্লাহ্ পাক আমাদের শাহা রগের চেয়েও নিকটে আছেন–আছেন রবরূপে, আছেন আদিল তথা সূক্ষ্ম বিচারকরূপে আমাদেরই একান্ত কাছে কাছে। আছেন আমাদেরই অস্তিত্বের প্রতিটি সূক্ষ্মতম কোষে কোষে। কী অপূর্ব কোরানের আটষট্টি নম্বর সুরা কালাম। কী বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম ভাষার গাঁথুনি সুরা কালাম। পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানময় কোরানের তুলনা করা হাস্যকর। কারণ, কোরানই হল একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন।

মার্কসবাদ হাঁড়ির ইতিহাস তৈরি করতে গিয়ে নাস্তিকতাকে কোলে তুলে নিয়েছে। হাঁড়ির ইতিহাস আত্মার গবেষণাকে ফেলে দিয়ে মুক্তির বাণী শোনায়। কিন্তু অসম্ভব। আপেক্ষিক (কিছু দিনের জন্য) সত্য রূপে প্রতিভাত হলেও সার্বিক (সব সময়ের জন্য) সত্যের সামনে মার্কসবাদ মাথা নিচু করে কাঁদে। কাঁদতে হবেই–এটা অমোঘ সত্য। তাই তো মার্কসের 'হাঁড়িইজম' বার বার রোগা হচ্ছে আর পরিবর্তনের ইনজেকশন দিয়ে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু যেদিন বিশ্বনবীর কণ্ঠ হতে নির্গত আল্লাহ্র মহাবাণী কোরানের মর্মবাণী উদ্ধার করা হবে, উদ্ধার করা হবে সর্বযুগের জীবন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, সেদিন মার্কসবাদ এইডস রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য। যেদিন হজরত বাবা শাহ সুফি লালন ফকিরের অতি সহজ শব্দের গাঁথুনিতে রচিত পদ্যে কোরানের ব্যাখ্যা বাহির করতে পারবে,–কারণ, অধ্যাত্মবাদের মধ্যেও যে একটি অধ্যাত্ম সাম্য থাকতে পারে তারই সম্রাট হলেন লালন ফকির। যেদিন ইমাম হোসায়েনের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, যেদিন এজিদের রঙ চড়া চোখ ধাঁধানো মরীচিকার ইমিটেশন-মার্কা এজিদি ইসলামকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে পারবে–সেইদিন কি হোসায়নি ইসলামের হাঁটি হাঁটি পায়ে চলার বাস্তব রূপটি কোথাও প্রতিফলিত হবে?

দৈহিক মৃত্যুই যেখানে সবকিছুর শেষ সিদ্ধান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়, ধরে নেওয়া হয় এই পৃথিবীর জীবনটাই একমাত্র সত্য, সেখানে কেবল মার্কসবাদই নয় বরং যে কোন নব্য আর পুরাতন মতবাদের (ইজম) রূপ আর যুক্তির নাচানাচির ঢং যতই আপাত নিখুঁত বলে মনে হোক না কেন, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে যখন গর্তে পড়ে হাত-পা ভাঙার অনেক দৃশ্য দেখতে পাবে তখনই চালানো হয় ঔষধ আর ব্যান্ডেজ

লাগাবার নূতন নূতন প্রয়োগ ব্যবস্থা। কারণ, আপেক্ষিক সত্যের প্রশ্নে এরা দৈহিক মৃত্যুটাই সব কিছুর শেষ বলে সিদ্ধান্ত নেবার ঘোষণা করেনি বরং সার্বিক সত্যরূপে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ঘোষণা করা হয়েছে। যার দরুন প্রয়োগ-পদ্ধতিটাই মুখ্য এবং এই প্রয়োগ-পদ্ধতিটার যতই নূতন নূতন ধরন ধারন বাহির করা হোক না কেন, উহা হয়ে পড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। 'একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'–বার বার এই ভুলটি এত বেশি প্রচার করা হয়েছে যার দরুন মগজ ধোলাই করার মত 'পূর্ণাঙ্গ দর্শন'-এর চেহারার ভুল নাম 'পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' বলা হয়। এ জন্যই এর ফলটির অনেক রকম নাম হতে পারে–যেমন, বস্তুসর্বস্ববাদ, যান্ত্রিক জীবন, আইন সর্বস্ব, ধমক দেবার বাহার, আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ। এরকমভাবে অনেক নাম দেওয়া যায় এবং যার ফলে অধ্যাত্মবাদ, মরমিবাদ, সুফিবাদ, ফকিরি ইত্যাদি নামের পরকালভিত্তিক দর্শনগুলোকে কেমন করে গ্রহণ করা যায়, এ চিন্তা না করে বরং ছুঁড়ে মারে যত সব জঘন্য গালাগালির বিশেষণ–যেমন, অজ্ঞেয়বাদ, গাঁজাখুরি, ভণ্ডামি, ফুল বাবুর চিন্তাধারা, অলস মাথার বিকৃত ফসল ইত্যাদি।

মৃত্যুর পরও জীবন আছে, পুরস্কার আর শাস্তি আছে। যদিও এগুলো সাদা চোখে মোটেই ধরার উপায় নেই, তবু এই অধ্যাত্মবাদকে কেউ মারতে পারবে না–এটা সারাজীবন নাস্তিক্যবাদের পূজারী ও প্রচারক হবার পরও দৈহিক মৃত্যুর সামনে এসে অকারণেই অধ্যাত্মবাদের কুয়াশা কাঁদায়। এটা যেন আগাছা মনে হলেও আপনিই গজায়। জীবনে কোনো দিন চাষ করা তো দূরে থাক মনেও করতে চায়নি সেই অধ্যাত্মবাদ মৃত্যুর সামনে এসে আগাছার মত আপনি গজিয়ে উঠবে। হ্যাঁ, গজাবেই। কারণ, এটাই যে জীবনের পূর্ণাঙ্গ দর্শন, যা সে নিজের ইচ্ছায় নয় বরং সামাজিক জীবন ব্যবস্থার আত্মবিরোধ দেখে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু মানুষের দৈহিক মৃত্যু যতদিন থাকবে ততদিন অধ্যাত্মবাদকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। কারণ, এটা এমনই এক জিনিস যা কেউ ঝেঁটিয়ে চিরবিদায় করে দিতে চাইলেও আবার আপন ঘরেই বুমেরাং-এর মত ফিরে আসে। লৌকিকতার অবগুণ্ঠনে অস্বীকার করছে, কিন্তু মৌনতার অবগুণ্ঠনে অধ্যাত্মবাদের দরজার সামনে মাথা নিচু করে ফুপিয়ে কাঁদছে। 'সত্যিই আল্লাহ্ পাক, তুমি মহান না নিষ্ঠুর জানি না, জানার চেষ্টাও কোনদিন করিনি। কিন্তু আজ বিদায়ের বেলায় কেন মনের একান্ত গর্তে তোমার কথা মনে হয়?' যিশুর মহাক্ষমার দর্শন–'এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও', 'আল্লাহ্, তুমি ওদের ক্ষমা করে দাও। ওরা যা করছে তা ওরা নিজেরাই জানে না'–এ রকম কত উপদেশকে কত রকম কুৎসিত আর জঘন্য বিশেষণের কাপড় পরিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুর শেষ প্রান্তে এসে অকারণেই বুকে জড়িয়ে ধরে সবার অলক্ষে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে। তবে কি ঐ ক্ষমার বাণীই সার্বিক সত্য? যদিও আপেক্ষিক অর্থে এতকাল জেনেছি অন্য রকম।

মারেফত কী

আরবি আরাফা শব্দ হতে মারেফত। আরাফা অর্থ হল জানা, জ্ঞানলাভ করা। মারেফত অর্থ লব্ধজ্ঞান। মারেফত দিয়ে জগত ও জীবনের যে কোনো বিষয়ের সম্যক জ্ঞান জানা যায়। স্থূল দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়। সূক্ষ্ম দর্শন প্রকৃত দর্শন। জ্ঞানীগণ সূক্ষ্মতা অবলম্বন করে জীবন ও জগতকে দেখেন–ইহাই মারেফত। লোকেরা যাকে মারেফত বলে মনে করে, আসলে উহা মারেফত নয়, কারণ অজ্ঞাত বিষয় জানাটাই মারেফত। অজ্ঞাত বিষয়টা অজ্ঞাত থেকে যায় বলে মারেফত জ্ঞান লাভ হয় না। মারেফতের মূল কেন্দ্রভূমি আপন দেহ-মন। আপন দেহ-মনের পরিচয় পেলে মানুষ তার রবের পরিচয় পায়। রবের পরিচয় পেলে সে তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তার সম্যক পরিচয় লাভ করে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই রবের পরিচয় না পায় ততদিন সে দুঃখচক্রের আবর্তে নিজের দুঃখ নিজে সৃজন করে ঘুরতে থাকে। এ জন্য কোরান বলছে, *ওয়াত্তাকু রাব্বাকুম* তোমরা তোমাদের রব সম্বন্ধে সাবধান হও। ইহাই মারেফতের গোপন কথা।

অতএব বাজারের বিতর্কমূলক তথাকথিত শরিয়তের ধোঁকায় পড়ে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হয়ো না। আপন দেহ হতে আপন রবের মারেফতের দ্বার উ ঘাটন করে আল কেতাবের শরিয়ত বুঝে লও, তবেই সকল বিতর্কের অবসান ঘটবে। মারেফতের গোপন কথা আসলে গোপন নয়। সম্যক গুরুর প্রতি ভক্তিযোগ অথবা জ্ঞানযোগের পথ ধরলেই গোপন কথার তালা খুলে আল কেতাবের দ্বার খুলে যাবে।

ভাল করে জেনে রাখুন

হাল আমলে বিশেষ করে কিছু মাদ্রাসায় পাস করা আলেম এবং মুফতিরা কথায় কথায় সরল মুসলমান ভাইদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে বসেন। অথচ তারা জানেন না যে, *ফতোয়াই দারুল উলুম* (৪৪০/১২)-এ কী উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। 'কাফের ফতোয়া দেবার প্রশ্ন উঠলে দেখতে হবে যে, যদি শতকরা নিরানব্বই ভাগ কাফের বলার অবকাশ থাকে, কিন্তু মাত্র এক ভাগ কাফের না বলার সম্ভাবনা থাকে, তবে অবশ্যই মুফতি এবং কাজি কাফের ফতোয়া দিতে পারবে না।' *আদ্ দুররুল মুখতার* নামক ফতোয়ার কেতাবের 'মুর্তাদ' অধ্যায়ের (৩৯৯/৩) ফতোয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 'কাফের ফতোয়া দেবার যদি অনেক কারণও থাকে, তবু যদি মাত্র একটি কারণ কাফের না হবার জন্য বাহির করা যায়, তাহলে কোন মতেই মুফতি এবং কাজি কাফের ফতোয়া দিতে পারবেন না।'

এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি বিষয় যে, ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কিছু আলেমেরা একে অপরের উপর যা-তা মন্তব্য করে গেছেন। যেমন আমাদের সুন্নি জামাতের হজরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে *তারীখ-ই-খতীব* নামক কেতাবের লেখক খতিব বাগদাদি দাজ্জাল বলেছেন, হজরত সুফিয়ান সাউরি জঘন্য এবং অপাঠ্য সমালোচনা করে গেছেন ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে। এ রকম ভাবে হজরত ইমাম মালিক (র.)-কে কঠোর সমালোচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং ইবনে আবি যিব, হজরত ইমাম শাফেয়িকে ইবনে মুইন ইত্যাদি বহু নমুনা তুলে ধরা যায়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, হানাফিরা শাফেয়িদেরকে আবার শাফেয়িরা হানাফিদেরকে যেমন কঠোর সমালোচনা করেছেন তেমনি মালেকিরা হাম্বলিদেরকে এবং হাম্বলিরা উপরের বর্ণিত তিন মহান ইমামদেরকে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং একে অপরকে গোমরাহ বলেছেন।

মহানবীর প্রিয় সাহাবা এবং আপন চাচাত ভাই হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) সুন্দর একটি উপদেশ দিয়ে গেছেন এই বলে যে, 'যেখানেই জ্ঞান পাবে তা অর্জন করে নিও, আর ফিকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের ঝগড়া এবং সমালোচনা গ্রহণ করতে যেও না। কারণ, এরা খোঁয়াড়ে বাস করা মানুষরূপী ভেড়ার দল, এরা একে অন্যের উপর চড়াও হয়।'

....